প্রথম আলো

স্বপ্ন নিয়ে

সফলদের স্বপ্নগাথা সংকলন

সফলদের স্বপ্নগাথা সংকলন

সংকলকঃ শাহরিয়ার মাহমুদ কাব্য

eBook Created By: Shariar Mahamud Kabbo

কি করব যখন বুঝতে পারা যায় না তখন যদি কেউ গাইড লাইন দেয় বা কি করা যায় তা সম্পর্কে বলে তাহলে অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
এখানে বিখ্যাত অনেক ব্যাক্তির বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবর্তন এর বক্তৃতা গুলোর একটা ছোট্ট সংগ্রহ। এ গুলো পড়ে আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, কিভাবে কি করা যায় ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারনা পাওয়া যাবে।
এখানের লেখা গুলোর প্রায় সব গুলোই প্রথম আলোর স্বপ্ন নিয়ে পাতা থেকে কপি করা কন্টেন্ট। আমি শুধু মাত্র একত্র করার চেষ্টা করেছি।
আশা করি লেখা গুলো নিজেকে জানতে সাহায্য করবে।

“ বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখ দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিস্কার করে। ”

-নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রথম আলো প্রত্রিকা আমার ভালো লাগার কয়েকটি কারন হচ্ছে তাদের ফিচার পাতা গুলো। বিজ্ঞান মনষ্ক হওয়ার কারনে বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কোন লেখাকেই অনেক আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। তা যেখানেই পেতাম।

প্রথম আলোতে এ ধরনের লেখা অন্যান্য প্রত্রিকা থেকে বেশি থাকত এবং তথ্য গুলো আপডেটেড থাকত। আর স্বপ্ন নিয়ে পাতার ভিষন ফ্যান ছিলাম [এখনো আছি] এ স্বপ্ন নিয়ে পাতায় বিখ্যাত অনেক ব্যাক্তি সম্পর্কে লিখে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালতে দেওয়া তাদের বক্তৃতা গুলো সুন্দর করে অনুবাদ করে প্রকাশ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দেওয়া বক্তৃতা গুলো এতই ভালো লাগত যে বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। পড়ি ও। আমি জানি, অনেকেই এর ব্যাতিক্রম নয়।

আগে যদি কোন কারনে কোন লেখা ভুল করে মিস করতাম, প্রথম আলোর ওয়েব সাইটে গিয়ে পুরাতন খবরের অংশ থেকে পড়ে নিতাম। আর এ খানে আমি আমার কাছে ভালো লাগা লেখা গুলো এক সাথ করার চেষ্টা করছি। যেন যে কেউ পড়তে চাইলে সহজেই পড়তে পারে।

লেখা গুলোর প্রায় লেখাই কপিরাইটেড। আমি প্রথম আলো থেকে বা যে সব সাইট থেকে তথ্য গুলো নিয়েছি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তবে বেশির ভাগই প্রথম আলোর স্বপ্ন নিয়ে পাতা থেকে নেওয়া। আমি চেষ্টা করেছি যেখান থেকে লেখা গুলো নিয়েছি, লেখক/ অনুবাদক এর নাম দিয়ে দিতে।

লেখক পরিচিতিঃ

নামঃ শাহরিয়ার মাহমুদ কাব্য

ঠিকানাঃ সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর ।

ইমেইলঃ dr.kabbo52@gmail.com

ফেসবুকঃ facebook.com/rp.drkabbo

ওয়েবসাইটঃ drkabbo.wordpress.com

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা**

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

সফলদের স্বপ্নগাথা সংকলন

সফলদের স্বপ্নগাথা

ছোটি ছোটি কাজই মানুষকে বড় করে

ভিওলা ডেভিস । ০৫ মার্চ ২০১৭

মার্কিন অভিনয়শিল্পী ভিওলা ডেভিস। ফেনসেস ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের জন্য এ বছর তিনি জিতে নিয়েছেন একাডেমি অ্যাওয়ার্ড। ২০১২ সালে টাইম সাময়িকীর করা 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তি' তালিকায়ও ছিল তাঁর নাম। চলুন, শুনি এক পরিশ্রমী অভিনয়শিল্পীর গল্প।

চ্যালেঞ্জ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ, তবে রোমাঞ্চকর! অনেকটা জাহাজের নাবিক হয়ে হাল ধরে পথ পাড়ি দেওয়ার মতো। ঝুঁকি পেরিয়ে সফল হওয়ার অনুভূতিটা হয় দারুণ! আমি যা করতে চাই, সেটা ঠিকঠাকভাবে করতে পারাটাই আমার কাছে চ্যালেঞ্জ। ফেনসেস-এর মতো প্রকল্পগুলো যখন আমার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, ভীষণ রোমাঞ্চ অনুভব করি। এই ছবির জন্য মাত্র দুই পৃষ্ঠার সংলাপও আমি ২০ বারের বেশি চর্চা করেছি; যেন আমার লক্ষ্যে সফল হতে পারি।

যে চরিত্র আমাকে চনমনে করে, সেটাই আমার কাছে চ্যালেঞ্জ। নির্মাতা যখন তাঁর গল্পের

কোনো একটি চরিত্রে আমাকে দেখতে পান, ভীষণ ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে যখন কেউ বলেন, 'এটা এমন এক চরিত্র, যা তুমি আগে কখনো করোনি।'

প্রত্যেক অভিনয়শিল্পীই জীবনের শুরুর দিনগুলোতে অনেক বেশি লড়াই করেন। পছন্দের পেশায় টিকে

থাকতে হলে এই কষ্টটা করতে হয়। আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ব্যতিক্রম ছিল না। এমনও সিনেমা আছে, তিন দিন ধরে কাজ করেছি, পাঁচ দিন ধরে করেছি, সাত দিন ধরে করেছি–কিন্তু ছবির গল্পে আমার চরিত্র তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। তারপরও এসব করে গেছি। কারণ, আমি ভালো কিছুর জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম, মুখিয়ে ছিলাম। এটাই আমার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল–যেটুকু কাজ করব, সেটুকু দিয়েই সবার নজর কাড়ব। ছোট ছোট কাজই তো মানুষকে বড় করে।

দ্য হেল্প ও হাউ টু গেট অ্যাওয়ে উইথ মার্ডার–এ দুটো ছবিকে আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বলব। দেড় শর বেশি অঞ্চলে এ ছবি দুটো প্রদর্শিত হয়েছে। সব ধরনের দর্শক আমাকে দেখেছেন, আমার কাজ দেখেছেন। আর এভাবেই ফেনসেস-এর মতো ছবিতে কাজ করার সুযোগ এসেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। হ্যাঁ! সাধনাটা হয়তো ৩০ বছরের। তবে এত দিন পর হলেও আমি সফলতা পাচ্ছি–এটাই বড় কথা।

আমরা এখন এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যাকে আমি বলব 'দ্য মোস্ট পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড' । আমি যদি আমার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে থাকি, তবে সাফল্য পাবই। বছর দশেক আগে আমার তেমন পরিচিতি ছিল না। এমনকি দ্য হেল্প-এ কাজ না করলে আদৌ আমাকে কেউ চিনতেন কি না সন্দেহ। তবে শুরুতেই সবকিছু পেয়ে গেলে লড়াই করার মজা থাকে না। ধৈর্য ধরে থেকে লড়াই করেছি। ৩০ বছর পরে এসে ফল পাচ্ছি।

আরেকটা অভ্যাস আমার আছে। সেটা হলো নিজের কাজের খুঁত ধরা। আমি ও আমার স্বামী মিলে অবসর দিনগুলো ব্যয় করি কোথায় আমার কী ভুল হয়েছে তা খুঁজতে। হ্যাঁ, হয়তো অনেক সমালোচক বাইরে আছেন। দর্শকেরাও আছেন। তবে দিন শেষে আমি আমার কাজ নিয়ে কতটুকু খুশি থাকব, সেটা বোঝার জন্য হলেও এই বিবেচনার দরকার আছে। এটা আমাকে সব সময় আরও ভালো কাজ কীভাবে করা যায়, তার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

তবু কাজে সাফল্য পাওয়া আমাকে সন্তুষ্টি দেয় না। বরং আরও তৃষ্ণার্ত করে। মাথায় ঘুরতে থাকে–এরপর কী করব? এর পরের চ্যালেঞ্জটা কী হবে? ৩০ বছর ধরে অভিনয় করতে করতে সব সময় একটার পর একটা কাজ করেছি, আর এ প্রশ্নই করেছি।

ইনডিওয়্যারকে দেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: তৌশিকুর রহমান

সফলদের স্বপ্নগাথা

গণিতে ১ পেয়েছিলাম : জ্যাক মা

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

স্বনামধন্য চীনা ব্যবসায়ী জ্যাক মা। তিনি অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। দারুণ বক্তা জ্যাক। বিভিন্ন উদ্যোক্তা সম্মেলনে তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন বহু তরুণ। ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি হংকংয়ে অনুষ্ঠিত 'অ্যান ইভিনিং উইথ জ্যাক মা' অনুষ্ঠানে তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি।

আমি যেটা ভাবি, সেটাই যে সব সময় ঠিক তা নয়। তরুণদের আমি কিছু শেখাতে চাই না। কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, আমি মনে করি এই পরামর্শ তাদের প্রয়োজন নেই। আমি বরং তোমাদের আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলব, স্রেফ একজন বড় ভাইয়ের মতো।

১৫ বছর আগে আমি ব্যবসা শুরু করেছি। প্রথমত কখনোই ভাবিনি, এ রকম একটা মঞ্চে নিজের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হবে। যখন আমি ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার ২৪ জন বন্ধুকে বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পাক্কা দুই ঘণ্টা আমার ভাবনাটা ওদের বোঝানোর পর আমি বুঝতে পারলাম, ওরা কিছুই বোঝেনি! ২৪ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন আমার পাশে থাকতে রাজি হয়েছিল।

আজকালকার তরুণদের যেসব যোগ্যতা থাকে, আমার সেসবের কিছুই ছিল না। লোকে আমাকে বলত, ‘কী যোগ্যতা আছে তোমার? তুমি কখনো অ্যাকাউন্টিং শেখোনি, ম্যানেজমেন্ট শেখোনি। এমনকি কম্পিউটার সম্পর্কেও তেমন কিছু জানো না। তুমি কেন ব্যবসা করবে?’ সবাই জানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথমবার গণিতে আমি ১ পেয়েছিলাম। তিনবার পরীক্ষা দিয়েও ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাইনি। শেষ পর্যন্ত যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, সেটার তেমন কোনো নাম ছিল না—হ্যাংঝোউ নরমাল ইউনিভার্সিটিকে তখন ‘চতুর্থ শ্রেণির’ বিশ্ববিদ্যালয় ধরা হতো। কিন্তু এখন অনুভব করি, হ্যাংঝোউ আমার কাছে হার্ভার্ডের চেয়েও বড়! এসবই প্রমাণ করে, ব্যবসা করার তেমন কোনো যোগ্যতা আমার ছিল না। যারা শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে অনেক সময় তাদের জন্যই উদ্যোক্তা হওয়া সহজ।

সে জন্যই আমাদের মতো কিছু মানুষ, যাদের অন্য অনেক কিছু করার যোগ্যতা নেই, তারা উদ্যোক্তা হয়। অনেকে ভেবেছিল আমরা ভাগ্যক্রমে সাফল্য পেয়ে গেছি। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ১৫ বছর ধরে আমরা টিকে আছি। এটা ঠিক আলিবাবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে চার বছর আমি চায়না ইয়েলো পেজেস -এ কাজ করেছি। বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি মন্ত্রণালয়েও ছিলাম প্রায় ১৩ মাস। আমি যে পরিমাণ ভুল করেছি, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

১৮ জন সহপ্রতিষ্ঠাতাকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাসায় আলিবাবার যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেদিন আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম, আমরা যদি সফল হই, এর অর্থ হলো চীনের শতকরা আশি ভাগ তরুণের পক্ষেই সফল হওয়া সম্ভব। কেউ আমাদের পেছনে বিনিয়োগ করেনি। না ছিল ক্ষমতা, না কোনো সামাজিক অবস্থান। সম্বল বলতে তেমন কিছুই ছিল না। আমরা ১৮ জন ৫ লাখ আরএমবি করে বিনিয়োগ করেছিলাম। ঠিক করেছিলাম, অন্তত ১২ মাস এই টাকায় ব্যবসাটা চালিয়ে নেব। এর মধ্যে যদি কিছু আয় হয়, তবে ব্যবসা চলবে। নতুবা অন্য কিছু ভাবতে হবে। কিন্তু অষ্টম মাসেই আমাদের হাত খালি হয়ে গেল। আমাদের নিয়ে কারও কোনো আশা ছিল না।

স্পষ্ট মনে আছে, বর্তমান নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট জো সাইকে নিয়ে যখন সিলিকন ভ্যালিতে গেলাম, ৩০ জন বিনিয়োগকারী আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা ছাড়া আর কারও কাছেই পরিকল্পনাটা ভালো মনে হচ্ছিল না। একটা পরিকল্পনা করাই মুখ্য নয়। মুখ্য হলো, তুমি যা করছ সেটার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে কি না। আলিবাবার সঙ্গে এই যাত্রায় অনেকেই জেনেছে স্বপ্ন, সত্য আর কল্পনার মধ্যে পার্থক্য কী।

তরুণ বয়সে সবার একটা স্বপ্ন থাকে। অনেক মা-বাবা আমাকে বলেন, 'জ্যাক, আমার ছেলে বা মেয়েটার স্বপ্ন কদিন পরপরই বদলে যাচ্ছে। আজ সে হতে চায় এক, কাল আরেক।' আমি বলি এটাই তো স্বাভাবিক। কোনো স্বপ্ন না থাকার চেয়ে অন্তত কদিন পর পর স্বপ্ন বদল হওয়া ভালো। আমার ইচ্ছে ছিল পুলিশ হব কিংবা আর্মিতে যোগ দেব। এমনকি কেএফসিতে কাজের জন্যও আবেদন করেছিলাম। ২৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে ২৩ জনই নিয়োগ পেয়েছিল। ১ জন পায়নি–সেই মানুষটা আমি। যখন পুলিশের চাকরির জন্য আবেদন করলাম, প্রতি ৫ জনে ৪ জন চাকরি পেয়েছিল, আমি পাইনি।

স্বপ্ন থাকা ভালো। কিন্তু বাস্তবতা কী? বাস্তবতা হলো, একদল লোক ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা, অনুশীলন আর কার্যক্রম নিয়ে এগোতে এগোতে একসময় বুঝতে পারে, তারা সবাই আসলে একই লক্ষ্যের পেছনে ছুটছে। যখন আলিবাবার যাত্রা শুরু হয়, এটা স্বপ্ন বা কল্পনা কোনোটাই ছিল না। আমি এমন বহু মানুষ দেখেছি যারা কল্পনায় ডুবে থাকে। অবাস্তব, অসম্ভব সব কল্পনা। তবু তারা ভাবে যে অন্য সবাই ভুল, শুধু তারাই ঠিক। আলিবাবায় আমরা ১৮ জন মানুষ শুধু এটাই ঠিক করেছিলাম, আমরা আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকব।

চড়াই-উতরাইগুলো একসঙ্গে পাড়ি দেব। আমাদের স্বপ্ন বা কল্পনা ছিল না, ছিল আশা।

অতএব নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো, তোমার যদি কোনো স্বপ্ন থাকে, তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণে অটল কি না। তোমার যদি কোনো লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্য পূরণের সাথি হতে তুমি আরও একদল মানুষকে আমন্ত্রণ জানাবে কি না। নিঃসঙ্গ যাত্রা খুবই ক্লান্তিকর। নিজের কাজটা ঠিকভাবে করলেই একটা ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায় না। এর জন্য একদল মানুষের মধ্যে একটা ভালো বোঝাপড়ার দরকার হয়।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ,

সূত্র: অনুষ্ঠানের অফিশিয়াল ভিডিও

সৈয়দ শামসুল হক

নিঃশব্দে বজ্রপাত হয়ে গেল আমার মাথায়

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
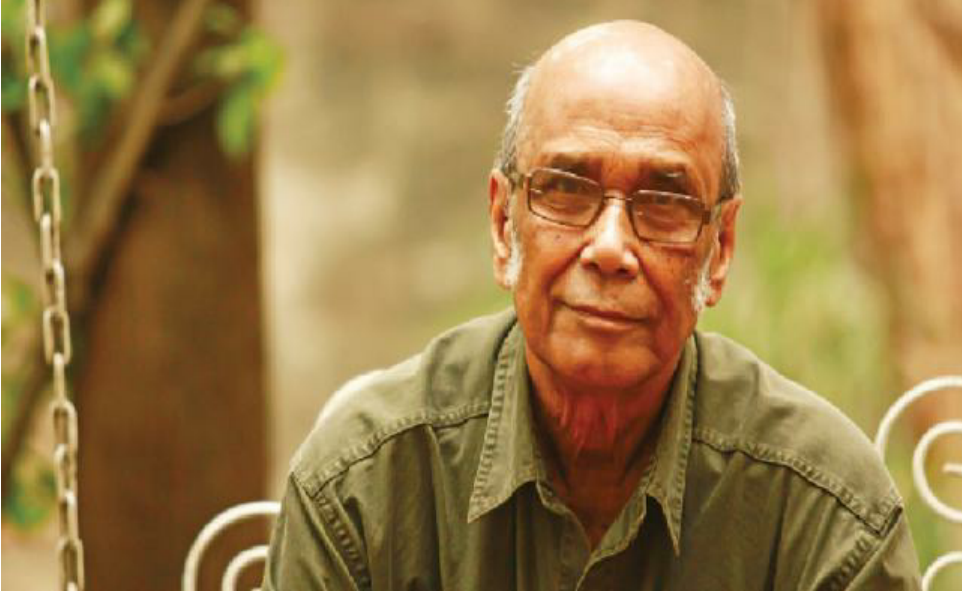
সৈয়দ শামসুল হককে বলা হয় সব্যসাচী লেখক। যাঁর লেখনী অজস্র বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছে, সেই তিনিও একদিন মনে মনে বলেছিলেন, ‘লেখার মুখে ছাই! কলমের ওপর ঘেন্না! সাহিত্য আর আমার জন্যে নয়!’ সমালোচনা থেকে কীভাবে তিনি শক্তি খুঁজে পেলেন, সে কথাই তিনি লিখেছেন তাঁর আত্মজ ীবনীতে। পড়ুন প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হকের আত্মজীবনী, ‘তিন পয়সার জোছনা’র একাংশ।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে আমার গল্প পড়বার সন্ধ্যা-জমজমাট আসর, লেখকের ভিড়ে উপচে পড়েছে সওগাত প্রেসের সেই গুদামঘরটি, কাজী মোতাহার হোসেন সভাপতির আসনে ধ্যানস্থ, মোফাজ্জল হায়দার
চৌধুরীকে মনে পড়ে, বসে আছেন জোড়াসন হয়ে, শুদ্ধ শান্তিনিকেতনি উচ্চারণে কথা বলছেন পাশের জনের সঙ্গে, তাঁর সে উচ্চারণ শুনেই আমার হৃৎকম্প–এঁদের মধ্যে আমার রংপুরি জিহ্বায় বাংলা!–লোহানী বসেছেন বিখ্যাত সব মানুষদের গা ঘেঁষে, তবে তাঁর অভ্যেস নয় এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্ ্থির থাকা, মাঝে মাঝেই উঠে যাচ্ছেন, আবার আসছেন, মন দিয়ে কিছু শুনছেন কি না বলবার জো নেই–আর–পাঠ করা সব লেখারই বাঁধা সমালোচক খালেদ চৌধুরী নিমীলিত নেত্রে বসে আছেন বাবুটি হয়ে, ধীরে ধীরে পান চিবোচ্ছেন, তাঁর নেত্র দুটি

অপরাহ্ণেই মহাতামাক নেশাক্রমে টকটকে রাঙা–লোহানীর মুখে আগেই শুনেছি এ তামাকে খালেদ চৌধুরীর বিস্তার খোলে!–আমি পড়ে চলেছি 'শেষের কবিতার পরের কবিতা', প্রায় আঠারো-কুড়ি পাতার ছিল সেই গল্পটা। তখন ও সভায় লেখা পড়তে বা আলোচনা করতে উঠে দাঁড়াবার রেওয়াজ ছিল না–বসে বসেই সব!

প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন লেখক–বসে আছেন উৎকর্ণ হয়ে–জবুথবু গলায় আমি পড়ে চলেছি পাতার পর পাতা, একসময় পড়া শেষ হলো, পিনপতন স্তব্ধতা, কারও মুখে ভাবান্তর নেই, আলোচনা করবার জন্যে সভাপতি কাজী মোতাহার হোসেন নীরব নির্দেশে খালেদ চৌধুরীর দিকে তাকালেন, ধ্যানস্থ খালেদের সেটি দেখে ওঠার কথা নয়, কিন্তু তিনি জানেন বলতে হবে তাঁকেই–তিনি চোখ দুটি ধীরে খুললেন, ধীরেই তাঁর পানরসস্থ ঠোঁট খুলল, তারপর গড়িয়ে পড়ল অস্ফুট উচ্চারিত দুটি শব্দ–গুহাযুগ! আমি হকচকিয়ে গেলাম–গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে গুহাযুগ? ঠিক শ ুনছি তো?

কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে খালেদ শুরু করলেন, মানবসভ্যতার সেই আদিম কাল–গুহাযুগ থেকে লৌহযুগ, তাম্রযুগ, আগুনের আবিষ্কার, ফিনিশীয়দের হাতে লিপির উদ্ভব–তিনি বলে চললেন, বলেই চললেন–আর আমিও ক্রমেই উদ্বেল হতে থাকলাম–দেখেছ! এমন একটা গল্প লিখেছি যে তার আলোচনা করতে গিয়ে পুরো মানবসভ্যতার ইতিহাসটাই বয়ান করতে হচ্ছে এমন দুর্দান্ত ধীমান এক সমালোচককে! গর্বে আমি ইতিউতি চাইছি, আর শুনে চলেছি–খালেদ উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লব পেরিয়ে, কার্ল মার্ক্সের দর্শন ছুঁয়ে, সভ্যতার ইতিহাস যে হাতিয়ারেরই

ইতিহাস আসলে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটু থামলেন–তারপর কাজী মোহাতার হোসেন সাহেবের দিকে নেত্র দুটি স্থির স্থাপন করে বললেন, সম্মানিত সভাপতি, যে গল্পটি এইমাত্র পড়া হলো, মানবের এই দীর্ঘ ইতিহাসে এর চেয়ে নিকৃষ্টতম গল্প আর হয় না, বোধ করি হবেও না!

নিঃশব্দে বজ্রপাত হয়ে গেল আমার মাথায়। সভাজুড়ে কুলকুল হাসি উঠল, তারপর কেউ একজন কী একটা

পাঠ শুরু করলেন, সভা ফিরে গেল নিবিষ্ট শ্রবণে, আর আমি?–আমি তো অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি না, দয়াবতী ধরণিও আমাকে গ্রাস করবে না, নিজেকে সবার অলক্ষ্যে ঠেলে ঠেলে সভার একেবারে শেষ প্রান্তে দরোজার কাছে নিয়ে মাথা নিচু করে গুটিয়ে বসে রইলাম। সভা একসময় শেষ হলো, নিঃশব্দে আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম যে কারও চোখে পড়বার আগেই পালিয়ে যাব–পারলাম না, সবাই হইহই করে বেরোতে শুরু করেছেন, আমি প্রেসের বাইরে ডালিমগাছটির আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়লাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম কতক্ষণে সবাই চলে যাবে আর আমি বাড়ি ফিরে যাব।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি–লেখার মুখে ছাই! কলমের ওপর ঘেন্না! সাহিত্য আর আমার জন্যে নয়! হঠাৎ কাঁধের ওপর কার যেন হাত–আমি চমকে উঠলাম–তাকিয়ে দেখি ফজলে লোহানী! তিনি বললেন, কী! মন খারাপ? আমার কানে তা পশেছে কি পশে নাই, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পড়তে লাগল পানি। সমুখ দ িয়ে ওই যে কবি আর লেখকেরা কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছেন যেন মন্দাকিনীরই স্রোত–লোহানী ওঁদের দিকে হাত তুলে বললেন, ওই যে ওদের দেখছ, একদিন ওরা কেউ থাকবে না! তারপর আমার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, তুমি থাকবে! বললেন, এসো তুমি আমার সঙ্গে।
(সংক্ষেপিত)

পরিবর্তনের এটাই সুযোগ : স্কারলেট জোহানসন

২৯ জানুয়ারি ২০১৭

যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্বস সাময়িকীর করা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালে অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন হলিউড অভিনেত্রী
স্কারলেট জোহানসন। পর্দার ব্যস্ততম এই তারকা সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন।

'তুমি কি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গেছ?'

এই প্রশ্ন মা আমাকে করেছিলেন ১৫ বছর বয়সে। তখন আমি সদ্যই আমার শরীরে একধরনের পরিবর্তন লক্ষ করতে শুরু করেছি।

আমি সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয় বা আমার পরিবার নিয়ে কথা বলতে চাই না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আমার তেমন কোনো উপস্থিতি নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের সত্যিই খুব ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলার সময় এসেছে।

তো যা বলছিলাম। ১৫ বছর বয়সে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে আমি প্ল্যানড প্যারেন্টহুডে (স্বাস্থ্যসেবা দেয়, এমন একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান) গেছি। তখন নিউইয়র্কে থাকতাম। মা যখন আমাদের ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলেন, আমি আর আমার ভাই হান্টার থাকতাম বাবার সঙ্গে। তখন বিনোদনজগতে কাজ করতে শুরু করেছি। আমি

সৌভাগ্যবান, নিজের জন্য একটা স্বাস্থ্যবিমা করে নেওয়ার সামর্থ্য আমার হয়েছিল। শারীরিক

পরিবর্তন নিয়ে আমি ভীত ছিলাম। প্ল্যানড প্যারেন্টহুডের চিকিৎসক সেই ভয় দূর করেছেন।

খুব আগ্রহ নিয়ে তিনি নিয়মিত আমার চেকআপ করেছেন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন।

যখন শুনেছি, আজ আমাকে এখানে নারী স্বাস্থ্য ও প্রজনন নিয়ে কথা বলতে হবে, খুব আগ্রহ নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আমি জানি, এখানে উপস্থিত প্রত্যেক মেয়ের কাছেই প্ল্যানড প্যারেন্টহুড নিয়ে কোনো না কোনো গল্প আছে। প্রায় ২৫ লাখ মার্কিন নাগরিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য কোনো না কোনোভাবে প্ল্যানড প্যারেন্টহুডের ওপর নির্ভরশীল। ক্যানসার ও যৌনরোগ নির্ণয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভবতী মায়েদের পরিকল্পনা, নিরাপদ গর্ভপাত—নানা বিষয়ে তারা মানুষকে সহায়তা করে আসছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আমি আপনাকে ভোট দিইনি। আপনি আমাদের দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, আপনার পদটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি চাই আপনার পাশে থাকতে। কিন্তু আগে আপনি আমার পাশে দাঁড়ান। আমার বোনের পাশে দাঁড়ান, আমার মায়ের পাশে দাঁড়ান, আমার বন্ধুদের পাশে দাঁড়ান। সেই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান, যারা আপনার আসন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আছে।

আমার মেয়ের পাশে দাঁড়ান। আমি সঠিক স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছিলাম বলেই আজ যার জন্ম হয়েছে। এমনকি আপনার মেয়ে ইভাংকাও এই স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে। সেই একই সেবাটা আমার মেয়ে পাবে না, তা কী করে হয়? নারীর পাশে দাঁড়ান, যারা এখনো প্রতিটি ক্ষেত্রে সম-অধিকারের জন্য লড়াই করছে।

এবারের নির্বাচনের ফলাফল শুনে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘ওহেহো! আমাদের অনেক কাজ করতে হবে!’ সামনে কঠিন সময় আসছে। আমি আমার কাঁধে দায়িত্বের ভারটা অনুভব করতে পারছি।

কিন্তু একই সঙ্গে আমার দুর্ভাবনা একটুখানি কমে গেল, যখন বুঝলাম, একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনার এটাই তো সুযোগ। শুধু ভবিষ্যৎ মার্কিন নাগরিকদের জন্য কিছু করার সুযোগ এসেছে তা নয়, আমাদের দায়িত্ববোধটা জাগিয়ে তোলারও এটাই সুযোগ। এই সুযোগে আমরা সমাজের জন্য কিছ‍ু করতে পারি।

এই দায়িত্বের ভার যেন আমাদের থমকে না দেয়, বরং সাহস জোগায়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, নারীস্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবিতে সব ধরনের কার্যক্রমে আমি থাকব। আমাদের অধিকার নিশ্চিত করার আগে এই লড়াই থামবে না। কোনো রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক ফায়দার বলি হয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎকে শঙ্কার মুখে পড়তে দেব না। আমরা পিছু হটব না।

আমাদের কাছ থেকে শক্তি কেড়ে নিয়েই রাজনীতিবিদেরা শক্তিশালী হন। তাই আপনার শক্তিটা নিঃশেষ হতে দেবেন না। কখনোই না। এই অসহায়ত্ব যেন আপনাকে নির্বিকার করে না দেয়।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, মাঠপর্যায়ে কাজ করুন। নিজেকে বিলিয়ে দিন। যে সংস্থা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে, নারীকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সিদ্ধান্তগুলো নিতে সাহায্য করছে, তার পাশে থাকুন।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ, সূত্র: গার্ডিয়ান

সফলদেরস্বপ্নগাথা

কী ভুল করছেন, জানুন : মহেন্দ্র সিং ধোনি

২২ জানুয়ারি ২০১৭

সম্প্রতি অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। দীর্ঘদিন সফলভাবে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র। পড়ুন ‘ক্যাপ্টেন কুল’-এর জীবনদর্শন।

আমি সব সময় বর্তমান নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসি। সবকিছুকে একটু ভেঙে ভাবতে পছন্দ করি। আমার কাছে কোনো খেলায় হেরে যাওয়াটা ভাবার বিষয় নয়। বরং ভুলটা কোথায় হলো, সেটা জানাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আবার কোনো খেলায় জিতে যাওয়াও কিন্তু সব না। বরং কোন জায়গায় উন্নতি করা দরকার, সেটা ধরতে পারাই জরুরি।

আমি মনে করি, আপনি যখন শারীরিকভাবে ক্লান্তি বোধ করেন, তখনো কিন্তু চাইলে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। যতক্ষণ না আপনি মানসিকভাবে ক্লান্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ আপনি আসলে ক্লান্ত না। আমি এখন পর্যন্ত অনেক মাইলফলক আর সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছি, তারপরও অনেক লক্ষ্য ছোঁয়া এখনো বাকি আছে। একই সাফল্যের চূড়া তো আরও একবার স্পর্শ করা যায়। যদি কোনো স্বপ্নই না থাকে, তাহলে সামনে এগোনোর গতিটা দেবে কে? তাই আমি সব সময় বলি, শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছাতে চান, সেটা আপনার জানা থাকুক বা না থাকুক, স্বপ্ন থাকতেই হবে।

লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির মনোভাব থাকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব বেশি দূরের ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে ছোট ছোট লক্ষ্য ঠিক করুন। এভাবেই একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করতে

হয়, সামনে এগোতে হয়। পরীক্ষার ক্ষেত্রটা মাঠ কিংবা যেখানেই হোক, নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা থাকতে হয়। স্কুলে আমি যখন খেলতাম, আমার লক্ষ্য থাকত আমার জেলার অনূর্ধ্ব ১৬ কিংবা ১৯ দলে

সুযোগ পাওয়া।

সেখানে যখন নির্বাচিত হলাম, তখন পরের ধাপটা পেরোনোর পরিকল্পনা শুরু করলাম। ছোট ছোট লক্ষ্য ঠিক করে সামনে এগোলে অনেক দূরে যাওয়া যায়। এটাই আমার নিয়ম।

সত্যি বলতে আমি কখনো আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করব, এমনটা ভাবিনি। এখন আমি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছি, এটা আসলে রূপকথার গল্পের মতো লাগে। তবু 'বর্তমান সময়ে'

বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমি সব সময় কাদের নেতৃত্ব দিচ্ছি, তা নিয়ে চিন্তা করি না। বরং সামগ্রিকভাবে আমাদের লক্ষ্যটা কী, সেটাই থাকে মূল চিন্তার বিষয়।

আমি শচীন টেন্ডুলকার আর অমিতাভ বচ্চনের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিই। জীবনের নানা পর্যায়ে তাঁরা সমস্যা-প্রতিবন্ধকতা দেখেছেন, তারপরও সফল হয়েছেন। একটা ব্যাপার লক্ষ করে দেখবেন, এই মানুষ দুজন তাঁদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভীষণ বিনয়ী আর নম্র। আমার কাছে সফল হওয়ার জন্য বিনয়ী ও নম্র হওয়াটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

অনেক তরুণ মহেন্দ্র সিং ধোনি হতে চান। আমার কাছে মনে হয়, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। সবকিছুকে সরল ভাবতে পারাটাই এগোনোর সাহস জোগায়। তবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটু ভাগ্যেরও সহায়তা প্রয়োজন। পাশাপাশি আপনি কোন ক্ষেত্রে ভালো তা আপনাকে জানতে হবে। সেটা ক্রিকেটে হোক, অন্য কোনো খেলায় হোক, কিংবা পড়াশোনায় হোক। আপনি যদি পড়াশোনায় ভালো হন আর ক্রিকেট খেলতে চান, তাহলে আপনাকে অন্যদের চেয়ে বেশিই পরিশ্রম করতে হবে। না হলে আপনি লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারবেন না। জীবনে আপনাকে সবকিছুর ভারসাম্য রক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে। বাস্তববাদী হোন। আপনি যে বিষয়ে ভালো, তা জেনে তার জন্য ঠিক পথে ঠিকভাবে পরিশ্রম করুন। সাফল্য ধরা দেবেই।

ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে ইংরেজি থেকে অনুবাদ: জাহীদ হোসাইন খান

সফলদের স্বপ্নগাথা

পড়ে শেখার চেয়ে করে শেখা জরুরি : সুন্দর পিচাই

১৫ জানুয়ারি ২০১৭

গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই। ২৩ বছর পর নিজের ক্যাম্পাস, ভারতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) খড়্গপুরে পা রেখেছিলেন তিনি। স্মরণ করেছেন তাঁর ছাত্রজীবনের কথা।

আমার মনে আছে, কলেজ ছেড়ে যাওয়ার সময় যখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, খুব মন খারাপ লাগছিল। কী দারুণ চারটা বছর কেটেছে এখানে! এরপর গত ২৩ বছরে আর আসা হয়নি। আজ সত্যিই ভীষণ স্মৃতিকাতর লাগছে।

তখন ভাবিনি, এত বছর পর আবারও ফিরব এই মুক্তমঞ্চে কথা বলার জন্য। হাজারো ছাত্রছাত্রী আমার কথা শুনবে। আমি তো একজন সাধারণ ছাত্রই ছিলাম। আর দশজন ছাত্রের মতোই কখনো কখনো ক্লাস ফাঁকিও দিয়েছি। কলেজে তখন 'র‍্যাগিং' সেভাবে ছিল না। কিন্তু আমাদের সময় 'সিজি চেঞ্জ' বলে একটা কথা ছিল। এখনো কি আছে? সিজি চেঞ্জ মানে হলো 'সেন্ট্রাল গ্র্যাভিটি চেঞ্জ'। একবার রুমের দরজায় তালা দিয়ে কোথায় যেন গেছি। ফিরে এসে দরজা খুলেই চমকে গেলাম। জামাকাপড়-বই থেকে শুরু করে টেবিল, খাট–সব

কিছুর জায়গা বদলে গেছে! অথচ দরজায় তালা ছিল ঠিকই। আসলে বাইরে থেকে লাঠি দিয়ে ঘরের সব ওলট-পালট করে

দেওয়া হয়েছিল। নবাগত ছাত্রদের চমকে দিতে সিনিয়ররা এই কাজ করতেন। এরই নাম দেওয়া হয়েছিল সেন্ট্রাল গ্র্যাভিটি চেঞ্জ।

আমি চেন্নাই থেকে এসেছিলাম। স্কুলে হিন্দি শিখেছি, কিন্তু খুব একটা বলতে পারতাম না। এখানে এসে সহপাঠীদের কথা শুনে একটু একটু করে শিখছিলাম। মনে আছে একবার অপরিচিত এক লোককে আমি 'আব্বে সালেহ...' (অ্যাই শালা) বলে ডেকেছিলাম। বন্ধুদের দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, এভাবেই বোধ হয় মানুষকে সম্বোধন করতে হয়!

অঞ্জলি ছিল আমার সহপাঠী। এখন যদিও সে আমার স্ত্রী। ক্লাসেই ওর সঙ্গে পরিচয়। তখন এসএন হল ছিল মেয়েদের একমাত্র হোস্টেল। মেয়েদের হোস্টেলে কারও সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা আরেক বিব্রতকর অভিজ্ঞতা। আমি হয়তো কাউকে ডেকে নিচু গলায় বললাম, 'অঞ্জলিকে একটু ডেকে দেবেন?' তিনি ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে পুরো হোস্টেল জানান দিতেন, 'অঞ্জলি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে সুন্দর এসেছে।'

আমি জানি না কেন, আজ আমার হলের সেই সরু করিডর থেকে শুরু করে নিজের ছোট্ট কামড়াটাও দেখতে একই রকম লাগল। অথচ সব কত বদলে গেছে। আমি যখন এই ক্যাম্পাসে ছিলাম, তখন গুগল ছিল না। ইন্টারনেটও ছিল না।

গুগলে আমরা চেষ্টা করি এমন কিছু তৈরি করতে, যেটা কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করবে। এবং যা তাদের জীবনের কোনো না কোনো সমস্যার সমাধান দেবে। যেকোনো কিছু তৈরি করার সময় এটাই থাকে আমাদের লক্ষ্য। আমরা লক্ষ্যটা এত বড় রাখি যেন দু-একবার ব্যর্থ হওয়াটা স্বাভাবিক মনে হয়। ল্যারি (গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ) বলে, 'যদি তুমি খুব কঠিন কিছু নিয়ে কাজ কর, যা আর কেউ করছে না, চালিয়ে যাও। কারণ তোমার কোনো প্রতিযোগী নেই। তুমি যদি ব্যর্থও হও, নিশ্চয়ই একটা ভালো কিছু পাবে।'

গুগলে আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম ২০০৪ সালের পয়লা এপ্রিলে। তখন তারা মাত্রই জিমেইল চালু করেছে। আমি তখনো জিমেইল সম্পর্কে জানতাম না। ইন্টারভিউতে ওরা যখন আমাকে জিমেইল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, প্রথমে ভেবেছিলাম এটা একটা 'এপ্রিল ফুল জোক'! মনে আছে ইন্টারভিউয়ের মাঝখানে একজন আমাকে আইসক্রিম খেতে দিয়েছিল। সেদিনই বুঝেছিলাম, এই প্রতিষ্ঠানটা অন্যরকম। এখানে আমি অসাধারণ সব মানুষের সঙ্গে কাজ করি। একটা ঘরে যখন অস্বাভাবিক মেধাবী মানুষেরা তোমাকে ঘিরে থাকবে, তখন একটা সমস্যা হওয়া খুব স্বাভাবিক। আমরা এটাকে বলি 'ইম্পোস্টার সিনড্রোম'। এসব ক্ষেত্রে মনে হয়, আমি বোধ হয় এই রুমে থাকার যোগ্য না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা ক্লাসরুমে অনেক

শিক্ষার্থীরও এ সমস্যা হয়। আমি বলব, অন্যের দিকে মন না দিয়ে নিজের কাজটার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু যেমন বদলে যাচ্ছে, তেমনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বা পড়ালেখার ধরনটাও নিশ্চয়ই বদলানো উচিত। অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, এখানে পাঠ্যবইয়ের পেছনে সময় দেওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাইরের পৃথিবীতে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সেখানে কাজের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বেশি। তাই বিভিন্ন ধরনের কাজ করো। ঝুঁকি নাও। খোঁজো, কোন কাজটা তুমি ভালোবাসো। সেটাই মন লাগিয়ে করো। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ ছাত্র তাদের মেজর ঠিক করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে উঠে।

কারণ এর আগে পর্যন্ত তারা তাদের আগ্রহের বিষয়টা অনুসন্ধান করে। একাডেমিক পড়ালেখাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ততটা নয়, যতটা গুরুত্ব আমরা দিই। জীবন একটা দীর্ঘ যাত্রা। তাই আমি যা করছি, তা উপভোগ করা খুব জরুরি।

গুগলে আমাদের ৬০ হাজার কর্মী আছেন। এই কর্মীদের মধ্যে ছোট ছোট দল আছে। সেসব দলের নেতা আছেন। পুরো প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসেবে আমার কাজ হলো, অন্য নেতাদের সামনে থেকে বাধাগুলো সরিয়ে দেওয়া। তাঁদের বিশ্বাস করা, স্বাধীনতা দেওয়া, তাঁদের সফল করা। আমি বিশ্বাস করি–নেতৃত্ব দেওয়া মানে নিজে সফল হওয়া নয়। বরং এটা নিশ্চিত করা যে আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা সফল হচ্ছেন।

এখনকার পড়ালেখায় চাপ খুব বেশি। আমার খুব অবাক লাগে, ক্লাস এইট থেকেই নাকি শিক্ষার্থীরা আইআইটিতে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু এটা বুঝতে হবে, পড়ে শেখার চেয়ে করে শেখা জরুরি। ব্যর্থতা কোনো বাধা না। অনেকে বলে, ‘তুমি অমুক কলেজে ভর্তি হতে পারোনি, ব্যাস, তোমার জীবন তো এখানেই শেষ।’ এমনটা কখনোই না। আশা আর স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখে সেটা অনুসরণ করতে পারাটাই বড়।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ
সূত্র: অনুষ্ঠানের অফিশিয়াল ভিডিও

সফল ড্রপআউট

বেন পেসটারন্যাকের । ১৫ জানুয়ারি ২০১৭

১৬ বছর বয়সেই ‘সিইও’!

১৬ বছর বয়সী বেন পেসটারন্যাকের বক্তব্য খুব সোজাসাপ্টা—‘আমি আমার প্রজন্মের মার্ক জাকারবার্গ হতে চাই!’ বলেই সে ক্ষান্ত হয়নি। লক্ষ অর্জনে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ফ্লগ-এর

এই প্রধান নির্বাহী। ফ্লগ হলো একটি ব্যতিক্রমী অনলাইন কেনাবেচার অ্যাপ। অনেকে ফ্লগকে

বলেন অন্য দুই জনপ্রিয় অ্যাপ টিন্ডার ও ই-বের মিশেল।

তার বয়সী ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে ক্লাস করছে, বেন তখন অফিসের জরুরি মিটিংয়ে ব্যস্ত! হ্যাঁ, স্কুল ছেড়ে, নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে বেন পাড়ি জমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। এত কম

বয়সেই একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হয়ে সে রীতিমতো তারকা বনে গেছে।

মাত্র ১১ বছর বয়সে বেন ইউটিউব ভিডিও বানাতে শুরু করে। ১৫ বছর বয়সে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে তৈরি করেছিল একটি মোবাইল গেম—ইমপসিবল রাশ। গেমটি অস্ট্রেলিয়ার বাজারে ১ নম্বরে ও যুক্তরাষ্ট্রে ৪ নম্বরে ছিল। পরে ‘ফ্লগ’-এর ভাবনা যখন মাথায় আসে,

বেন বুঝতে পারে, এই অ্যাপই হতে পারে তাঁর জীবনের 'টার্নিং পয়েন্ট'। পড়ালেখা ছেড়ে পুরোদমে কাজে মন দেয় সে। বেনের স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ হয়েছে। ২০১৬ সালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ৩০ জন 'টিনএজারের' একটি তালিকা তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রে টাইম সাময়িকী। সেখানে নামীদামি খেলোয়াড়-অভিনয়শিল্পী-সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে আছে তার নাম! সূত্র: দ্য নিউইয়র্কার

গান লেখার নেশায় পড়ালেখাকে বিদায়

ছোটবেলায় একরকম খেলাচ্ছলেই মেয়ের হাতে গিটার তুলে দিয়েছিলেন নাতাশা বেডিংফিল্ডের মা-বাবা। কে জানত, এই গিটারের তারের ওপর ভর করেই তিনি ব্রিটেনের অন্যতম জনপ্রিয় গায়িকা হয়ে উঠবেন! কিশোর বয়সেই নাতাশা আর তাঁর তিন ভাই-বোন মিলে গড়ে তোলেন ডিএনএ অ্যালগরিদম নামের পারিবারিক ব্যান্ড। এক দিকে গান, অন্য দিকে পড়াশোনা দারুণভাবে চলছিল দেখে মা-বাবার বকুনি তেমনটা খেতে হয়নি নাতাশাকে। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ইউনিভার্সিটি অব গ্রিনউইচে ভর্তি হলেন।

মা-বাবাও তখন দারুণ খুশি। প্রথম বছরে মনোবিজ্ঞান বিষয়টার সঙ্গে ভালোই সখ্য গড়ে

উঠেছিল তাঁর। কিন্তু হঠাৎই গানের নেশাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পড়ালেখাকে 'টা টা' জানিয়ে একসময় গিটারের সঙ্গেই সখ্যটা আরও গভীর করে নেন তিনি। মা-বাবা শুরুতে একটু কষ্ট পেয়েছিলেন বটে কিন্তু বয়স বিশ পেরোনোর আগেই যে মেয়ের
গানের সুনাম যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাঁকে নিয়ে গর্ব না করে উপায় আছে!
গ্রন্থনা: জাহিদ হোসাইন খান
সূত্র: অ্যাবাউট ডট কম

অনুভূতিগুলোই গান হয়ে যায়

টেইলর সুইফট । ০৮ জানুয়ারি ২০১৭

যুক্তরাষ্ট্রের গায়িকা টেইলর সুইফট। প্রতিবছরই গানের ভুবনের নামী পুরস্কারগুলো জুটবে তাঁর ঝুলিতে—এ যেন অবধারিত। টাইম সাময়িকীর করা তালিকা অনুযায়ী, খ্যাতি আর আয়ের বিচারে ২০১৬ সালের সবচেয়ে সফল তারকা তিনি। কেমন তাঁর মনোজগৎ?
ছোটবেলায় রূপকথার গল্প পড়তাম। সে গল্পে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা হতো। রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য সব সুখ এনে দিত। রূপকথার গল্পে খারাপ মানুষটাকে খুব দ্রুত শনাক্ত করা যায়। তার পেছনে একটা কালো রঙের ঝালর থাকে, তাই সহজেই বুঝে নেওয়া যায়, এই চরিত্রটা মন্দ। বড় হয়ে বুঝলাম, রাজপুত্রের খোঁজ পাওয়া এত সহজ নয়। সত্যিকার পৃথিবীতে মন্দ লোকেরাও কাঁধে কালো ঝালর ঝুলিয়ে আসে না। খারাপ মানুষগুলো হয় আমুদে, হাসিখুশি, পরিপাটি। তাই কোন চরিত্রটা ভালো আর কোনটা মন্দ, সেটা বোঝা খুব কঠিন। যদিও মন্দ লোকদের প্রতি আমার আচরণটা খুব সহজ। যদি আমি আপনাকে পছন্দ না করি, আমি আপনাকে নিয়ে একটা গান লিখব। এবং অবশ্যই সেই গানটা আপনার পছন্দ হবে না।

১২ বছর বয়স থেকে আমার গান লেখার শুরু। জীবনের ভীষণ প্রিয় সময় সেটা। মনে হতো গান লেখা ছাড়া আমার বুঝি আর কিছু করার নেই। ভীষণ আবেগের একটা জায়গা ছিল এই গান। মনে হতো গানের মাঝেই আত্মতৃপ্তি, ভালো লাগা, মনের কথাগুলো বলতে পারার আনন্দ।

স্কুলে আমার তেমন কোনো বন্ধু ছিল না। কেউ এসে গল্প করত না। কিন্তু এসবে আমার কোনো আফসোস ছিল না। কারণ, মনে মনে আমি নিজেকে বলতাম, 'এটা কোনো ব্যাপার নয়। বাড়ি ফিরে তুমি বরং এই অভিজ্ঞতা নিয়েই একটা গান লিখে ফেলতে পারো।' সারাটা জীবনই আমি এই মন্ত্র জপে গেছি। যতবার একাকিত্ব, কষ্ট, না পাওয়া ঘিরে ধরেছে; নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিয়েছি, 'বাহ্, এই অনুভূতিটা নিয়ে তো একটা চমৎকার গান হতে পারে!'

গান লেখার ভূত কখন কীভাবে যে মাথায় চেপে বসে, আমি নিজেও টের পাই না। হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে খুব জরুরি কোনো আলাপ করছি। কিংবা ভক্তদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছি। হুট করে কিছু গানের কথা মাথায় ঘুরতে থাকে। দ্রুত গানটা তৈরি করতে না পারলে ভুলে যাব, এই তাড়না আমাকে ভোগায়। ব্যাপারটা কি অদ্ভুত না? ধরুন খুব সাধারণ একটা দিনে খুব সাধারণ কিছু কথা আপনার মাথায় এল। কথাগুলো দিয়ে যদি সুন্দর একটা গান তৈরি করা যায়, তাহলে সাধারণ দিনটাই অসাধারণ মনে হবে। দিনটা বদলে যাবে। কিংবা কে জানে, এক গানে জীবনটাও বদলে যেতে পারে!

এ রকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বেশ কয়েকবার এসেছে। বন্ধুরাও আমার এমন আচরণের সঙ্গে অভ্যস্ত। বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো এই মুহূর্তে আমি কথা বলছি, আবার ঠিক পরের মুহূর্তেই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার মাথায় কোনো না কোনো 'আইডিয়া' খেলা করতে থাকে। গত কয়েক বছরে এমন ঘটনা অজস্রবার হয়েছে। বন্ধুরা তখন কথা থামিয়ে দিয়ে মজা করে বলে, 'ওহ, বুঝতেই পারিনি তুমি কাজ করছ!'

কয়েকটা শব্দ একটা মানুষকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। আবার কয়েকটা শব্দই পারে একটা ভেঙে পড়া মানুষকে জোড়া লাগাতে। আমি আশা করব, আপনারা আপনাদের শব্দগুলো দ্বিতীয় কাজটাতেই ব্যয় করবেন। কারণ, না-বলা কথা আপনাকে যতটা কষ্ট দেবে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট দেবে সেই কথাগ‌ুলো, যা বলে আপনি কারও মনে দুঃখ দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, দিন শেষে আমি আমার প্রথম অ্যালবামে গাওয়া সেই গানের মতো। 'জাস্ট আ গার্ল ট্রাইয়িং টু ফাইন্ড আ প্লেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'। আমি সেই মেয়ে, যে বেঁচে থাকার জন্য গান লেখে। নানা দ‌েশ ঘুরে ঘুরে গান গায়। এই জীবন থেকে আমার পাওয়া তাহলে কী? আমি এমন অনেক দেশে গেছি, যে দেশের মানুষ ইংরেজি বলতে পারে না। অথচ আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নির্ভুল উচ্চারণে আমার গান গায়। এর চেয়ে বিস্ময়কর

অর্জন আর কী হতে পারে!
ইংরেজি থেকে অনুবাদ:
মো. সাইফুল্লাহ
সূত্র: বায়োগ্রাফি ডট কম

ভুবনজয়ী তারুণ্য

কার্টুন পত্রিকা থেকে হলিউডে

ওয়াহিদ ইবনে রেজা । ০৪ জানুয়ারি ২০১৭

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছেন বাংলাদেশের তরুণেরা। নানান দিগন্তে তাঁরা মেলে ধরছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। এঁদের চারজন নিজেরাই শোনাচ্ছেন নিজেদের বাধা ডিঙানোর কাহিনি। আজ প্রথম পর্ব।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল ইঞ্জিনিয়ার হব। কিন্তু আবার কখনোই ভালো ছাত্র ছিলাম না। বরাবরই মাঝারি। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি বা নটর ডেমের বাঘা বাঘা ছাত্রদের সামনে আমি নিতান্তই গাধাগাধা ছিলাম। ফলে প্রচুর পড়লাম। আমার মনে হয় না পড়াশোনা নিয়ে জীবনে আমি

এর আগে বা পরে এত কষ্ট কোনো দিন করেছি। চান্স পেয়ে গেলাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

পরবর্তী লক্ষ্য হয় ফান ম্যাগাজিন উন্মাদ । যে বছর বুয়েটে চান্স পাই, তার পরের বছর বইমেলায় উন্মাদ -এর স্টলে গিয়ে বলি, দরকার হলে মাথায় করে উন্মাদ বিক্রি করব, তবু উন্মাদ -এ কাজ করতে চাই। উন্মাদ -এর পাতায় ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে পেলেই আমি ধন্য। ২০১০ সালে যখন বাংলাদেশ ছাড়ি, তখন আমি উন্মাদ -এর অ্যাসোসিয়েট এডিটর।

আমি অভিনয় করতে খুব পছন্দ করতাম। 'স্বপ্ন' নামে মঞ্চনাটকের একটা ছোট দলও ছিল আমাদের। এই সময় উন্মাদ -এর পক্ষ থেকে একটা সুযোগ এল হুমায়ূন স্যারের (হুমায়ূন আহমেদ) বাসায় যাওয়ার। উনি আমাকে দেখে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, ইউ হ্যাভ এ ভেরি ইউনিক ফিজিক। আমেরিকা, রাশিয়ায় দেখা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় না। আমি ঈদের নাটক শুটিং করব কালকে। যাবে আমার সাথে নুহাশ পল্লী?' আমি অভিনয় করলাম। সেবার ঈদে স্যারের পাঁচটি নাটকের মধ্যে আমি অভিনয় করি চারটায়! দুইটাতে আবার মূল চরিত্রে!

খুব শখ ছিল বাপ্পা মজুমদার আমার লেখা একটা গান করবেন। বুয়েটের এক কনসার্টে মঞ্চের পেছনে ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি গাইলেন আমার লেখা লিরিকে 'নির্বাসন' নামের গানটি। টিভিতে আরও

অনেক কিছু করা হলো—উপস্থাপনা, বিজ্ঞাপন, স্কেচ কমেডি, রিয়েলিটি শো। টিভির পেছনেও

কাজ করতে শুরু করলাম। কবিতার বইয়ের সংখ্যা বাড়ল। যুক্ত হলো জোকসের বই।

একটা সময় মনে হলো, আমার অন্য কিছু করা দরকার। একটু ঝুঁকিপূর্ণ কিছু। না হলে আজীবন আফসোস থেকে যাবে। ঠিক করলাম, চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে পড়তে যাব নর্থ আমেরিকায়। তখন বিজ্ঞাপন সংস্থা 'গ্রে'র কপিহেড হিসেবে কাজ করি। আবেদন করলাম বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোনোটাতেই চান্স পেলাম না। খুব মন খারাপ হলো। চিন্তা করে দেখলাম, চলচ্চিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা বাড়াতে হবে। শুধু লেখা বা অভিনয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে হবে না। কিছু ছোট ছোট চলচ্চিত্র বানালাম। আবার আবেদন করলাম পরের বছর। সুযোগ পেলাম কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায়।

ভ্যাঙ্কুভারে পড়তে এসে বুঝলাম, হলিউড ড্রিম যাকে বলে, তার সুযোগ পাওয়াটা আসলে কতটা কঠিন। প্রচুর নেটওয়ার্কিং লাগে। লাগে ভাগ্য, আর অসম্ভব ধৈর্য। জানতে পারলাম, এখানে নিয়মিত শুটিং ইউনিটে কাজ পেতে হলে পেশাজীবীদের ইউনিয়নের সদস্য হতে হয়। কিন্তু স্থায়ী বসবাসের অনুমতি ছাড়া ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়া যায় না। আমার কোনোটাই নেই।

ঠিক করলাম, লাইভ অ্যাকশন শুটিংয়ে কাজের বদলে অ্যানিমেশন বা ভিজ্যুয়াল এফেক্টসের (ভিএফএক্স) ধারায় যাব। ভ্যাঙ্কুভারে এ রকম প্রচুর স্টুডিও। ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে বেশ নতুন বলে এখানে লোক নেওয়া হয় ইউনিয়ন ছাড়াই।

তত দিনে আমি বেশ ভালো রেজাল্ট করে পাস করে ফেলেছি। শিক্ষানবিশি করেছি এনবিসি ইউনিভার্সালের শো স্যুটসে। বেশ কিছু শর্ট ফিল্মে কাজ করি প্রডিউসার হিসেবে। নিজের পরিচালনায় শর্ট ফিল্ম কিছু ফেস্টিভ্যালে গেছে। এই রেজুমে দেখিয়ে কানাডার বেশ বড় অ্যানিমেশন স্টুডিও বার্ডেলে প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পেয়ে গেলাম প্রথম চাকরি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম সেখানে। একটা কাজের দায়িত্বে থাকলে দশটা করে ফেলতাম। আমাকে অনেক ‘অড’ কাজ করতে হতো—কফি বানানো, ডিশ ধোয়া ইত্যাদি। এই অবস্থানে সবারই তা করতে হয়। আমি অড কাজগুলো অসম্ভব দ্রুতগতিতে করে ফেলতাম। তখন ওরা আমাকে প্রোডাকশনের কাজ দিতে বাধ্য হতো। প্রোডাকশনের পরিকল্পনায় সাহায্য করা থেকে শুরু করে আর্টিস্টদের কাজ বণ্টন করা, তাদের পে-রোল করা ইত্যাদি। আমি এত ভালো করে সব কাজগুলো করলাম যে আমাকে ওরা আর অড কাজ করতে বলত না।

মাত্র ছয় মাস প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার পরই প্রমোশন পেয়ে কো-অর্ডিনেটর হয়ে যাই। কিন্তু আমি তত দিনে ঠিক করে ফেলেছি নতুন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপ্লোর করব। তখন অস্কার বিজয়ী স্টুডিও এমপিসি সমন্বয়কারী খুঁজছিল। রেজুমে জমা দিলাম। চাকরি হয়ে গেল সমন্বয়কারী হিসেবে।

ভিএফএক্সে সেই আমার যাত্রা শুরু। প্রথম প্রজেক্ট গেম অব থ্রন্স। আমি কল্পনাও করিনি এত বড় প্রজেক্টে আমি কোনো দিন কাজ করতে পারব। এমপিসিতেও প্রচণ্ড পরিশ্রম করি। কেউ অসুস্থ থাকলে তার কাজ আমি করে দিতাম, তা সে ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজারই হোক বা আমার সহকারী অন্য কোনো সমন্বয়কারীই হোক। এর প্রতিদানও পাওয়া গেল। একই বছর একাধিক সিনেমায় কাজ করলাম। বছর শেষে আমাকে স্টাফ পজিশন দিয়ে সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর বানিয়ে দেওয়া হলো। আমি তখন ব্যাটম্যান ভার্সাস

সুপারম্যানের পুরো প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর। অনেক বড় প্রজেক্ট ছিল এটা। বিশাল বাজেট।

সিনেমার ঠিক মাঝামাঝি এসে যখন দুই সুপার হিরোর লড়াই শুরু হয়, তখন থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত পুরো কাজটা আমরা করি। কাজটা এত চমৎকারভাবে শেষ হয় যে এর পরে চাকরির অফার চলে আসে। নিজে থেকে কষ্ট করে খুঁজে আর রেজুমে পাঠাতে হয় না।

আমি খুব চাচ্ছিলাম মারভেল কমিকসের মুভিতে কাজ করতে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন আমেরিকা য়। ঠিকই মেথড স্টুডিও আমাকে সেই সিনেমার জন্য নিয়োগ দেয়। একে একে এখানে আমি ক্যাপ্টেন আমেরিকা, সিভিল ওয়ার ও ডক্টর স্ট্রেঞ্জ -এ কাজ করি। এই দুটি ফিল্ম এ মুহূর্তে ২০১৬ সালের অস্কারে ভিএফএক্স ক্যাটাগরির সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছে।

যদি নমিনেশন পেয়ে যায়, গর্ব করে বলতে পারব, অস্কার নমিনেটেড সিনেমার অংশ ছিলাম। এই দুটি সিনেমায় কাজ শেষ করে প্রমোশন পেয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার হয়ে যাই গার্ডিয়ানস অব গ্যালাক্সি ভলিউম ২ -এ। বর্তমানে এই মুভিতেই কাজ করছি, যা চলবে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত।

সত্যি কথা বলতে কি, এরপর ঠিক কী করব, এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে ভিএফএক্স থেকে একটু বিরতি নেওয়ার ইচ্ছা আছে। ইচ্ছা আছে আবার অ্যানিমেশনে কিছুদিন কাজ করার বা ভিডিও গেম ইন্ডাস্ট্রিটা একটু খতিয়ে দেখার। হয়তো আবার স্কুলে ব্যাক করব কোনো দিন। ইচ্ছা আছে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে একটা মাস্টার্স করব। আমার খুব শখ বাংলাদেশে এসে স্ক্রিপ্টরাইটিং শেখানো। আমি মনে করি টেলিভিশন বা ফিল্মে এই জায়গাটায় আমাদের দুর্বলতাটা সবচেয়ে বেশি। আমি জানি, এই কাজটা আমি ভালো পারি। তারপরও একটা মাস্টার্স থাকলে আমার নর্থ আমেরিকাতেও কাজ করতে সুবিধা হবে। কারণ, আমি একই সঙ্গে এখানেও কাজ করতে চাই, হলিউডের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সঙ্গে সিনেমা বানাব। দেশে এবং বিদেশে!

হ্যাঁ, সঙ্গে অন্যান্য লেখালেখিও করব। ইংরেজি কবিতা লিখছি। ইচ্ছা আছে সেই বইটা শেষ করার। কিছু কমিকস লেখার ইচ্ছা আছে, গ্রাফিক নভেল স্টাইলে। হয়তো সাহস করে উপন্যাসও লিখে ফেলতে পারি। বলা যায় না! আমাদের এত ছোট একটা জীবন। হাজারো কাজ করতে ইচ্ছা হয়। দেখি না কতটুকু পারা যায়। আমি এখন জানি আত্মবিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবেই, তা সে উন্মাদ -এই হোক আর হলিউডেই!

সফলদের স্বপ্নগাথা

সব ঠিক হয়ে যাবে

টম হ্যাংকস । ০৪ ডিসেম্বর ২০১৬

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন হলিউডের অভিনয়শিল্পীরা। অনেকে বলছেন, জাতি হিসেবে মার্কিনদের নিজেদের নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। খ্যাতিমান হলিউড অভিনেতা টম হ্যাংকস কী ভাবছেন? তিনি বলছেন স্বপ্নের কথা, এগিয়ে যাওয়ার কথা। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে বক্তব্য রেখেছেন দুবার অস্কারজয়ী এই তারকা।

সিনেমা নিয়ে আমার ভাবনার জায়গাটা বলি। কিছুদিন হলো জাতি হিসেবে পৃথিবীর কাছে আমাদের পরিচয়টাই বদলে গেছে। আমরা কারা, আমরা কী বিশ্বাস করি, আমরা কোন আদর্শ ধারণ করি–সময়ে সময়ে এসবই সিনেমার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরেছি। চলচ্চিত্র সব সময় আমাদের জীবনটাকে পর্দায় তুলে ধরে। যখনই আপনি টেলিভিশন অন করেন না কেন, যত অনন্যসাধারণ গল্পই দেখেন না কেন, কোনো না কোনোভাবে নিজেকে খুঁজে

পাবেন। ছবিটা গত বছরের হোক বা ১৯৩০-এর দশকে বানানো হোক না কেন, চলচ্চিত্র সব সময়ই বাস্তবের প্রতিফলন। পর্দায় নিজেদের দেখতে মন্দ লাগে না।

চলচ্চিত্র একটা শিল্প। আর আমরা যারা অভিনয় করি, তাঁরা এই শিল্পের কারিগর। এখানে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'মিস্টার হ্যাংকস, অমুক চরিত্রে

অমুক দৃশ্যটাতে আপনি কীভাবে অভিনয় করলেন?' আমি বলি, আপনি নিজেই করে দেখুন। এর চেয়ে ভালো উত্তর আমার জানা নেই।

আমার সৌভাগ্য, বহুদিন ধরে আমি এই শিল্পের সঙ্গে আছি। কোনো চরিত্রের ভেতর ঢুকে পড়ার একটা রোমাঞ্চ আছে। দর্শক যখন ভাবে, 'আরে এই চরিত্রটা তো আমার মতো। তাঁর জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম?' একজন অভিনয়শিল্পীর কাছে এর চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। ছোটবেলা থেকে শুরু করে আজ এই ৬০ বছরের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যতবার পর্দার সামনে বসেছি, আমি একই জিনিস ভেবেছি। 'গল্পের চরিত্র ওই লোক, ওই নারী কিংবা ওই শিশুর জায়গায় থাকলে আমি কী করতাম?'

আমেরিকা এখন যে অবস্থায় আছে, এর চেয়েও অনেক খারাপ সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি। জীবদ্দশায় আমি এ শহরের রাস্তায় অনেক বিশৃঙ্খলা দেখেছি, আমাদের প্রজন্মকে লড়াই করতে দেখেছি। আমরা এমন অনেক সময় দেখেছি, যখন নেতাদের কথা আমাদের ভ্রু কুঁচকে দিয়েছে। ভাবতে বসেছি, তাঁরা কি আমাদের মিথ্যা বলছেন? নাকি তাঁরা যা বলছেন, তা সত্যিই তাঁরা বিশ্বাস করেন!

আমি বিশ্বাস করি, সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই আমরা পৃথিবীবাসীর কাছে পরীক্ষা দিচ্ছি। জানাচ্ছি, আমরা কারা। 'আমেরিকান' হিসেবে প্রতিনিয়ত নিজেদের পরিচয় দিতে হচ্ছে। আমরা বলি, আমরাই পৃথিবীর সেরা জাতি। একটু একটু করে আমরা এগোই, কিন্তু এই সম্মুখযাত্রা কখনো থমকে যায় না। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করছি ব্রুস স্প্রিংস্টিনের সেই গান: 'এক পা এগোই, দুই পা পেছাই'। তবু সান্ত্বনা এই, এগোনো তো অব্যাহত আছে। সামনের দিকে তো ছুটতেই হবে, নইলে লোকে কী বলবে!

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ

সূত্র: ইডব্লিউ ডট কম

সফলদের স্বপ্নগাঁথা

প্রতিটা দিন একেকটা আশীর্বাদ

বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ । ২০ নভেম্বর ২০১৬
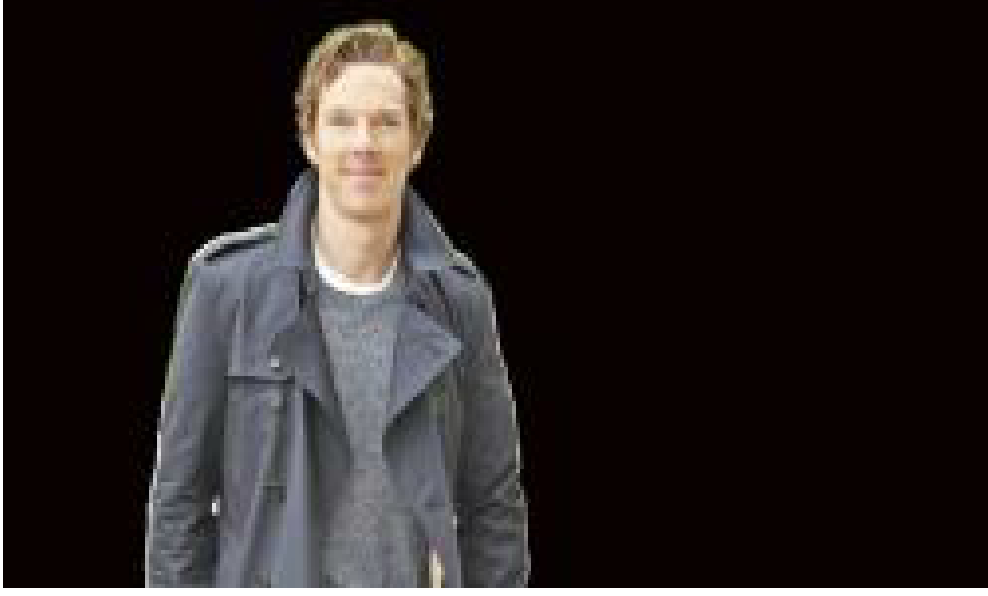
ব্রিটিশ অভিনেতা বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ। বিবিসির টিভি সিরিজ শার্লক থেকে শুরু করে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্র ডক্টর স্ট্রেঞ্জ , যেকোনো চরিত্রেই তিনি সপ্রতিভ। দ্য ইমিটেশন গেম ছবিতে অভিনয় করে অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। মঞ্চের অভিনেতা হিসেবেও তিনি ভীষণ জনপ্রিয়। তাঁর ভাবনার জগৎটা কেমন? পড়ুন এক ভিন্নধর্মী অভিনেতার কথা।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে আমার জন্ম হয়নি। মা-বাবা তাঁদের পরিশ্রমের রোজগারের প্রায় সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন আমার পড়াশোনার পেছনে। তাই মা-বাবাকে গর্বিত করব, প্রতিদিন এই লক্ষ্য নিয়েই ঘুম থেকে উঠি।

সব সময় স্রেফ একজন অভিনয়শিল্পী হতে চেয়েছি। তারকা না, নাট্যকর্মী না, টিভি অভিনেতা না, এমনকি শার্লকও না। স্রেফ একজন অভিনয়শিল্পী। এমন একজন শিল্পী, অভিনয়ের সব ক্ষেত্রেই যার বিচরণ আছে। তারকাখ্যাতি ব্যাপারটার সঙ্গে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। শহরের রাস্তায় একজন অচেনা মানুষ হয়ে হাঁটতেই ভালো লাগে।

ম্যারিলিন মনরোকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। একবার এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি নিউইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। এত বড় অভিনেত্রী, অথচ কেউ তাঁর পথ আগলে দাঁড়াচ্ছিল না। বন্ধুটি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী আশ্চর্য, কেউ তোমাকে চিনতে পারছে না কেন?’ ম্যারিলিন বললেন, ‘কারণ, আমি আমার মতো করে

হাঁটছি না।' এরপর তিনি মাথা উঁচু করলেন। কোমর দুলিয়ে তাঁর সেই চিরচেনা মোহনীয় ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করলেন। ব্যস! যা হওয়ার তা-ই হলো। রাস্তায় যানজট লেগে গেল! লোকজন 'ম্যারিলিন...!' বলে ছুটে এল। আমি তো আর এমন কিছু করতে পারব না (হাসি)। নিজেকে চেনাতে হলে শার্লকের মতো ছুটন্ত ক্যাবের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া মনে হয় না আর কোনো উপায় আছে!

তাই বলে তারকাখ্যাতি ভালো লাগে না, তা বলছি না। আমি বিশ্বাস করি, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটা একটা সুযোগ। আমার কাছে প্রতিটা কাজই একেকটা নতুন শুরু। সিনেমা, টিভি, মঞ্চ—যেখানেই হোক না কেন, জীবনের প্রতিটা ধাপেই মানুষ নতুন কিছু শেখে আর নতুন করে শুরু করতে পারে। ব্যাপারটা কখনোই এমন নয়, 'আহা! যা পাওয়ার পেয়ে গেছি!'

প্রতিটা দিন একেকটা আশীর্বাদ। ছোট হোক বা বড়, কাজ কাজই। প্রতিটাই সমান গুরুত্ব দিয়ে করা উচিত।

নিজেকে আরও পরিণত করতে সুযোগ পেলেই যোগব্যায়াম করি। আশপাশে যে সার্কাস চলছে, এর মাঝখানে শান্ত, বিনীত, বিবেচক হয়ে উঠতে হলে যোগব্যায়াম একটা ভালো উপায়।এই দীক্ষাটা পেয়েছি দার্জিলিং গিয়ে। দার্জিলিং নেপাল সীমান্তের কাছে, পশ্চিমবঙ্গের একটা জায়গা। আমি তখন তরুণ। সে সময় প্রায় এক বছর আমি বৌদ্ধভিক্ষুদের ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। সত্যি বলতে, যতটা না তাঁদের শিখিয়েছি, তারচেয়ে বেশি আমি শিখেছি। তারা খুব শান্ত, বুদ্ধিমান ও রসবোধসম্পন্ন। ইংরেজি শেখানোটা যদিও কঠিন ছিল। ৮ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৪০ বছর বয়সী ভিক্ষুরাও ছিলেন আমার ক্লাসের ছাত্র। এই ছাত্রদের কাছেই আমি জেনেছি, মানুষের জীবনটা কত সরল, অথচ কতটা মানবিক হতে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার অবলম্বনে

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ

সফলদের স্বপ্নগাথা

আমেরিকান সিটিজেনশিপ দিয়ে আমি কী করব?

হুমায়ূন আহমেদ । ১৩ নভেম্বর ২০১৬

আজ কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। তিনি তুখোড় ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পড়ালেখা করেছেন খুব আনন্দ নিয়ে। পড়ুন তাঁর শিক্ষাজীবনের কিছু ঘটনা।

এই জীবনে বেশির ভাগ কাজই আমি করেছি ঝোঁকের মাথায়। হঠাৎ একটা ইচ্ছে হলো, কোনো দিকে না তাকিয়ে ইচ্ছাটাকে সম্মান দিলাম। পরে যা হবার হবে। দু-একটা উদাহারণ দিই—আমাদের সময় সায়েন্সের ছেলেদের ইউনিভার্সিটিতে এসে ইংরেজি বা ইকোনমিকস পড়া ছিল ফ্যাশন। আমিও ফ্যাশনমতো ইকোনমিকসে ভর্তি হয়ে গেলাম। এক বন্ধু পড়বে কেমিস্ট্রি। তাকে নিয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এসেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কেমিস্ট্রির একজন স্যার হঠাৎ বারান্দায় এলেন। তাকে দেখে আমি মুগ্ধ। কী স্মার্ট, কী সুন্দর চেহারা। তিনি কী মনে করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম

ইকোনমিকস জলে ভেসে যাক। আমি পড়ব কেমিস্ট্রি। ভর্তি হয়ে গেলাম কেমিস্ট্রিতে। ওই স্যারের নাম মাহবুবুল হক। কালিনারায়ণ স্কলার। ভৌত রসায়নের ওস্তাদ লোক। যিনি অঙ্ক করিয়ে করিয়ে পরবর্তী সময়ে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

পিএইচডি করতে গেলাম ভৌত রসায়নে। কোর্স ওয়ার্ক সব শেষ করেছি। দু বছর কেটে গেছে। একদিন বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম, তিনশ দশ নাম্বার রুমে বুড়ো এক ভদ্রলোক ক্লাস নিতে ঢুকলেন। রোগা লম্বা একজন মানুষ। গায়ে আলখাল্লার মতো কোট। আমার কী যে খেয়াল হলো কে জানে। আমিও ক্লাসে ঢুকলাম। সমস্ত কোর্স শেষ করেছি, আর কোর্স নিতে হবে না। কাজেই এখন নিশ্চিন্ত মনে একটা ক্লাসে ঢোকা যায়।

বুড়ো ভদ্রলোকের নাম জেনো উইকস। পলিমার রসায়ন বিভাগের প্রধান। আমি তাঁর লেকচার শুনে মুগ্ধ। যেমন পড়ানোর ভঙ্গি তেমনই বিষয়বস্তু। দৈত্যাকৃতি অণুর বিচিত্র জগৎ। ক্লাস শেষে আমি তাকে গিয়ে বললাম, আমি আপনার বিভাগে আসতে চাই।

ভৌত রসায়নের প্রফেসর সব শুনে খুব রাগ করলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি যা করতে যাচ্ছ, খুব বড় ধরনের বোকারাও তা করে না। পিএইচডির কাজ তোমার অনেক দূর এগিয়েছে। কোর্স ওয়ার্ক শেষ করেছ এবং খুব ভালোভাবে করেছ। এখন বিভাগ বদলাতে চাও কেন? মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফেলে দাও।

আমি ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। ঢুকে গেলাম পলিমার রসায়নে। প্রফেসর জেনো উইকস অনেক করলেন। আমাকে ভালো একটা স্কলারশিপ দিলেন। বইপত্র দিয়ে সাহায্য করলেন। কাজ শুরু করলাম পলিমার রসায়নের আর এক জাঁদরেল ব্যক্তি প্রফেসর গ্লাসের সঙ্গে। পলিমারের সব কোর্স যখন নিয়ে শেষ করেছি তখন প্রফেসর গ্লাস আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, মাই ডিয়ার সান, দয়া করে এখন শখের বশে অন্য কোনো ক্লাসে গিয়ে বসবে না। ডিগ্রি শেষ করো। আরেকটা কথা, আমেরিকান সিটিজেনশিপ পাওয়ার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

আমি বললাম, আমেরিকান সিটিজেনশিপ দিয়ে আমি কী করব?

'তুমি চাও না?'

'না, আমি চাই না। ডিগ্রি শেষ হওয়ামাত্র আমি দেশে ফিরে যাব।'

'বিদেশী ছাত্ররা শুরুতে সবাই এ রকম বলে। শেষে আর যেতে চায় না।'

'আমি চাই।'

ডিগ্রি শেষ করে দেশে ফিরলাম। সাত বছর আমেরিকায় কাটিয়ে যে সম্পদ নিয়ে ফিরলাম তা হলো নগদ পঞ্চাশ ডলার, দুই স্যুটকেস ভর্তি বাচ্চাদের পুরানো খেলনা, এক স্যুটকেস বই এবং প্রচুর চকলেট।

আমি যে সব সময় ইমপালসের উপরে চলি তা কিন্তু না। কাজে-কর্মে, চিন্তাভাবনায় আমি শুধু যে গোছানো তা না, অসম্ভব গোছানো। কখন কী করব, কতক্ষণ করব তা আগেভাগে ঠিক করা। কঠিন রুটিন। সময় ভাগ করা, তারপরেও হঠাৎ হঠাৎ কেন জানি মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। উদ্ভট একেকটা কাণ্ড করে বসি। কোনো সুস্থ মাথার মানুষ যা কখনো করবে না। (সংক্ষেপিত)

সূত্র: অনন্ত অম্বরে বই থেকে পুনর্মুদ্রিত

সফলদের স্বপ্নগাথা

পৃথিবীর একজন নায়ক প্রয়োজন : স্ট্যান লি

৩০ অক্টোবর ২০১৬

মার্কিন কমিক বই লেখক ও মার্ভেল কমিকসের সাবেক প্রেসিডেন্ট স্ট্যান লি। স্পাইডারম্যান, এক্স ম্যান, হাল্ক, আয়রনম্যান, ডক্টর স্ট্রেঞ্জের মতো দুনিয়া-কাঁপানো সব চরিত্রের অন্যতম স্রষ্টা তিনি। পড়ুন এক সুপারহিরো কারিগরের জীবনের গল্প

আমি বড় হয়েছি নিউইয়র্ক শহরে। খুব ছোটবেলার স্মৃতি যখন স্মরণ করি, চোখে একটাই দৃশ্য ভাসে—বাড়িভাড়ার টাকা জোগাড় করতে না পেরে মা-বাবা হতবিহ্বল হয়ে বসে আছেন। আমাদের কখনো ঘরছাড়া হতে হয়নি, সেটাকে একটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। তবে বাবাকে বেশির ভাগ সময় বেকার থাকতে দেখেছি। অতএব, হাইস্কুলে পড়ার সময়ই আমাকে কাজের সন্ধানে নামতে হয়েছিল।

আমার মায়ের চেয়ে ভালো মা আর হয় না। তাঁর ধারণা ছিল, পৃথিবীর দোপেয়ে প্রাণীগুলোর মধ্যে আমিই সেরা! যদি স্কুলে ছোট্ট একটা রচনা লিখতাম, মা দেখে বলতেন, 'চমৎকার! তুমি তো আগামী দিনের শেক্সপিয়ার!' ফলে খুব ছোটবেলায়ই যা হওয়ার তা-ই হলো। বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, আমি সব পারি!

মার্টিন গুডম্যান ছিলেন আমার কাজিনের স্বামী। তিনি টাইমলি পাবলিকেশনস নামের একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। 'কমিক বুক' বিভাগে কাজের জন্য তারা একজন সহকারী খুঁজছিল। আমি ভাবলাম, যোগ দিয়েই দেখি। তখন এই বিভাগে দুজন কাজ করতেন। সম্পাদক জো সিমন ও আঁকিয়ে জ্যাক কারবি। তারা তখন ক্যাপ্টেন আমেরিকা চরিত্রটা নিয়ে কাজ করছিল। আর আমি? আমার কাজ ছিল কলমে কালি ভরা, নিচে গিয়ে খাবার কিনে আনা আর প্রুফ রিড করা।

ঘটনাক্রমে সিমন আর কারবির চাকরি চলে গেল। কমিক বুক বিভাগটা চালানোর জন্য মার্টিনের হাতে তখন আর কেউ ছিল না। মার্টিন বলল, 'তুমি কি দায়িত্বটা নিতে পারো?' সতেরো বছর বয়সে কোনো কিছুই অসম্ভব মনে হয় না। সুতরাং আমি বললাম, 'পারব।'

নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা পেলাম। আমার বেশ লাগত। শুধু কেউ যখন এসে জিজ্ঞাসা করত, 'এই যে খোকা, সম্পাদক সাহেব কি আছেন?' খুব লজ্জা পেতাম!

আমি যখন কাজ শুরু করি, সুপারম্যান তত দিনে তৈরি হয়ে গেছে। হিউম্যান টর্চ, সাব-মেরিনার, ফাদার টাইম, হারিকেনের মতো বাজারে বেশ কিছু চরিত্র ছিল। তখন প্রচ্ছদকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। ধরে নেওয়া হতো, প্রচ্ছদ আর নাম দেখেই পাঠক বইটা কিনবে। হারিকেন চরিত্রটা খুব জোরে দৌড়াতে পারত। একসময় আমি নতুন সুপারহিরো তৈরির দিকে মনোযোগ দিলাম। হঠাৎ ভাবলাম, দেয়ালে হাঁটতে পারে, এমন একটা চরিত্র তৈরি করলে কেমন হয়? কোন নামটা মানুষকে আকর্ষণ করবে? মসকিউটো ম্যান? ফ্লাই ম্যান? নাহ, কোনো নামই পছন্দ হচ্ছিল না। সব শেষে যে নামটা বেছে নিলাম, সেটা... স্পাইডারম্যান!

মার্টিন আমার দেখা সবচেয়ে অনুকরণপ্রিয় মানুষ। সে অন্ধের মতো অন্যের সাফল্য অনুকরণ করত। বাজারে কী চলছে? হরর গল্প? রহস্য গল্প? যুদ্ধের গল্প? অন্যরা যা করছে, মার্টিনেরও তা-ই করা চাই। কিন্তু আমি নিজের মতো কিছু করতে চাইতাম।

চাকরিজীবনের ২০ বছর পর একদিন স্ত্রীকে বললাম, ‘এভাবে আসলে চলছে না। ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব।’ আমার স্ত্রী তখন আমাকে জীবনের সেরা উপদেশটা দিল, ‘এক কাজ করো। মার্টিনের কথার তোয়াক্কা না করে তুমি নিজের ইচ্ছামতো একটা কিছু করো। কী আর হবে? বড়জোর সে তোমাকে চাকরিচ্যুত করবে। তুমি তো এমনিতেও চাকরিটা ছাড়তেই চাইছ।’ তখন ডিসি কমিকসের একটা বই ছিল–জাস্টিস লিগ , একদল সুপারহিরোর গল্প। বেশ ভালো চলছিল বইটা। তাই **১৯৬১** সালে আমরা শুরু করলাম দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর। আমি চরিত্রগুলো একটু অন্য রকম করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম এমন সব চরিত্র তৈরি করতে, যাদের জীবন বাস্তবসম্মত আবেগ, সমস্যায় জর্জরিত। বইটা পাঠকের নজরে এল। একে একে বাজারে আনলাম এক্স ম্যান, দ্য হাল্ক। আমরা আর এমন একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকলাম না, যেটা স্রেফ অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুকরণ করে।
আমি সব সময় বিশ্বাস করি, ‘সৌভাগ্য’ হলো সবচেয়ে বড় শক্তি। কারও ভাগ্য ভালো হলে

ভিলেনের গুলি তার কাছে ঘেঁষবে না, অনায়াসে সে যেকোনো রহস্য সমাধান করে ফেলবে। সৌভাগ্যের চেয়ে বড় ‘সুপার পাওয়ার’ আর কী হতে পারে? যদিও ‘লাকিম্যান’ এর কস্টিউম কেমন হবে, সেটা ভেবে বের করতে পারিনি।
ভালো আর খারাপের যুদ্ধ–এই গল্প মানুষের সব সময় প্রিয়। গল্পের শেষে তারা সব সময় ‘ভালো’র জয় দেখতে চায়। আমি মনে করি, পৃথিবীর এখন একজন নায়ক প্রয়োজন। ‘সুপারহিরো’ হতে হবে, সেটা বলছি না। ‘হিরো’ হলেই চলবে। যদি ইতিহাস দেখেন, দেখবেন মন্দ শক্তিটার সব সময় ‘সুপার পাওয়ার’ ছিল। সাধারণ মানুষই ‘সুপার পাওয়ার’ কে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। (সংক্ষেপিত)

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ

সূত্র: আইএনসি ডটকম

নিজের আগ্রহকে গুরুত্ব দাও

মারিসা মেয়ার

ইয়াহু’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা [। জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনে ১৯৭৫ সালের ৩০ মে। সার্চ জায়ান্ট গুগলের প্রথম দিককার কর্মীদের একজন মারিসা। স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন তিনি। ২০১৪ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশ্বের প্রভাবশালী নারীদের তালিকায় তাঁর অবস্থান ১৮ তম

সবাইকে অভিনন্দন। বিশ্ব বিখ্যাত কলেজ থেকে তোমাদের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা আজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মাননা পেতে যাচ্ছ। তুমি, তোমার শিক্ষক আর বন্ধু-পরিবারের মতোই আমিও আজ এই সমাবর্তনে থাকতে পেরে সম্মানিত। নিজের পথ খুঁজে বের করার জন্য গ্র্যাজুয়েশন জীবনের অনন্য এক ঘটনা। আমরা সবাই জানি, কিছু খোঁজার চেষ্টা থেকেই আমরা কিছু না কিছু পাই। যে কারণেই সম্ভবত আমি এখানে। আর গুগল তো পুরোটাই খোঁজাখুঁজির কাজ কারবার। আজ তোমাদের আমি আমার জীবনের

কয়েকটি গল্প আর কথা শোনাতে চাই।
প্রথমে খুঁজে বের কর আজ এখানে পৌঁছাতে তোমাদের কী কী করতে হয়েছে। এখানে পৌঁছাতে ১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৩০টি কোর্স নিয়ে পড়াশোনা তো ছিলই। শুধু পড়াই নয়, ভালোভাবে সেই বাঁধন অতিক্রম করতে হয়েছে। কত না বিচিত্র ধরনের বিষয়ে পড়তে হয়েছে। দিনের পর দিন নিজের শক্তি, চকলেট, কফি আর পিৎজার পেছনে তোমাদের সময় দিতে হয়েছে। রাত জেগে পড়াশোনা, ইন্টার্নশিপ, রুমমেটদের নিয়ে কতই না ব্যস্ত সময় পার করেছ সবাই। আজকে সেসব কথা ভুলে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য একটা বড় হাততালি দাও। তোমরা আজ নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর সব ধরনের শক্তি আর জ্ঞান অর্জন করেছ।
তোমাদের আমি বলতে চাই, তুমি যা করতে আগ্রহী তাই খুঁজে বের করো। এই আগ্রহের পথটাই খুঁজে বের করা জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। আমি এক বিজ্ঞান ক্যাম্প করার সময় আমার জীবনের আগ্রহের কথা খুঁজে পাই। আমি বিজ্ঞানের প্রতি ভীষণ আগ্রহী ছিলাম। বড় পাগল ছিলাম। বিজ্ঞানের সবকিছুতেই ছিল আমার ভীষণ ভীষণ আগ্রহ আর আনন্দ। হাইস্কুলে পড়ার সময় আমি প্রথম জাতীয় যুব বিজ্ঞান ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ পাই। হাজার ধরনের মানুষের সঙ্গে আমি গল্প করার সুযোগ পাই তখন। আমি জুন নগুয়েন নামে এক মেধাবী লেকচারারের সঙ্গে পরিচিত হই। সে ছিল পেশাজীবনে চিকিৎসক আর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। তিনি আমাকে চীনা এক প্রবাদবাক্য একটু বদলে শুনিয়েছিলেন, 'মানুষ যা জানে সে তা নয়, মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সে তাই'। সেই কথা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়ও সারাক্ষণ মাথায় ঘুরত।
আমি চিকিৎসক হতে চেয়েছিলাম বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন আর জীববিজ্ঞানের সব কোর্স নিয়েছিলাম। সবকিছু জানার চেষ্টা করতাম। বিজ্ঞান, প্রকৃতি আর পৃথিবী নিয়ে ভাবতাম। তখনই প্রথম বিশ্বাস করা শুরু করেছিলাম–মানুষ যা জানে সে তা নয়, মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সে তাই। সবকিছু জানার কৌতূহল থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানের কোর্সেও অংশ নিই। পড়তে পড়তে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠি। আগ্রহ থাকার কারণেই চিকিৎসক না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। সেই ডিগ্রিই আমাকে গুগলে নিয়ে যায়।
নিজের আগ্রহ খুঁজতে তোমাকে প্রথমেই নিজের সঙ্গে সৎ থাকতে হবে। আর নিজের চারপাশে মেধাবী মানুষদের একটা বলয় গড়ে তোলো। মেধাবীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে, তোমার কাছ থেকেও তারা শিখতে পারবে। আমার বন্ধু লরা বেকম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভলিবল দলে চান্স না পেলেও প্রতিনিয়ত সে খেলত। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে লরা ভলিবল দলে সুযোগ পায়। সে দলে ঢোকার সুযোগ না পেয়েও কেন

খেলত এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলেছিল, ‘আমি জানি আমি একসময় ভলিবল দলের সদস্য হবই। আর সে জন্য প্রতিদিন দলের ভালো ভালো খেলোয়াড়ের সঙ্গে অনুশীলন আমাকে আরও শক্ত খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলে।’ আমিও বিশ্বাস করি, চারপাশে যখন একদল মেধাবী কর্মঠ মানুষ কাজ করে তখন আমিও ধীরে ধীরে তাদের মতো হয়ে উঠি। আর সেই কারণেই বলতে চাই, নিজে মেধাবী মানুষদের সঙ্গে মিশো, কাজ করো।

গুগলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি আর সের্গেইও কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সকালে পিৎজা খেতেন, গোসল করতেন না। এমনকি কারও সঙ্গে ধাক্কা খেলে দুঃখ প্রকাশ করেও কিছু বলতেন না। এখন তাঁরা বড় ব্যবসায়ী, কিন্তু নিজের লক্ষ্যে তাঁরা অটুট। তাঁরা নিজেরা যেমন প্রতিভাবান, তেমনি চারপাশে একদল প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে কাজ করেন। মেধাবী মানুষের সঙ্গে কাজ করে নিজের মেধাকে আরও বিকশিত করা যায়। আরেকটা কথা, নতুন বন্ধু, নতুন সহকর্মী, নতুন মানুষদের সঙ্গে মিশে নিজেকে অনেক বদলে ফেলার সুযোগ আমাদের নেওয়া উচিত। সামনে অনেক সুযোগ আছে, তুমি খুঁজে বের করে তা লুফে নাও। সুযোগ নিজে নিজে সামনে আসে না, খুঁজতে থাকো দেখবে সুযোগ ধরা দেবেই।

আর তোমার সাহস তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যা তৈরি নেই, তা করার সাহস তোমার নিজের মধ্যে আনতে হবে। আমি জীবনে চারটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যার জন্য নিজেই প্রস্তুত ছিলাম না। ১৮ বছর বয়সে বাড়ি থেকে দুই হাজার মাইল দূরের কলেজে পড়তে যাই। জীববিজ্ঞান আর রসায়নে পড়ার জন্য ভীষণ আগ্রহী হলেও অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করি। জার্মান না জানা সত্ত্বেও সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ইন্টার্ন হিসেবে গবেষণা করতে যাই। সর্বশেষ, ১৯৯৯ সালে মাস্টার্স শেষ করে গুগল নামে এমন এক উদ্ভট প্রতিষ্ঠানে যোগ দিই, যার মোট কর্মী তখন ছিল আটজন। সব সিদ্ধান্তই আমি নিজেই নিয়েছিলাম। নিজের ওপর ভরসা রেখে সামনে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করেছিলাম। প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার আগ্রহই আমাদের অনেক কিছু শেখায়। অনুকূল পরিবেশ আসলেই তো কিছু নতুন শেখা যায় না। তোমাদের বলতে চাই, এমন কিছু করো, যা তোমার জন্য তৈরি নয়, অনুকূল নয়।

সর্বশেষ নিজেকে তথ্যের ঝরনা হিসেবে গড়ে তোলো। সব ধরনের তথ্য জানার চেষ্টা করো। সৃজনশীলতা আর উদ্ভাবনী কাজই এখন পৃথিবী বদলে দিতে পারে। অন্যকে সাহায্য, তথ্য সহযোগিতা আসলে তোমার নিজেরই বুদ্ধিমত্তাকে বাড়ায়।

আমি প্রত্যাশা করি তোমরা নিজের সাহস, লক্ষ্য খুঁজে বের করতে পারবে। আমি আশাবাদী তোমরা পৃথিবীকেও নতুন প্রত্যয়ে বদলে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

একজন চে গুয়েভারা

চে গুয়েভারার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল গত ৯ অক্টোবর। বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্ম ১৪ জুন ১৯২৮ আর্জেন্টিনায়। ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর বলিভিয়ায় তাঁকে আহত অবস্থায় আটক করে হত্যা করা হয়।

চে গুয়েভারার নাম শুনলেই চোখে ভাসে একজন রোমান্টিক-বিপ্লবীর অবয়ব। ১৯৬৭ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়, কিন্তু দশকের পর দশকজুড়ে চে হয়ে রয়েছেন তারুণ্যের প্রতীক। যে তরুণ স্বপ্ন দেখে, যে তরুণ সবার জন্য সমান একটি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে চায়, তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন চে।

বিপ্লবী চে'র জীবনী পড়েছেন অনেকেই। আর্জেন্টিনার এই দুঃসাহসী তরুণ চিকিৎসক কীভাবে কিউবা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হলেন, কীভাবে রাষ্ট্রের বড় পদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে পৃথিবীময় বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখলেন, সে কথা অজানা নয় কারও কাছে। এ যুগে অন্তর্জালে কিছুক্ষণ ঘুরলেই চে'কে নিয়ে ভূরি ভূরি কাহিনির সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানে আমরা কেবল তাঁর জীবনের অল্প কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি, যাতে এই রোমান্টিক-বিপ্লবীর

জীবনদর্শনের দিকে এক ঝলক তাকানো যায়।

হাঁপানি ছিল চে গুয়েভারার নিত্যসঙ্গী। এই রোগের কারণে প্রথম দুই বছর স্কুলে যেতে পারেননি, পড়াশোনা করেছেন বাড়িতে বসে। সারা জীবন তিনি এই রোগ বয়ে বেড়িয়েছেন। আর্জেন্টিনায় জন্ম নেওয়া এই বিপ্লবী মাত্র ১১ বছর বয়সে এক বিচিত্র কারণে কিউবার প্রতি অনুরক্ত হন। কিউবার দাবা খেলোয়াড় কাপাব্লাংকা এসেছিলেন বুয়েনস এইরেসে। চে ছিলেন দাবার দারুণ ভক্ত। কাপাব্লাংকার আগমন তাঁকে কিউবা সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল।

মাত্র চার বছর বয়স থেকেই বইয়ের সাগরে বুঁদ হয়ে থাকতে পেরেছেন চে। বাড়িতে ছিল কয়েক হাজার বই। তাই বইয়ের সঙ্গে মিতালি পাতাতে কোনো সমস্যাই হয়নি তাঁর। কবিতা পছন্দ করতেন তিনি। নিজেও লিখতেন কবিতা।বিজ্ঞানের প্রতি দারুণ আকর্ষণ ছিল তাঁর। বিশেষ করে গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়গুলোর অন্যতম। কিন্তু পড়াশোনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানকে।

প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ ছিল এর্নেস্তো চে গুয়েভারার। সুযোগ পেলেই রেড ইন্ডিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে চলে যেতেন।

অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে হয়েও চিকিৎসক হিসেবে সনদ পাওয়ার পর তিনি চলে গিয়েছিলেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের।

চে সম্পর্কে কত কিছুই তো বলা যায়। তবে তাঁর বলা একটি কথা দিয়েই এই ছোট্ট লেখাটি শেষ করি, 'অনেকেই আমাকে রোমাঞ্চপিয়াসী বলে ভাবেন। হ্যাঁ, আমি রোমাঞ্চপিয়াসী, তবে অন্য ধরনের। আমি সেই ধরনের রোমাঞ্চপিয়াসী, যে সত্যকে প্রমাণ করার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রাখে।'

সূত্র: রুশ ওয়েবসাইট neobychno.com

সফলতার জন্য তিন প্রশ্ন

সাইমন সিনেক

সাইমন সিনেক একজন পেশাদার লেখক ও বক্তা, বর্তমানে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ কৌশল বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন। জন্ম ১৯৭৩ সালের ৯ অক্টোবর ইংল্যান্ডে। এই বক্তৃতা তিনি দেন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, ওয়াশিংটনে ।

কেমন লাগে যখন কোনো কাজই মনের মতো হয় না? অথবা, যখন আপনার মতোই কেউ এমন কোনো অসাধ্য সাধন করে ফেলে. যা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না? সব হিসাব-নিকাশ উল্টে দিয়ে এমন কিছু ব্যাপার সব সময়ই ঘটে, যা আমরা সাধারণ নিয়মে মেলাতে পারি না। স্টিভ জবসের অ্যাপলের কথাই ধরা যাক, বছরের পর বছর অ্যাপল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর চেয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অনেক ধাপ এগিয়ে আছে। কী এমন আছে অ্যাপলের, যা তাদের আর সবার চেয়ে আলাদা করে রেখেছে? অথবা রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের অ্যারোপ্লেন আবিষ্কারের কাহিনি। তখনকার দিনে অসংখ্য আবিষ্কারক ছিল, তাদের নিজেদের অতুলনীয় যোগ্যতা আর পৃষ্ঠপোষকের টাকার জোর থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ই মানুষের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের প্রচলিত

ধ্যান-ধারণার বাইরেও কিছু একটা এখানে কাজ করছে। দুনিয়া কাঁপানো সব নেতৃত্ব কিংবা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো, এদের সবার মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। তারা সবাই একইভাবে চিন্তা করে, কাজ করে আর নিজেদের উপস্থাপন করে, যা কি না বাকি সব মানুষের থেকে শুধু ভিন্নই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত!
কেন? কীভাবে? কী? এই ছোট্ট তিনটি প্রশ্নই বলে দেয় কেন কেউ সফল হয় আর কেউ হয় না। শুরু করা যাক 'কী' থেকে। আমরা সবাই জানি, আমাদের কাজটা কী, আমরা আসলে কী করছি। কেউ কেউ জানি যা করছি, তা কীভাবে করছি, ঠিক কীভাবে এই কাজটা করতে হয়। কিন্তু কজন জানি যে আমরা যা করছি, তার পেছনে মূল উদ্দেশ্যটা কী? কাজটা কেন করছি আমরা? 'কেন', এই প্রশ্নটি যত সরল মনে হয়, আসলে মোটেও তেমন নয়। 'কেন'– এই প্রশ্নের উত্তরই বলে দেয় আমাদের লক্ষ্য কোনটি, আমাদের বিশ্বাস কী, আমাদের অস্তিত্বের কারণ কী। আর লক্ষ্য সম্পর্‌্কে এমন পরিষ্কার ধারণা খুব কম মানুষেরই থাকে। আমরা আগে ভাবি কী করতে হবে, তারপর ভাবি কীভাবে করতে হবে, কিন্তু কেন করতে হবে আর করলে তা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাটিই আমাদের মাথায় আসে না। শুধু ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সময়ও আমরা উল্টোভাবে চলি। যার ফলাফল দাঁড়ায়, আমরা শুধু আমাদের কথাই বলে যাই, আমরা ভেবে দেখি না, আমরা অন্যকে যা করতে বলছি, সে তা কেন করবে।
আমাদের সচরাচর কথাবার্তার সঙ্গে অ্যাপলের বিজ্ঞাপনগুলোর একটু তুলনা করে দেখুন। অ্যাপল যদি আমাদের মতো 'কী' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করত, তাহলে তাদের বলতে হতো, 'আমরা দারুণ সব কম্পিউটার বানাই। এগুলোর ডিজাইন সুন্দর আর ব্যবহারও সহজ।' এমন গৎবাঁধা কথা বললে আদৌ কি কেউ অ্যাপলের কম্পিউটার কিনত? একেবারেই না! অথচ আমরা সবাই এভাবেই কথা বলছি সারা দিন! আমরা বলতে থাকি আমরা কী করি, আমরা অন্যদের চেয়ে কীভাবে আলাদা আর এসব বলেই আমরা আশা করি সবাই আমাদের কথায় ইতিবাচক সাড়া দেবে, আমাদের কথামতো কাজ করবে, বা আমাদের কাছ থেকে কিছু কিনবে। কিন্তু আসলে এভাবে মানুষকে কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করা যায় না।
আমরা কী করি, তার চেয়ে মানুষের মনে অনেক বেশি নাড়া দেয়, আমরা কাজটি কেন করি। অ্যাপল নিজেদের তুলে ধরে উদ্ভাবন আর ভিন্নতার এক অনন্য সমন্বয় হিসেবে। তারা প্রচলিত ধারণার বাইরে ভিন্নতায় বিশ্বাস করে আর এই বিশ্বাসই তাদের আর ১০টি কম্পিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানির চেয়ে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কম্পিউটার প্রয়োজন এমন যে কারও কাছেই নিজেদের পণ্য গছিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাপল কোনো চেষ্টাই করে না। তারা ঠিক তাদের সঙ্গেই ব্যবসা করে, যারা অ্যাপলের ভিন্নতা আর বৈশিষ্ট্যে

বিশ্বাস করে।

মানুষের মস্তিষ্কের গঠনটাই এ রকম যে ভাষা বুঝতে পারা আর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে মস্তিষ্কের বাইরের অংশে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মস্তিষ্কের ভেতরের অংশে, যা কি না সব অনুভূতির উৎপত্তিস্থল। মজার ব্যাপার হলো যে অংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সম্পাদন করা হয়, তার সঙ্গে ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ গালভরা বুলি কিংবা জটিল সব তথ্য-উপাত্ত দিয়ে কাউকে কোনো কিছু প্রমাণ করে দেখালেও সে বলতে পারে, 'ব্যাপারটা কেন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না।' এই 'মনে হওয়া'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দীপক। তাই কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে প্রথমে আপনার নিজের ভেতর যে বিশ্বাস কাজ করে, তাকেও সেই বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হবে। তারপর আসবে যুক্তি আর তথ্য উপস্থাপন করে বোঝানোর পালা। যদি আপনি কোনো কাজে এমন কাউকে নিয়োগ দেন যে কাজটি করার যোগ্যতা রাখে, তবে সে বেতন পাওয়ার জন্যই কাজ করবে। কিন্তু যদি এমন কেউ থাকে যে কাজটি পারে এবং আপনি যে কারণে কাজটি করতে উৎসাহী, সেই উৎসাহ তার ভেতরে আছে, একই বিশ্বাসে সেও বিশ্বাস করে; তাহলে সেই ব্যক্তি তার জীবন দিয়ে আপনার জন্য কাজ করে যাবে, শুধুই বেতনের জন্য নয়। আর কেউ যখন নিজের ভেতরের তাড়নায় কাজ করে, সে কাজে সাফল্য অবধারিত।

১৯৬৩ সালে লুথার কিং যখন ওয়াশিংটনের তাঁর বর্ণবাদবিরোধী অমর বক্তব্য দেন, সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছিল তাঁর কথা শোনার জন্য। তখনকার দিনে এত মানুষ কীভাবে একত্র হতে পেরেছিল? কেউ তাদের কোনো আমন্ত্রণ পাঠায়নি, লুফার কিং কোনো নামকরা বক্তাও ছিলেন না। তিনি শুধু সবার কাছে একটি কথাই প্রচার করেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি...'। তাঁর বিশ্বাস আর চিন্তা যাঁদের গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল, যাঁরা সেই বিশ্বাসকে নিজেদের বিশ্বাসে পরিণত করেছিলেন, তাঁরাই সেই ধারণাকে তাঁদের চারপাশের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। শেষপর্যন্ত প্রায় অখ্যাত, অপরিচিত এক বক্তার কথা শোনার জন্য সমবেত হয় প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। তাঁদের কেউই লুথার কিংয়ের আকর্ষণে সেখানে হাজির হননি। তাঁরা এসেছিলেন তাঁদের নিজেদের জন্য, বর্ণবাদের অসারতায় তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসই তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই জনসভায়। আর এখনকার দিনের রাজনীতিবিদদের বক্তৃতার অবস্থা দেখুন! তাঁদের প্রতিশ্রুতির পাহাড় আর বড় বড় পরিকল্পনার কাহিনি জনগণকে আর এতটুকুও উজ্জীবিত করতে পারে না।

প্রকৃত নেতাকে জনতা অনুসরণ করে কোনো বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে নয়। তারা স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে, বিশ্বাস করেই নেতাকে সমর্থন জানায়। আর যে 'কেন' প্রশ্নের উত্তর জেনে পথ চলা শুরু করে, কেবল সেই পারে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে, অথবা এমন কাউকে খুঁজে

নিতে যে তাকে অনুপ্রাণিত করে।
সবাইকে ধন্যবাদ।
সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো

স্টিভ জবস

তোমাকে খুজে বের করতে হবে তুমি কোনটা ভালোবাসো

স্টিভ জবস (February 24, 1955 – October 5, 2011) বিশ্বখ্যাত কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল ও অ্যানিমেশন স্টুডিও পিক্সারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। অ্যানিমেশন স্টুডিও পিক্সারের মাধ্যমে টয় স্টোরি, ফাইন্ডিং নিমো, মনস্টার ইনকরপোরেটেড, ওয়াল-ই, আপ-এর মতো অসাধারণ অ্যানিমেশন তৈরি করেছেন। প্রযুক্তি মনা হওয়ার কারনে হোক আর যে ভাবে হোক, স্টিব জবসকে অনেক ভালো লাগে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন - ২০০৫ সালে দেওয়া স্টিভ জবস এর বক্তৃতা দিয়েই শুরু করলাম। সে বছর ১২ জুন এক ঝাঁক তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যে ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন, সেটি সত্যিই অসাধারণ। **ভাষান্তর করেছেন সিমু**

নাসের। প্রথমেই একটা সত্য কথা বলে নিই। আমি কখনোই বিশ্ববিদ্যালয় পাস করিনি। তাই সমাবর্তন জিনিসটাতেও আমার কখনো কোনো দিন উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। এর চেয়ে বড় সত্য কথা হলো, আজকেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সবচেয়ে কাছে থেকে দেখছি আমি। তাই বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। কোনো কথার ফুলঝুরি নয় আজ, স্রেফ তিনটা গল্প বলব আমি তোমাদের। এর বাইরে কিছু নয়।

আমার প্রথম গল্পটি কিছু বিচ্ছিন্ন বিন্দুকে এক সুতায় বেঁধে ফেলার গল্প। ভর্তি হওয়ার ছয় মাসের মাথাতেই রিড কলেজে পড়ালেখায় ক্ষ্যান্ত দিই আমি। যদিও এর পরও সেখানে আমি প্রায় দেড় বছর ছিলাম, কিন্তু সেটাকে পড়ালেখা নিয়ে থাকা বলে না। আচ্ছা, কেন আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লাম?

এর শুরু আসলে আমার জন্মেরও আগে। আমার আসল মা ছিলেন একজন অবিবাহিত তরুণী। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাকে এমন কারও কাছে দত্তক দেবেন, যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে। সিদ্ধান্ত হলো এক আইনজীবী ও তাঁর স্ত্রী আমাকে দত্তক নেবেন। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে দেখা গেল, ওই দম্পতির কারোরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই, বিশেষ করে আইনজীবী ভদ্রলোক কখনো হাইস্কুলের গণ্ডিই পেরোতে পারেননি। আমার মা তো আর কাগজপত্রে সই করতে রাজি হন না। অনেক ঘটনার পর ওই দম্পতি প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁরা আমাকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন, তখন মায়ের মন একটু গলল। তিনি কাগজে সই করে আমাকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

এর ১৭ বছর পরের ঘটনা। তাঁরা আমাকে সত্যি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বোকার মতো বেছে নিয়েছিলাম এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়, যার পড়ালেখার খরচ প্রায় তোমাদের এই স্ট্যানফোর্ডের সমান। আমার দরিদ্র মা-বাবার সব জমানো টাকা আমার পড়ালেখার পেছনে চলে যাচ্ছিল। ছয় মাসের মাথাতেই আমি বুঝলাম, এর কোনো মানে হয় না। জীবনে কী করতে চাই, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা এ ব্যাপারে কীভাবে সাহায্য করবে, সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। অথচ মা-বাবার সারা জীবনের জমানো সব টাকা এই অর্থহীন পড়ালেখার পেছনে আমি ব্যয় করছিলাম। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মনে হলো যে এবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সিদ্ধান্তটা ভয়াবহ মনে হলেও এখন আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়,

এটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডিগ্রির জন্য দরকারি কিন্তু আমার অপছন্দের কোর্সগুলো নেওয়া বন্ধ করে দিতে পারলাম, কোনো বাধ্যবাধকতা থাকল না, আমি আমার আগ্রহের বিষয়গুলো খুঁজে নিতে লাগলাম।

পুরো ব্যাপারটিকে কোনোভাবেই রোমান্টিক বলা যাবে না। আমার কোনো রুম ছিল না, বন্ধুদের রুমের ফ্লোরে ঘুমোতাম। ব্যবহৃত কোকের বোতল ফেরত দিয়ে আমি পাঁচ সেন্ট করে কামাই করতাম, যেটা দিয়ে খাবার কিনতাম। প্রতি রোববার রাতে আমি সাত মাইল হেঁটে হরেকৃষ্ণ মন্দিরে যেতাম শুধু একবেলা ভালো খাবার খাওয়ার জন্য। এটা আমার খুবই ভালো লাগত। এই ভালো লাগাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রিড কলেজে সম্ভবত দেশে সেরা ক্যালিগ্রাফি শেখানো হতো সে সময়। ক্যাম্পাসে সাঁটা পোস্টারসহ সবকিছুই করা হতো চমৎকার হাতের লেখা দিয়ে। আমি যেহেতু আর স্বাভাবিক পড়ালেখার মাঝে ছিলাম না, তাই যে কোনো কোর্সই চাইলে নিতে পারতাম। আমি ক্যালিগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেরিফ ও স্যান সেরিফের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে স্পেস কমানো-বাড়ানো শিখলাম, ভালো টাইপোগ্রাফি কীভাবে করতে হয়, সেটা শিখলাম। ব্যাপারটা ছিল সত্যিই দারুণ সুন্দর, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা আর্ট। আমি এর মধ্যে মজা খুঁজে পেলাম।

এ ক্যালিগ্রাফি জিনিসটা কোনো দিন বাস্তবজীবনে আমার কাজে আসবে—এটা কখনো ভাবিনি। কিন্তু ১০ বছর পর আমরা যখন আমাদের প্রথম ম্যাকিন্টোস কম্পিউটার ডিজাইন করি, তখন এর পুরো ব্যাপারটাই আমার কাজে লাগল। ওটাই ছিল প্রথম কম্পিউটার, যেটায় চমৎকার টাইপোগ্রাফির ব্যবহার ছিল। আমি যদি সেই ক্যালিগ্রাফি কোর্সটা না নিতাম, তাহলে ম্যাক কম্পিউটারে কখনো নানা রকম অক্ষর (টাইপফেইস) এবং আনুপাতিক দূরত্বের অক্ষর থাকত না। আর যেহেতু উইন্ডোজ ম্যাকের এই ফন্ট সরাসরি নকল করেছে, তাই বলা যায়, কোনো কম্পিউটারেই এ ধরনের ফন্ট থাকত না। আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় না ছাড়তাম, তাহলে আমি কখনোই ওই ক্যালিগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হতাম না এবং কম্পিউটারে হয়তো কখনো এত সুন্দর ফন্ট থাকত না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সুতায় বাঁধা অসম্ভব ছিল, কিন্তু ১০ বছর পর পেছনে তাকালে এটা ছিল খুবই পরিষ্কার একটা বিষয়।

আবার তুমি কখনোই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে এক সুতায় বাঁধতে পারবে না। এটা কেবল পেছনে তাকিয়েই সম্ভব। অতএব, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একসময় ভবিষ্যতে গিয়ে একটা অর্থবহ জিনিসে পরিণত হবেই। তোমার

ভাগ্য, জীবন, কর্ম, কিছু না কিছু একটার ওপর তোমাকে বিশ্বাস রাখতেই হবে। এটা কখনোই আমাকে ব্যর্থ করেনি, বরং উল্টোটা করেছে।

আমার দ্বিতীয় গল্পটি ভালোবাসা আর হারানোর গল্প।

আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম। কারণ, জীবনের শুরুতেই আমি যা করতে ভালোবাসি, তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার বয়স যখন ২০, তখন আমি আর ওজ দুজনে মিলে আমাদের বাড়ির গ্যারেজে অ্যাপল কোম্পানি শুরু করেছিলাম। আমরা পরিশ্রম করেছিলাম ফাটাফাটি, তাই তো দুজনের সেই কোম্পানি ১০ বছরের মাথায় চার হাজার কর্মচারীর দুই বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হয়। আমার বয়স যখন ৩০, তখন আমরা আমাদের সেরা কম্পিউটার ম্যাকিন্টোস বাজারে ছেড়েছি। এর ঠিক এক বছর পরের ঘটনা। আমি অ্যাপল থেকে চাকরিচ্যুত হই। যে কোম্পানির মালিক তুমি নিজে, সেই কোম্পানি থেকে কীভাবে তোমার চাকরি চলে যায়? মজার হলেও আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাপল যখন বড় হতে লাগল, তখন কোম্পানিটি ভালোভাবে চালানোর জন্য এমন একজনকে নিয়োগ দিলাম, যে আমার সঙ্গে কাজ করবে। এক বছর ঠিকঠাকমতো কাটলেও এর পর থেকে তার সঙ্গে আমার মতের অমিল হতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ তার পক্ষ নিলে আমি অ্যাপল থেকে বহিষ্কৃত হলাম। এবং সেটা ছিল খুব ঢাকঢোল পিটিয়েই। তোমরা বুঝতেই পারছ, ঘটনাটা আমার জন্য কেমন হতাশার ছিল। আমি সারা জীবন যে জিনিসটার পেছনে খেটেছি, সেটাই আর আমার রইল না।

সত্যিই এর পরের কয়েক মাস আমি দিশেহারা অবস্থায় ছিলাম। আমি ডেভিড প্যাকার্ড ও বব নয়েসের সঙ্গে দেখা করে পুরো ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চাইলাম। আমাকে তখন সবাই চিনত, তাই এই চাপ আমি আর নিতে পারছিলাম না। মনে হতো, ভ্যালি ছেড়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম, আমি যা করছিলাম, সেটাই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। চাকরিচ্যুতির কারণে কাজের প্রতি আমার ভালোবাসা এক বিন্দুও কমেনি। তাই আমি আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথমে মনে না হলেও পরে আবিষ্কার করলাম, অ্যাপল থেকে চাকরিচ্যুতিটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ঘটনা। আমি অনেকটা নির্ভার হয়ে গেলাম, কোনো চাপ নেই, সফল হওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি রকমের কৌশল নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। আমি প্রবেশ করলাম আমার জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল অংশে। পরবর্তী পাঁচ বছরে নেক্সট ও পিক্সার নামের

দুটো কোম্পানি শুরু করি আমি, আর প্রেমে পড়ি এক অসাধারণ মেয়ের, যাকে পরে বিয়ে করি। পিক্সার থেকে আমরা পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার অ্যানিমেশন ছবি টয় স্টোরি তৈরি করি, আর এখন তো পিক্সারকে সবাই চেনে। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল অ্যানিমেশন স্টুডিও। এরপর ঘটে কিছু চমকপ্রদ ঘটনা। অ্যাপল নেক্সটকে কিনে নেয় এবং আমি অ্যাপলে ফিরে আসি। আর লরেনের সঙ্গে চলতে থাকে আমার চমৎকার সংসার জীবন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত, এগুলোর কিছুই ঘটত না, যদি না অ্যাপল থেকে আমি চাকরিচ্যুত হতাম। এটা ছিল খুব বাজে, তেতো একটা ওষুধ আমার জন্য, কিন্তু দরকারি। কখনো কখনো জীবন তোমাকে ইটপাটকেল মারবে, কিন্তু বিশ্বাস হারিয়ো না। আমি নিশ্চিত, যে জিনিসটা আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে, আমি যে কাজটি করছিলাম, সেটাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম। তোমাকে অবশ্যই তোমার ভালোবাসার কাজটি খুঁজে পেতে হবে, ঠিক যেভাবে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে বের করো। তোমার জীবনের একটা বিরাট অংশজুড়ে থাকবে তোমার কাজ, তাই জীবন নিয়ে সত্যিকারের সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন কাজ করা, যে কাজ সম্পর্কে তোমার ধারণা, এটা একটা অসাধারণ কাজ। আর কোনো কাজ তখনই অসাধারণ মনে হবে, যখন তুমি তোমার কাজটিকে ভালোবাসবে। যদি এখনো তোমার ভালোবাসার কাজ খুঁজে না পাও, তাহলে খুঁজতে থাকো। অন্য কোথাও স্থায়ী হয়ে যেয়ো না। তোমার মনই তোমাকে বলে দেবে, যখন তুমি তোমার ভালোবাসার কাজটি খুঁজে পাবে। যেকোনো ভালো সম্পর্কের মতোই, তোমার কাজটি যতই তুমি করতে থাকবে, সময় যাবে, ততই ভালো লাগবে। সুতরাং খুঁজতে থাকো, যতক্ষণ না ভালোবাসার কাজটি পাচ্ছ। অন্য কোনোখানে নিজেকে স্থায়ী করে ফেলো না।

আমার শেষ গল্পটির বিষয় মৃত্যু।

আমার বয়স যখন ১৭ ছিল, তখন আমি একটা উদ্ধৃতি পড়েছিলাম—‘তুমি যদি প্রতিটি দিনকেই তোমার জীবনের শেষ দিন ভাব, তাহলে একদিন তুমি সত্যি সত্যিই সঠিক হবে।’ এ কথাটা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং সেই থেকে গত ৩৩ বছর আমি প্রতিদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করি—আজ যদি আমার জীবনের শেষ দিন হতো, তাহলে আমি কি যা যা করতে যাচ্ছি, আজ তা-ই করতাম, নাকি অন্য কিছু করতাম? যখনই এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কয়েক দিন ‘না’ হতো, আমি বুঝতাম, আমার কিছু একটা পরিবর্তন করতে হবে।

পৃথিবী ছেড়ে আমাকে একদিন চলে যেতে হবে, এ জিনিসটা মাথায় রাখার ব্যাপারটাই জীবনে আমাকে বড় বড় সব সিদ্ধান্ত নিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। কারণ, প্রায় সবকিছুই যেমন, সব অতি প্রত্যাশা, সব গর্ব, সব লাজলজ্জা আর ব্যর্থতার গ্লানি–মৃত্যুর মুখে হঠাত্ করে সব নেই হয়ে যায়, টিকে থাকে শুধু সেটাই, যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার কিছু হারানোর আছে–আমার জানা মতে, এ চিন্তা দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, সব সময় মনে রাখা যে একদিন তুমি মরে যাবে। তুমি খোলা বইয়ের মতো উন্মুক্ত হয়েই আছ। তাহলে কেন তুমি সেই পথে যাবে না, যে পথে তোমার মন যেতে বলছে তোমাকে?

প্রায় এক বছর আগের এক সকালে আমার ক্যানসার ধরা পড়ে। ডাক্তারদের ভাষ্যমতে, এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই আমার। প্রায় নিশ্চিতভাবে অনারোগ্য এই ক্যানসারের কারণে তাঁরা আমার আয়ু বেঁধে দিলেন তিন থেকে ছয় মাস। উপদেশ দিলেন বাসায় ফিরে যেতে। যেটার সোজাসাপটা মানে দাঁড়ায়, বাসায় গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। এমনভাবে জিনিসটাকে ম্যানেজ করো, যাতে পরিবারের সবার জন্য বিষয়টা যথাসম্ভব কম বেদনাদায়ক হয়। সারা দিন পর সন্ধ্যায় আমার একটা বায়োপসি হলো। তাঁরা আমার গলার ভেতর দিয়ে একটা এন্ডোস্কোপ নামিয়ে দিয়ে পেটের ভেতর দিয়ে গিয়ে টিউমার থেকে সুঁই দিয়ে কিছু কোষ নিয়ে এলেন। আমাকে অজ্ঞান করে রেখেছিলেন, তাই কিছুই দেখিনি। কিন্তু আমার স্ত্রী পরে আমাকে বলেছিল, চিকিৎসকেরা যখন এন্ডোস্কোপি থেকে পাওয়া কোষগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে পরীক্ষা করা শুরু করলেন, তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করেছিলেন। কারণ, আমার ক্যানসার এখন যে অবস্থায় আছে, তা সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব। আমার সেই সার্জারি হয়েছিল এবং দেখতেই পাচ্ছ, এখন আমি সুস্থ।

কেউই মরতে চায় না। এমনকি যারা স্বর্গে যেতে চায়, তারাও সেখানে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মরতে চায় না। কিন্তু মৃত্যুই আমাদের গন্তব্য। এখনো পর্যন্ত কেউ এটা থেকে বাঁচতে পারেনি। এমনই তো হওয়ার কথা। কারণ, মৃত্যুই সম্ভবত জীবনের অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। এটা জীবনের পরিবর্তনের এজেন্ট। মৃত্যু পুরোনোকে ঝেড়ে ফেলে 'এসেছে নতুন শিশু'র জন্য জায়গা করে দেয়। এই মুহূর্তে তোমরা হচ্ছ নতুন, কিন্তু খুব বেশি দিন দূরে নয়, যেদিন তোমরা পুরোনো হয়ে যাবে এবং তোমাদের ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আমার অতি নাটুকেপনার জন্য দুঃখিত, কিন্তু এটাই আসল সত্য।

তোমাদের সময় সীমিত। কাজেই কোনো মতবাদের ফাঁদে পড়ে, অর্থাত্ অন্য কারও চিন্তাভাবনার ফাঁদে পড়ে অন্য কারও জীবনযাপন করে নিজের সময় নষ্ট কোরো না। যাদের

মতবাদে তুমি নিজের জীবন চালাতে চাচ্ছ, তারা কিন্তু অন্যের মতবাদে চলেনি, নিজের মতবাদেই চলেছে। তোমার নিজের ভেতরের কণ্ঠকে অন্যদের শেকলে শৃঙ্খলিত করো না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, নিজের মন আর ইনটুইশনের মাধ্যমে নিজেকে চালানোর সাহস রাখবে। ওরা যেভাবেই হোক, এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে, তুমি আসলে কী হতে চাও। এ ছাড়া আর যা বাকি থাকে, সবই খুব গৌণ ব্যাপার।

আমি যখন তরুণ ছিলাম, তখন দি হোল আর্থ ক্যাটালগ নামের অসাধারণ একটা পত্রিকা প্রকাশিত হতো; যেটা কিনা ছিল আমাদের প্রজন্মের বাইবেল। এটা বের করতেন স্টুয়ার্ড ব্র্যান্ড নামের এক ভদ্রলোক। তিনি তাঁর কবিত্ব দিয়ে পত্রিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

স্টুয়ার্ট ও তাঁর টিম পত্রিকাটির অনেক সংখ্যা বের করেছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, আমার বয়স যখন ঠিক তোমাদের বয়সের কাছাকাছি, তখন পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিদায়ী সেই সংখ্যার শেষ পাতায় ছিল একটা ভোরের ছবি। তার নিচে লেখা ছিল–ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। এটা ছিল তাদের বিদায়কালের বার্তা। ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। এবং আমি নিজেও সব সময় এটা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। আজ তোমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়ে আরও বড়, নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, আমি তোমাদেরও এটা মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
স্টীভ জবস নিয়ে আরো জানতে ইচ্ছে করলে নিচের লিঙ্কের লেখাটা পড়তে অনুরোধ করব। তুসিন নামক একজন ব্লগার উনাকে নিয়ে অনেক গুলো তথ্য এক সাথ করার চেষ্টা করেছেন।

যাঁরা ফেল করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভালো

বিল গেটস

বিল গেটস বিশ্বের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট করপোরেশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ৩৩ বছর পর ২০০৭ সালের ৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ফিরে আসেন ডিগ্রি অর্জনকারীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়া এবং একটি সম্মানসূচক ডিগ্রি গ্রহণের জন্য। তাঁর ভাষণের বড় অংশজুড়ে ছিল বৈশ্বিক দারিদ্র্য, রোগ-জীবাণুর মতো বিরাট সমস্যা মোকাবিলায় কীভাবে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের; বিশেষ করে তরুণদের সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়। তাঁর এ ভাষণের সংক্ষেপিত অনুবাদ ।

‘বাবা, আমি তোমাকে সব সময় বলেছি, আমি ফিরে আসব, ডিগ্রি অর্জন করব’–৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি অপেক্ষা করছি এই একটি কথা বলার জন্য।

অবশেষে আমার জীবনবৃত্তান্তে একটি কলেজ ডিগ্রি যুক্ত হলো। ব্যাপারটা দারুণ।

আজকের ডিগ্রি অর্জনকারীরা আমার চেয়ে সোজা পথে হেঁটে তা অর্জন করেছেন। এ জন্য তাঁদের অভিনন্দন। দৈনিক ক্রিমসন যে আমাকে ‘হার্ভার্ড থেকে ঝরে পড়া সবচেয়ে সফল’

ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে, এতেই আমি খুশি। আমার মনে হয়, এই শব্দগুচ্ছ আমার সমগোত্রীয়দের মধ্যে আমাকে বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছে...। যাঁরা ফেল করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালো করেছি।

কিন্তু আমি চাই, লোকে বলুক যে আমার কারণেই স্টিভ বালমার ঝরে পড়েছিলেন। আমার প্রভাব 'অশুভ'। এ জন্য হয়তো আপনাদের সমাবর্তনে আমাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আপনাদের নবীনবরণের দিনে আমি বক্তৃতা দিলে হয়তো এখানকার অনেকেই আজ এখানে থাকতেন না। আমার কাছে হার্ভার্ড এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। শিক্ষাজীবনটা ছিল আকর্ষণীয়। এমন অনেক ক্লাসে উপস্থিত হতাম, যেগুলো আমার ছিল না। ডরমিটরির জীবন ছিল দারুণ। সবাই জানতেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার তাড়া নেই আমার; তাই গভীর রাত অবধি বহুজন নানা বিষয়ে আলাপ জমাতেন আমার ঘরে। এমন করে আমি 'অসামাজিক' একদল ছাত্রের নেতা বনে গেলাম।

হার্ভার্ডে আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত আসে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে। তখন আমি আলবুকুয়েরকের এক কোম্পানিকে ফোন করে তাদের কাছে সফটওয়্যার বিক্রির প্রস্তাব করি। সেই সময় কোম্পানিটি পৃথিবীর প্রথম পারসোনাল কম্পিউটার (পিসি) তৈরি শুরু করেছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, তারা হয়তো বুঝে ফেলবে আমি এক ছাত্র আর ফোনটা রেখে দেবে। কিন্তু উল্টো বলল, 'আমরা এখনো প্রস্তুত নই, মাসখানেক পর খোঁজ নিন।' এতে বেশ ভালো হলো। কারণ, তখনো আমাদের সফটওয়্যারটির কাজ শেষ হয়নি। সেই মুহূর্ত থেকে আমি এ প্রকল্পে লেগে পড়ি। এর মধ্য দিয়ে আমার কলেজজীবনের শিক্ষার অবসান ঘটে। মাইক্রোসফটের যাত্রা শুরু হয়।

পৃথিবীতে কী সাংঘাতিক বৈষম্য আছে, সে সম্পর্কে সত্যিকারের কোনো ধারণা না নিয়েই হার্ভার্ড ছেড়েছি। স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুযোগের মর্মান্তিক বৈষম্যের কারণে কোটি কোটি মানুষ নৈরাশ্যের জীবনের দুর্ভোগ পোহায়, সে সম্পর্কে তখনো আমি সচেতন হয়ে উঠিনি।

অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন অনেক চিন্তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে হার্ভার্ডে। বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু মানবজাতির মহত্তম অগ্রগতি কোনো আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত নয়, বরং বৈষম্য কমাতে এসব আবিষ্কার কেমন কাজে লাগে সেটাই বড় কথা। গণতন্ত্র, শক্তিশালী গণশিক্ষা, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা বা বিস্তৃত অর্থনৈতিক সুযোগ– যেভাবেই হোক, বৈষম্য দূর করা হলো সর্বোচ্চ মানবিক অর্জন।

লাখ লাখ তরুণ যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, এ কথা না জেনেই আমি ক্যাম্পাস ছেড়েছি। আমি তখনো জানতাম না, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লাখ লাখ মানুষ অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও রোগে ভোগে।

এসব জানতে আমার কয়েক দশক লেগেছে।

এখন সময় পাল্টেছে। বিশ্বের বৈষম্য সম্পর্কে আজকের তরুণেরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি জানেন। আশা করি, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে কেমন করে এসবের মোকাবিলা করবেন, সমাধান করবেন–তা চিন্তা করার সুযোগ পান।

আমাদের যে সম্পদ আছে তা দিয়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোত্তম কাজটা কীভাবে করতে পারব–এ বিষয়ে কথাবার্তার সময় মেলিন্ডা ও আমি গরিব দেশগুলোতে হাম, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, হেপাটাইটিস বি এবং ইয়েলো ফিবারের মতো কিছু রোগে প্রতিবছর লাখ লাখ শিশুর মৃত্যুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ি। আর রোটা ভাইরাসের কথা তো আমি আগে কখনো শুনিনি। এই রোগে প্রতিবছর পাঁচ লাখ লোক মারা যাচ্ছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা শূন্য। আমরা দুঃখ পেলাম। এই লাখ লাখ শিশুর এমন মৃত্যু রোধ করার জন্য ওষুধ আবিষ্কার ও পৌঁছে দেওয়াকে অগ্রাধিকার হিসেবে নেওয়া দরকার; কিন্তু তা হয়নি। প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান হলে কিছু জীবন বাঁচানো অন্য জীবনের তুলনায় মূল্যবান হিসেবে দেখা অত্যন্ত দুঃখজনক। নিজেদের মধ্যে কথা হয়, 'এটা হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে যদি তা-ই হয়, তবে এ জায়গাটিই আমাদের দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে।'

আমাদের তখন প্রশ্ন, বিশ্ব কেমন করে এসব শিশুদের মরতে দেয়? উত্তরটা সরল ও রূঢ়। বাজার এসব শিশুর জীবন রক্ষার কোনো পুরস্কার দেয় না, আর সরকারও এতে ভর্তুকি দেয় না। তাই এসব শিশু মারা যাচ্ছে। আমরা নানা মানবিক বিপর্যয় দেখেছি, এই সব বিপর্যয়ে মন ভেঙে গেছে কিন্তু তবুও আমরা কিছু করিনি। আমরা এগুলোকে পরোয়া করিনি এমন নয়, আসলে কী করব তা জানি না বলেই এমন হয়। যদি জানতাম কেমন করে সাহায্য করা যায়, তাহলে আমরা সক্রিয় হতাম।

অতি জটিলতা পরিবর্তন ঘটানোর পথে প্রতিবন্ধকতা। কম পরোয়া করা নয়।

অন্যের প্রতি দরদকে সক্রিয়তায় রূপ দিতে দরকার সমস্যাকে দেখতে পারা, সমাধান

দেখতে পারা এবং প্রভাব দেখতে পারা। কিন্তু এই তিন পদক্ষেপকেই রুদ্ধ করে জটিলতা। ইন্টারনেট এবং ২৪ ঘণ্টা সংবাদের অগ্রগতি সত্ত্বেও সত্যিকারে সমস্যাকে দেখতে পারার প্রক্রিয়াটি এখনো জটিল। ঠেকানো সম্ভব, এমন লাখ লাখ মৃত্যু নিয়ে আমরা খুব বেশি পড়ার সযোগ পাই না। গণমাধ্যম ব্যস্ত থাকে নতুনের খোঁজে। লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে এটা তো নতুন নয়। তাই পশ্চাৎপটেই থেকে যায়, যা খুব সহজেই অগ্রাহ্য করা যায়। কোনো দুর্দশার পরিস্থিতি যদি এমন জটিল হয় যে কেমন করে আমরা সহায়তা করব, তা না জানি; তাহলে সেই দুর্দশা দেখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। আর তাই আমরা দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিই।

সত্যি সত্যি কোনো সমস্যা দেখতে পারার কাজটি প্রথম পদক্ষেপ, পরের পদক্ষেপ জটিলতা অতিক্রম করে কোনো একটা সমাধানের খোঁজ করা। অন্যের প্রতি আমাদের দরদকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়ার জন্য সমাধান খুঁজে বের করা অপরিহার্য। কোনো সংগঠন বা ব্যক্তি কেমন করে সহায়তা করতে পারে, এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট ও প্রামাণিক জবাব থাকলে আমরা সক্রিয়তা দেখতে পারি। কিন্তু নানা জটিলতা এমন সব দরদির জন্য সক্রিয়তার পথ চিহ্নিত করার কাজটিকে কঠিন করে তোলে।

জটিলতা অতিক্রম করে সমাধানে পৌঁছার পথটি চার স্তরের–লক্ষ্য স্থির করা, সবচেয়ে কার্যকর উপায় খুঁজে বের করা, সেই উপায়ের জন্য আদর্শ প্রযুক্তি আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে প্রযুক্তি রয়েছে, সেগুলোর জুতসই ব্যবহার করা। এই প্রযুক্তি কোনো ওষুধের মতো জটিল বা মশারির মতো সরলও হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এইডস মহামারির কথা বলা যায়। বড় অর্থে আমাদের লক্ষ্য এই রোগ নির্মূল করা। সবচেয়ে কার্যকর উপায় এ ক্ষেত্রে প্রতিষেধক। আদর্শ প্রযুক্তি হবে কোনো ওষুধ, যার এক মাত্রা প্রয়োগে সারা জীবনের জন্য এ রোগ হবে না। তাই সরকার, ওষুধ কোম্পানি ও সংস্থাগুলো ওষুধ গবেষণায় অর্থ প্রদান করে। কিন্তু তাদের কাজ সম্পন্ন হতে এক দশকেরও বেশি সময় লাগতে পারে, এ সময়ে আমাদের হাতে যা আছে তা দিয়েই কাজ চালাতে হবে–আর এখন আমাদের হাতে সবচেয়ে ভালো প্রতিষেধক উপায় হলো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা।

এ লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো কখনো কাজ ও চিন্তা না থামানো আর জটিলতার কাছে হার না মানা।

শেষ পদক্ষেপটি হলো কর্মকাণ্ডের প্রভাব পরিমাপ এবং সাফল্য-ব্যর্থতা অন্যকে অবহিতকরণ, যাতে এই প্রচেষ্টা থেকে অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে। পরিসংখ্যান অবশ্যই খুব জরুরি। কতজন শিশু কোন কর্মসূচির আওতায় ওষুধ পেল, কোন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কত কমল–এসব তথ্য যেমন কর্মসূচিতে উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রয়োজন, তেমনি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্যও অপরিহার্য।

কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হলে শুধু সংখ্যার উপস্থাপন করলেই চলবে না। কাজের মানবিক প্রভাবটাও প্রকাশ করতে হবে, যেন অনুভব করা যায় আক্রান্ত পরিবারের কাছে একটি জীবন কতটা মূল্যবান।

কয়েক বছর আগে দাভোসে একটি বিশ্ব স্বাস্থ্য প্যানেলের সদস্য হিসেবে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে আলোচনা হচ্ছিল কেমন করে লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করা যায়। লাখ লাখ! মাত্র একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর কথাটা ভাবুন। এবার লাখ লাখ দিয়ে গুণ করুন...। তবু এটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ক্লান্তিকর প্যানেল।

একটি সফটওয়্যারের ত্রয়োদশ সংস্করণ বাজারে ছাড়ার অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানে লোকজন উত্তেজনায় লাফাচ্ছিল, চিৎকার করছিল। সফটওয়্যার নিয়ে উত্তেজনা আমাকে আনন্দিত করে। কিন্তু জীবন বাঁচানো নিয়ে আমরা কেন আরও বেশি উত্তেজনা তৈরি করতে পারি না? তবু আমি আশাবাদী। হ্যাঁ, বৈষম্য সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু জটিলতা নিরসনের নতুন উপাদানগুলো আমাদের ছিল না। আর এ জন্যই অতীত থেকে ভবিষ্যত্ ভিন্নতর হয়। চরম দারিদ্র্যের অবসান ও প্রতিষেধনক্ষম রোগ থেকে মৃত্যু বন্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে বর্তমান সময়ের জৈবপ্রযুক্তি, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বিস্তৃতি।

৩০ বছর আগে আমার সহপাঠীরা পাস করে বেরোনোর সময় এমন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছিল, যা বিশ্বকে ক্রমাগত ছোট, অধিকতর মুক্ত, অধিকতর দৃশ্যমান, কম দূরত্বের করে তুলছিল। স্বল্প-ব্যয়ের পারসোনাল কম্পিউটার শক্তিশালী এক নেটওয়ার্কের উত্থান ঘটায়, যা শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটায়। দূরত্ব কমিয়ে সবাইকে পরস্পরের প্রতিবেশী করে তোলার জাদুকরী ক্ষমতা এই নেটওয়ার্কের।

পাশাপাশি এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা ব্যবহারকারীর পাঁচ গুণ। বহু মানুষ প্রযুক্তি হাতে না থাকার ফলে তাদের প্রতিভা কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে না।

সম্ভবপর সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষকে এই প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা দরকার। কারণ, মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক এই অগ্রগতি এক বিপ্লবের সূত্রপাত করছে।

আপনাদের সবাই কাজের সময় নিজেকে প্রশ্ন করুন, বড় সমস্যাগুলোর সমাধানে সবচেয়ে মেধাবীদের নিয়োজিত করা উচিত নয় কি? সবচেয়ে সুবিধাভোগীদের কি উচিত নয় সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সম্পর্কে জানা? এগুলো শুধু প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন নয়—এসবের উত্তর আপনাদের নীতিগত অবস্থানের মাধ্যমে দিতে হবে।

আমার মা আমাকে সব সময় অন্যদের জন্য কাজ করার ব্যাপারে চাপ দিতেন। আমার বিয়ের কদিন আগে এক অনুষ্ঠানে মেলিন্ডাকে লেখা তাঁর একটি চিঠি তিনি সশব্দে পড়ে শোনান। তখন আমার মা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে খুব অসুস্থ। অন্যদের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দেওয়ার এ সুযোগটি তিনি কাজে লাগালেন। চিঠিটির শেষে তিনি বললেন, ‘যাদের অনেক দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশাও অনেক।’

এখানে সমবেতদের যা দেওয়া হয়েছে—প্রতিভায়, সুযোগে, সুবিধায়; সে বিবেচনায় তাদের বা আমাদের কাছে সীমাহীন প্রত্যাশা করার অধিকার বিশ্বের রয়েছে। ডিগ্রি অর্জনকারী প্রত্যেককে আমি বলব, কোনো একটি বিষয় বেছে নিন, কোনো জটিল সমস্যা, কোনো গভীর অন্যায্যতা এবং সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুন। এটা আপনার পেশাজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলে তা হবে এক বিশাল ঘটনা।

জটিলতা যেন আমাকে থামাতে না পারে। কর্মী হয়ে উঠুন। বড় ধরনের বৈষম্য নিয়ে কাজ করুন। সেটা হয়ে উঠবে আপনার জীবনের মহত্তম অভিজ্ঞতা। এক আকর্ষণীয় সময়ে আপনাদের বেড়ে ওঠা। আপনাদের কাছে এমন প্রযুক্তি, যা আমাদের ছিল না। আপনারা বৈষম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আমরা ছিলাম না। এই সচেতনতার সঙ্গে আপনাদের হয়তো আছে সচেতন বিবেক: আপনার সামান্য প্রচেষ্টায় বহু মানুষের জীবন বদলে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু আপনি সে চেষ্টা বাদ দিলে আপনাকে তা দংশন করবে। অনেক বেশি কিছু আছে আপনাদের। জলদি শুরু করুন, চালিয়ে যান আরও দীর্ঘ সময়।

আর আমার আশা, এখন থেকে ৩০ বছর পর আপনি হার্ভার্ডে ফিরে এসে বলবেন, আপনার প্রতিভা আপনার শক্তি দিয়ে আপনি কী করলেন। আশা করি, শুধু পেশাগত সাফল্য দিয়ে নয়, বরং বিশ্বের গভীরতর অসমতাকে আপনি কেমন করে মোকাবিলা করেছেন তা দিয়েও

নিজেকে মূল্যায়ন করবেন... এক দুনিয়ার ওপারের মানুষেরা–মনুষ্যত্ব ছাড়া আপনার সঙ্গে যাদের অন্য কোনো মিল নেই, তাদের আপনি কেমনভাবে দেখেছেন, তার ভিত্তিতে নিজেকে বিচার করবেন।

আপনাদের মঙ্গল হোক।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে দেয়া

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্য

আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা:
আজকের দিনটি তোমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি- একই সাথে এটি সবচেয়ে আনন্দেরও একটি দিন। আমার অনেক বড় সৌভাগ্য যে তোমাদের এই আনন্দের

দিনটিতে আমি তোমাদের সাথে কিছু সময় কাটাতে পারছি। আমাকে এই সুযোগটি দেয়ার জন্যে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। তোমরা

যেরকম তোমাদের জীবনের প্রথম সমাবর্তনে এসেছ আমিও ঠিক সেরকম আমার জীবনের প্রথম সমাবর্তন বক্তা হিসেবে এসেছি। সমাবর্তন নিয়ে তোমাদের মনের ভেতর যেরকম আগ্রহ এবং উদ্দীপনা তোমাদের সামনে কয়েকটি কথা বলার জন্যে আমার ভেতরেও ঠিক একই আগ্রহ এবং উদ্দীপনা।

তোমাদেরকে আমি কোনো উপদেশ দেব না, তোমাদের কোনো নীতিকথাও শোনাব না, আমি তোমাদের হয়তো কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দেব। তার পাশাপাশি আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে যে কয়টি সত্য উপলব্ধি করেছি তোমাদেরকে সেই কথাগুলো বলার চেষ্টা করব। কয়েক যুগ পর তোমরা হয়তো নিজেরাই এই সত্যগুলো উপলব্ধি করতে, আমি মাঝখানের সেই দীর্ঘ সময়টুকু শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছি মাত্র- তার বেশী কিছু নয়।

তোমরা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে জীবনের পরের ধাপে পা দিতে যাচ্ছ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলে আসার কারণে দেশের সবাই এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়ায় কতো খরচ হয় তার একটা ধারণা পেয়ে গেছে। সেই তুলনাটি থ্েকে তোমাদের ধারণা হতে পারে তোমরা বুঝি খুব অল্প খরচে একটা ডিগ্রী পেয়েছ- সেটি কিন্তু সত্যি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটকে তোমাদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তোমাদের লেখাপড়ার খরচটুকু বের হয়ে আসবে এবং আমি বাজী ধরে বলতে পারি সেই পরিমানটুকু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ থেকে কোনো অংশে কম নয়- বরং বেশী হলে আমি অবাক হব না। তোমাদের পেছনে এই খরচটুকু করেছে সরকার। সরকার এই অর্থটুকু কার কাছ থেকে পেয়েছে? পেয়েছে এই দেশের চাষীদের কাছ থেকে, শ্রমিকদের কাছ থেকে, খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে। আমি তোমাদের শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই এই দেশের অনেক দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ হয়তো তার নিজের সন্তানকে স্কুল কলেজ শেষ করিয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পাঠাতে পারেনি, কিন্তু তার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অর্থ দিয়ে তোমাদের লেখাপড়া করিয়েছে। এখন তোমরাই ঠিক করো তোমার এই শিক্ষাটুকু দিয়ে তুমি কার জন্যে কী করবে!

কিছু দিন আগে খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদন চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে একটি সত্য নূতন করে জানিয়ে দিয়েছে। সত্যটি হল আমাদের দেশ অর্থনৈতিক ভাবে অনেক এগিয়ে এসেছে আর এই এগিয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে দেশের তিন ধরণের মানুষ। গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা- যার বেশীরভাগই হচ্ছে মেয়ে- অর্ধ সহস্রাধিক* সেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের আমরা সাভারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি। প্রবাসী শ্রমিক- যারা নিজের আপনজনকে দেশে ফেলে নির্বান্ধব পরিবেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবং এই দেশের কৃষক যাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য

করার জন্যে আমরা আমাদের ভাষায় চাষা নামক একটা শব্দ তৈরী করে রেখেছি। আমি রীতিমত ধাক্কা খেয়েছি যখন আবিষ্কার করেছি- যারা এই দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমি তাদের কেউ নই তাদের কারো সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই- আমি তাদের জন্যে কখনো কিছু করিনি। আমার মনে হয়েছে আমি বুঝি এই দেশের বোঝা, এই দেশের গার্মেন্টেসের মেয়েরা, প্রবাসী শ্রমিকেরা আর মাঠে ঘাটের চাষীরা আমাকে সুন্দর একটা জীবন উপহার দিয়েছে- প্রতিদানে আমি তাদের কিছু দিই নি।

আমি তখন নিজেকে বুঝিয়েছি, দেশের অর্থনীতিকে এখন গার্মেন্টেসের মেয়েরা, প্রবাসী শ্রমিক এবং চাষীরা সচল রেখেছে, তারা একটি গাড়ীর তিনটি চাকার মতো- গাড়ীটি সত্যিকার ভাবে ছুটতে পারবে যখন তার সাথে চতুর্থ চাকাটি জুড়ে দেয়া হবে। সেই চতুর্থ চাকা কোনটি? তোমরা হচ্ছ সেই চতুর্থ চাকা, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বলীয়ান আমাদের নূতন প্রজন্ম। আমি বুভুক্ষের মতো অপেক্ষা করে আছি তোমাদের মেধা মনন এবং সৃজনশীলতা নিয়ে কখন তোমরা এই দেশের শ্রমজীবী মানুষের পাশে এসে দাড়াবে। কখন মানুষের শরীরের ঘাম অপসারিত হবে মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

তোমরা কী জান, এটি তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়? তোমরা কী জান তোমাদের চোখে রয়েছে রঙিণ চশমা, আমাদের চোখে যেটি একেবারেই সাদামাটা তোমাদের চোখে সেটিই বিচিত্র বর্ণে উজ্জল? তোমরা কী জান এখন তোমাদের জীবনকে উপভোগ করার সময়?

তোমরা কী জান জীবনকে কীভাবে সবচেয়ে বেশী উপভোগ করা যায়? তোমাদের সবারই নিশ্চয়ই এই বিষয়ে নিজের একটা ভাবনা আছে- আমি তোমাদের সাথে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া আমার ভাবনাটুকু বিনিময় করি। নিজের জন্যে যখন কিছু একটা করি তখন অবশ্যই আমাদের একধরণের আনন্দ হয় কিন্তু তার থেকে শতগুণ বেশী আনন্দ হয় যখন আমরা অন্যের জন্যে কিছু করি! তোমাদের ভেতর যারা বন্যা পীড়িত মানুষের কাছে গিয়ে তাদের হাতে একটুখানি ত্রাণ তুলে দিয়েছ তখন তাদের মুখে যে হাসিটুকু দেখেছ আমি জানি সেটি তুমি কখনো ভুলবে না। তুমি যখন রক্ত দিয়েছ সেই রক্তের ব্যাগ থেকে ফোটাফোটা রক্ত গিয়ে যখন একজন মূমূর্ষ বিবর্ণ রোগীর মুখে জীবনের স্পন্দন দিয়ে এসেছে, আমি জানি তুমি সেই আনন্দের কথা কখনো ভুলতে পারবে না। তুমি যখন তোমার ক্যাম্পাসের পথে ঘাটে পাতা কুড়ানো হতদরিদ্র শিশুটিকে বারান্দায় বসিয়ে বর্ণ পরিচয় করিয়েছ তুমি নিশ্চয়ই সেই আনন্দটির কথাও কখনো ভুলতে পারনি। যখন গণিত অলিম্পিয়াডে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের সাহায্য করেছ তখন

তাদের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিটি নিশ্চয়ই তুমি ভুলতে পারনি। যারা এখনো সেই তীব্র আনন্দের স্বাদ উপভোগ করোনি তাদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই- জীবনটিকে একেবারে কানায় কানায় উপভোগ করার এখনই সময়। অন্যের জন্যে কিছু করে জীবন উপভোগ করার এই পথটুকুর সন্ধান পেতে পেতে আমার অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছিল- আমি কিন্তু তোমাদের অনেক আগেই বলে দিয়েছি!

আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, অনেকের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে, সবাইকে নিয়ে আমি অনেক কিছু করেছি। আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি খুব সোজা সাপ্টা একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি; সেটি হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ দুই রকম! এক ধরনের মানুষের সব কিছুতে উৎসাহ, সব সময়েই তারা নূতন কিছু করার জন্যে ব্যস্ত। সব সময়েই তারা কিছু না কিছু করছে, একশটা জিনিস করতে গিয়ে তারা অনেক সময়েই ঘোট পাকিয়ে ফেলছে, সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে- তারপরেও তাদের উৎসাহে কোনো অভাব নেই। অন্য ধরনের মানুষের কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, তারা নিস্পৃহ, তাদের তাপ উত্তাপ নেই। তারা নূতন কিছু করে না, তাই তাদের জীবনে ভূলও হয় না। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে উত্তেজনা নেই, উচ্ছ্বাস নেই।

আমি তোমাদের আরও একটি সত্যের সন্ধান দিয়ে যাই- এই পৃথিবী, দেশ কিংবা সমাজটাকে চলায় প্রথম গোষ্ঠী যাদের সব কিছুতে উৎসাহ! পৃথিবীর যত বড় কাজ সব করেছে এই উৎসাহী প্রজন্ম। তোমাদের ভেতর যারা এই উৎসাহীদের দলে আমি জানি তোমাদের অতি উৎসাহের কারনে অনেক সময় তোমার ক্ষতি হয়েছে, অনেক গুরুজন তোমাকে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে নিষেধ করেছেন, ভূল সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমরা অনেকবার বিপদে পড়েছ। আমি তোমাদের আস্বস্ত করতে চাই দেখবে তোমরাই কিন্তু সব কিছুতে নেতৃত্ব দেবে, তোমার আঙ্গুলি হেলেনে সবাই তোমার পিছনে এসে দাড়াবে। তোমাদের ভিতর যারা উৎসাহকে রাশ টেনে নামিয়ে সতর্ক ভাবে পা ফেলেছে, উৎসাহী বন্ধুদের একশ রকম কাজ দেখে বিরক্ত হচ্ছে, সমালোচনা করেছে তাদেরকে বলে রাখি এই উৎসাহটুকুই কিন্তু সফল আর অসফল মানুষের মাঝখানে বিভাজন। তোমরা ঠিক করো মাপা উৎসাহ নিয়ে বিভাজনের নিচে দাড়াবে নাকি তীব্র উৎসাহের বান ডাকিয়ে বিভাজনের উপরে গিয়ে দাড়াবে।

আজ তোমাদের একটি ছাত্র জীবনের সমাপ্তি হয়েছে। তোমার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তোমাদেরকে অসংখ্যবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সেই পরীক্ষায় তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে

প্রতিযোগিতায় নেমেছ, সেই প্রতিযোগিতায় তোমরা কেউ কেউ তোমাদের সহপাঠীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছ। আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই সত্যিকারের জীবন কিন্তু প্রতিযোগিতার জীবন নয়। যেখানে কিন্তু কাউকে ঠেলে পেছনে ফেলে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে না। সত্যিকারের জীবন হচ্ছে সহযোগিতার। সত্যিকার জীবনে তুমি যখন সত্যিকারের কাজ করবে তখন তোমরা একে অন্যের সাথে পাশাপাশি থেকে সাহায্য করবে। সেখানে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিযোগিতা শুধু একটি জায়গায় থাকে- সেটি হচ্ছে নিজের সাথে প্রতিযোগিতা। তুমি এখন যা, দেখি তুমি এক বছর পর সেখান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পার কী না।

তোমরা এই দেশের নূতন একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে যাচ্ছ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মশালটি এখন তোমাদের হাতে। তোমরা কর্ম জীবনে কী কর তার উপর নির্ভর করবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম। তাই তোমাদের আকাশ ছোয়া স্বপ্ন দেখতে হবে, বড় স্বপ্ন না দেখলে বড় কিছু অর্জন করা যায় না!

এই দেশটি তরুণদের দেশ। বায়ান্ন সালে তরুণেরা এই দেশে মাতৃভাষার জন্যে আন্দোলন করেছে রক্ত দিয়েছে, একাত্তরে সেই তরুণেরাই মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করেছে, অকাতরে রক্ত দিয়েছে। আমাদের দেশটি এখন যখন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাড়াতে যাচ্ছে আবার সেই তরুণেরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে। তোমরা সেই তরুণদের প্রতিনিধি- তোমাদের দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই, আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি।

তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা- ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্যে আমাকে নূতন একটা সুযোগ করে দেয়ার জন্যে!

১০ মে ২০১৩ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল অধ্যাপক শাহজালাল বিজ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট।

*তখনো আমি জানতাম না সংখ্যাটি আসলে সহস্রাধিক হয়ে যাবে। লেখাটি স্যার এর ওয়েবসাইট সাদাসিধে কথা থেকে নেওয়া।

মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে

চে গুয়েভারা
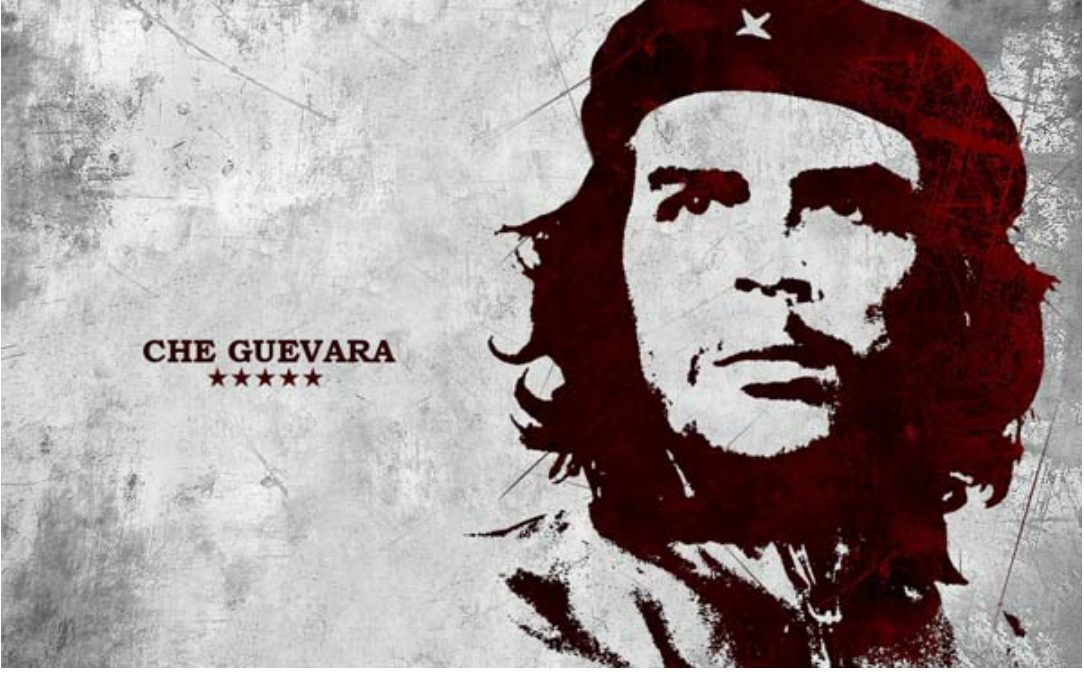
বিপ্লবী এর্নেস্তো চে গুয়েভারার জন্ম ১৪ জুন ১৯২৮ আর্জেন্টিনায়। ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর বলিভিয়ায় তাঁকে আহত অবস্থায় আটক করে হত্যা করা হয়। কিউবা বিপ্লবের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৫৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব লাস ভিয়াসের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে চে এই ভাষণ দেন।

'আজ আমাকে এখানে যে মর্যাদায় ভূষিত করা হলো, তা শুধু আমি বিনম্রভাবে এ দেশের জনগণের পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে পারি, ব্যক্তি হিসেবে নয়। ব্যক্তি এর্নেস্তো গুয়েভারা কীভাবে স্কুল অব এডুকেশনের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি লাভ করতে পারে যেখানে তাঁর শিক্ষার পুরোটাই এসেছে গেরিলা ক্যাম্প, তিক্ত বাদানুবাদ আর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে? আমি বিশ্বাস করি, আমার শিক্ষাকে ক্যাপ আর গাউনে রূপান্তর করা যায় না। তাই আমি আজকেও তোমাদের সামনে আমাদের সেনাবাহিনীর সম্মানে সামরিক পোশাকে এসেছি। এই উপাধি গ্রহণের শুভক্ষণে আমি আমাদের সেনাবাহিনীকেও পূর্ণ গৌরবে উপস্থাপন করতে চাই। আমি একবার এই ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে আমার ভাবনাকে তাদের সামনে তুলে ধরব। হাজারো ঘটনা

আর কাজের চাপে এত দিন আমি সে কথা রাখতে পারিনি। আজ, আমি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব।

এই নতুন কিউবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা কী হওয়া উচিত? আমি বলব, বিশ্ববিদ্যালয়কে ভেঙেচুরে ভিন্ন ধাঁচে গড়ে তোলার সময় এসেছে। কালোদের, মিশ্র বর্ণের, শ্রমিকদের, চাষিদের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার খুলে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে গণমানুষের। মনে রাখতে হবে, এই বিশ্ববিদ্যালয় কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, এটি কিউবার জনগণের সম্পত্তি। বিজয় হলে কেবল জনগণেরই হবে। জনগণ এখন জানে যে তারা অপ্রতিরোধ্য। আজ তারা আশায় বুক বেঁধে এদিকে তাকিয়ে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়কেই আভিজাত্যের মুখোশ খুলে তাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। হয় আপামর জনসাধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার খুলে দাও, নয়তো শুধু দুয়ার খোলো; জনগণই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের মতো করে গড়ে নেবে।

আমাকে যদি জনগণ ও বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে এবং অবশ্যই তোমাদের অধ্যাপক হয়ে কিছু উপদেশ দিতে হয়, তবে আমি বলব, মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তোমাদের জানতে হবে জনগণ কী চায়, তাদের কী প্রয়োজন, তারা কেমন আছে, কী ভাবছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখো, কতজন শ্রমিক, কৃষক, দিনে আট ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলা মানুষেরা এখানে পা ফেলতে পেরেছে। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করো, কিউবার শাসনব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে কি না। এবার একটু চিন্তা করো, যে সরকার জনগণের ইচ্ছাকে তার কাজে পরিণত করছে, সেই সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কী করছে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে গোটা কিউবার জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তেমন কোনো সংযোগ নেই। দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা মুক্তভাবে এখানে পৌঁছাতে পারে না।

আমি মাটির সন্তান, দেশের মানুষেরাই আমাকে গড়ে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই মানুষদের শিক্ষার সুফল ভোগ করার অধিকার আছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে তোলা প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে। শিক্ষা কোনো বিলাসদ্রব্য নয় যে শুধু যাদের বাবার পকেটে টাকা আছে, তারাই শিক্ষিত হবে। কিউবার ঘরে ঘরে প্রতিদিন রুটির সঙ্গে শিক্ষাকেও পৌঁছে দিতে হবে। আমি এখনো গর্ব করে বলতে পারছি না যে এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে দিয়েছে। আমাদের এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। একজন বিপ্লবী হিসেবে আমি তোমাদের সবাইকে বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে শিক্ষার ওপর আর কারও একচ্ছত্র অধিকার নেই, এই

ক্যাম্পাসও কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়। কিউবার প্রতিটি নাগরিকের এখানে সমান অধিকার আছে। হয় তাদের অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, অথবা তারা নিজেরাই তা আদায় করে নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসিন্দা, সেদিনের সেই যুবক ডাক্তার এর্নেস্তো একসময় তোমাদের মতোই স্বপ্ন দেখত। সংগ্রাম আমাকে বদলে দিয়েছে, আমি বিপ্লবের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি, জনগণের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি আশা করি, তোমরা যারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চালিকাশক্তি, তারা একে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেবে। এটি কিন্তু তোমাদের জন্য কোনো হুমকি বা দুঃশ্চিন্তার কারণ নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে ইউনিভার্সিটি অব লাস ভিয়াসের শিক্ষার্থীরা যদি জনগণের ও জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী বিপ্লবী সরক‌ারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তবে সেটি হবে কিউবার সাফল্যের টুপিতে আরেকটি পালক যোগ করবে।

আমার বর্তমান সহকর্মী, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, পুরোনোকে ঝেড়ে ফেলুন। সমাজের কালো, মিশ্রবর্ণ, শ্রমিক ও কৃষকের কাতারে নিজেদের শামিল করুন। দেশের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাদের সঙ্গেই আপনাদের বাঁচতে হবে, একই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে হবে। এক ও অভিন্ন কিউবাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন। আমরা সবাই মিলে যখন এই কাজগুলো করব, তাতে কারও অসম্মান হবে না। কেউ ছোট হব না, হেরে যাব না। দেশ হিসেবে কিউবা দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সেদিন এই প্রফেসর অব এডুকেশন, ডাক্তার, ব‌্যাংক, প্রেসিডেন্ট, কমান্ডার–যে কিনা আপনাদের এখন বিদায় জানাচ্ছে, তাকে ভুলে গেলেও আমার দুঃখ থাকবে না।

সূত্র: দ্য মিলিটেন্ট, ১০ জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যা।

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

শিখতে হবে সবখানে - সালমান খান
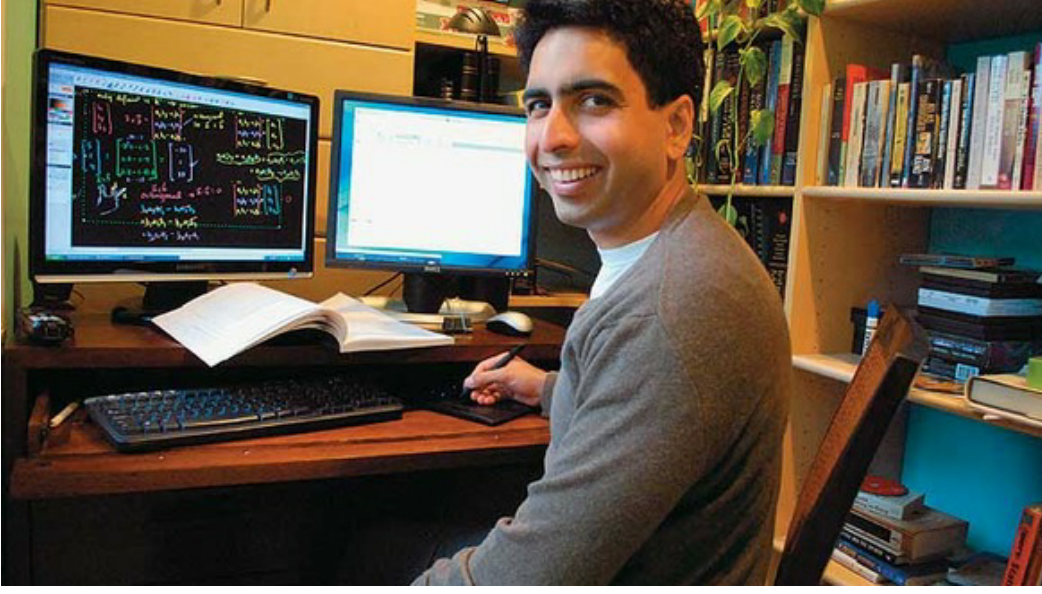
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সালমান খানের জন্ম ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে। সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিন নির্বাচিত বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির মধ্যে স্থান পেয়েছেন সালমান। ১০ মে ২০১২ রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তৃতা দেন। - **ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার**

আজ এখানে বক্তৃতা দিতে পারা আমার জন্য সত্যিই এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, এখানে দাঁড়ানোয় ৩৫ বছরের নিজেকে তোমাদের তুলনায় অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে! কিন্তু আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার ছোট ভাইবোনদের কিছু বলতে এসেছি। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে চাই। এমন কিছু ব্যাপার, যা নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি, দেখতাম এবং এখনো দেখছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা একটি বড় ডিগ্রি অর্জন করতে যাচ্ছো। নিঃসন্দেহে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মান। এই সম্মান তোমাদ‌ের জীবনকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে। তোমাদের এই অর্জন কাজে লাগিয়ে কীভাবে পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নয়ন আরও বৃদ্ধি করা যায়, পৃথিবীটাকে আরেকটু সুন্দর করা যায়, সেটা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে।

২০০৯ সালে আমি যখন খান একাডেমি শুরু করি তখন আমি একটা সাজানো-গোছানো, সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝপথে। আমার ভিডিওগুলো দেখে তখন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে

লোকজন ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখত। কিন্তু একদিকে চাকরি আরেকদিকে খান একাডেমি, দুটোকে একসঙ্গে সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমি তখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের হাতে কী পরিমাণ টাকা-পয়সা আছে তার হিসাব করতে বসলাম। আমি তাকে বোঝালাম কীভাবে খান একাডেমি দিয়ে শিক্ষার প্রচলিত ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে মানুষের শেখার ধরনকেই আমূল বদলে ফেলা যাবে, কীভাবে পৃথিবীজুড়ে মানুষ ঘরে বসে বিনা খরচে শিখতে পারবে, সভ্যতাকে কত সহজে কতখানি এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আর একবার এই সম্ভাবনা মানুষ বুঝতে পারলে এই মহৎ কাজে বিনিয়োগের অভাব হবে না। এমন এটাসেটা অনেক কিছু বুঝিয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম! আর পুরোপুরি খান একাডেমির কাজে লেগে গেলাম। আস্তে আস্তে নয় মাস কেটে গেল, অনেক কিছু করতে চেষ্টা করলাম, অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম, মিটিং করলাম। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হলো না।

সত্যি কথা বলতে কি, আজ যখন লোকে শোনে আমি হার্ভার্ড, এমআইটিতে পড়াশোনা করেছি, তারা মনে করে কত সহজেই না আমি ভিডিও বানানো শুরু করেছি আর রাতারাতি খান একাডেমি গড়ে তুলেছি। কিন্তু কেবল আমিই জানি সেই সময়গুলো কতটা কঠিন ছিল। দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গিয়েছিল প্রায়। আমার তখন ৩২ বছর বয়স, একটি ছেলেও হয়েছে, বাড়ি কেনার জন্য ৩০-৪০ হাজার ডলার ডাউনপেমেন্ট দিতে হবে—এমন অনেক সমস্যা তখন আমাকে ঘিরে রেখেছে। সে সময় কেউ আমাকে দেখলে বলত আমি নির্ঘাত বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি। আমি আমার পরিবার নিয়ে অনেক স ুন্দর একটা জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আর আমিই সবকিছু নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলেছি। সেই সময় একটা জিনিসই আমাকে একটু আশার আলো দেখাত, আর তা হলো অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা ভরা চিঠি। কিন্তু তার পরও, একটা পর্যায়ে আর চালাতে না পেরে আমি হতাশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলাম। যখন প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিলাম সবকিছু ছেড়ে দেব, ঠিক তখনই আমার কাছে খান একাডেমির নামে ১০ হাজার ডলারের অর্থ পুরস্কার আসে। এর আগে বেশির ভাগ লোক পাঁচ কিংবা ১০ ডলার করে পাঠাত। সেটাই ছিল তখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় অঙ্কের টাকা। সেটি পাঠিয়েছিল এই রাইস বিশ্ববিদ্যালয়েরই ১৯৭৫ সালের ব্যাচের একজন, তার নাম অ্যান ডোয়ার। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ই-মেইল করি। সে কাছেই থাকত, একদিন দুপুরে আমরা এক রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে কথা বলছিলাম। অ্যান আমার কাছে জানতে চাইল আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। আমি বললাম, এখনকার মতো আমি সারাজীবন ধরে ভিডিও বানিয়ে যেতে চাই! আমি বলেই যাচ্ছিলাম এটা নিয়ে আমার কত স্বপ্ন, কত কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। কীভাবে খান একাডেমি সারা পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থা

বদলে দিতে পারে! সে বলল, 'বুঝলাম তোমার অনেক বড় পরিকল্পনা! কিন্তু তুমি নিজে চলছ কীভাবে?' আমি তখন বোধহয় একটু বেশি জোরেই বলে ফেলেছিলাম, 'আমার তো চলছে না!'

যাই হোক, আমার কথা শুনে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, আমরা বিদায় নিলাম। আমি যখন বাড়ির প্রায় কাছে পৌঁছে গেছি, তখন অ্যানের কাছ থেকে আমি একটি মেসেজ পাই। সেখানে লেখা, 'তোমার নিজেরও তো চলতে হবে, তাই আমি টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে এক লাখ ডলার করে দিচ্ছি।' আমি আরেকটু হলেই গাড়ি নিয়ে সোজা গ্যারেজে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলাম!

সেই মুহূর্তে টাকার অঙ্কের চেয়েও বেশি সাহায্য করেছিল খান একাডেমির সম্ভাবনার ওপর অ্যানের গভীর আস্থা। আজকে এসব শুনে অনেকেই বলবে, অ্যানের অঢেল টাকা ছিল, তাই সে সাহায্য করতে পেরেছে। আমার অত টাকা-পয়সা নেই যে, কাউকে এক লাখ ডলার দান করে দিতে পারি। এখানেই আমার দ্বিমত। আমি অন্তত এমন ৫০ জনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যাদের আর্থিক অবস্থা অ্যানের চেয়েও অনেক ভালো ছিল। কিন্তু তারা তো এগিয়ে আসেনি!

একটা কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলব, যদি কখনো এমন অবস্থানে থাকো, যেখানে তোমার একটু সাহায্যে অন্যের অনেক বড় কোনো উপকার হতে পারে, তবে কখনো তাকে উপেক্ষা করো না। আমি সব সময় যা করতে চেষ্টা করি এবং অন্যদেরও করতে বলি, তা হলো কখনো যদি দেখ কেউ অসাধারণ কোনো কিছু করছে কিংবা করার চেষ্টা করছে, চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। তাকে প্রশংসা করো, ধন্যবাদ জানাও, তার কাজের স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করো। তার বসকে জানাও কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। তার পরিবারকে জানাও কত বড় কাজ করছে সে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমার ছোট্ট একটি পদক্ষেপ, একটি প্রশংসা বাক্য কীভাবে একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। তোমার উৎসাহে কেউ হয়তো তার জীবনের লক্ষ্যই বদলে ফেলতে পারে। একজন ইতিবাচক চিন্তাধারার মানুষ তার চারপাশের অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, তাই সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করো। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি তুমি তোমার স্বপ্ন সফল করতে চাও, সব সময়, সবকিছু থেকেই শিখতে চেষ্টা করো। নতুন কিছু শেখার জন্য নিজেকে সব সময় প্রস্তুত করে রাখা কতটা দরকার তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। তোমাদের সামনে যে সময় অপেক্ষা করছে, তা তোমরা শেখার জন্য বিনিয়োগ করো। আমি খান

একাডেমির সঙ্গে আছি বলে মানুষ কীভাবে শিখতে শিখতে জীবন বদলে ফেলে, এ ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। ২০০৮ সালে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত একজন রোগীর কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। তখন তার জীবনের মেয়াদ আর মাত্র দুই মাস। কতখানি ইতিবাচক মনোভাব থাকলে মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষ লিখতে পারে, 'আমার অনেক দিনের শখ ছিল ক্যালকুলাস শিখব, এখন খান একাডেমি আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। আশা করি জীবনের শেষ দুই মাসের মধ্যেই আমি ক্যালকুলাস শিখে ফেলতে পারব!' কী অসাধারণ মানসিক শক্তি, কতখানি তীব্র শেখার ইচ্ছা। সেই চিঠি দেখার পর আমি ঠিক করেছি, যতদিন বেঁচে থাকি, কখনো শেখা থামাব না।

১৯৯৮ সালে আমি যখন তোমাদের মতো গ্র্যাজুয়েশন করি, তখন আমার কিছু কাজ নিয়ে একটা কম্পিউটার ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ ছাপা হয়। আমার সেটা নিয়ে খুবই গর্ববোধ হয়েছিল। কিন্তু আমার তেমন কোনো লক্ষ্য ছিল না। নিজেকে নিয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণাই ছিল না যে, আসলে আমি কী করতে চাই। একটা চাকরি শুরু করার দুই মাসের মধ্যেই আমি আরও বেশি বেতনে আরেকটা চাকরি পাই, আর সেখানে চলে যাই। সেখানে প্রথম তিন দিনেই বস আমাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেন, আমি তাঁর চোখে কতটা অযোগ্য। ব্যাপারটা ভেবে দেখো! মাত্র ২৩ বছর বয়সে সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রি, ম্যাগাজিনে ছাপানো প্রশংসা, সবকিছু নিয়ে রাতের বেলা আবিষ্কার করলাম আমি হোটেল রুমে বসে বসে কাঁদছি। আমি জীবনে আসলেই কী করতে চাই তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সেই রাতে মনে হচ্ছিল চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলছে, সবকিছু অর্থহীন লাগছে। কিন্তু তার পরও পরদিন ভোরে উঠলাম, কাজ করলাম, গত রাতের চেয়ে একটু ভালো লাগল। এক সপ্তাহ পর আরেকটু মানিয়ে নিতে পারলাম, দুই মাসের মধ্যে আবার নতুন এক জায়গায় কাজ করা শুরু করলাম!

যখন সাফল্য আসবে, তাকে উপভোগ করো, কিন্তু এটাও খেয়াল রেখো, তুমি ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছ কি না। যতই বড় হও না কেন, মনে রেখো সবকিছুরই একটা শেষ আছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটিও জ্বলতে জ্বলতে একদিন নিভে যাবেই। তাই ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত থেকে সাফল্যকে উদ্যাপন করো। ছোট ছোট খুশির বিষয়কে অবহেলা করো না, আবার দু-একবার হোঁচট খেলেও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পোড়ো না। এখন থেকে ১০-১৫ বছর পর হয়তো এগুলো মনে করেই তুমি হাসবে, ভাববে কী ছেলেমানুষই না ছিলাম!

জীবনকে, এখনকার সময়কে একটা অনন্য সুযোগ হিসেবে দেখো। সাফল্যের পেছনে যতই

ছুটে চলো না কেন, এই মানবিক ব্যাপারগুলো ভুলে যেও না। প্রাণ খুলে হাসো। প্রিয়জনদের সময় দাও, তাদের বলো কতটা ভালোবাসো। চারপাশের মানুষের জন্য কিছু করো। মনে করো, এটা তোমার কল্পনা থেকে ফিরিয়ে আনা দ্বিতীয় জীবন। এ জীবন আফসোসের জন্য নয়।

খান একাডেমি এবং সালমান খান সম্পর্কে জানতে এ লেখাটি পড়তে পারেনঃ সমগ্র বাঙ্গালীর গর্ব “Khan Academy”

হাসতে শেখো, বাঁচতে শেখো - এ আর রহমান

সংগীত পরিচালক ও গায়ক এ আর রহমানের জন্ম ভারতের চেন্নাইয়ে, ১৯৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি। দুবার অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০১২ সালের মে মাসে মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এ বক্তব্য দেন এই তারকা সংগীতজ্ঞ। **সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার**

আজ থেকে ২৪ বছর আগে কখনো ভাবতে পারিনি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করার আমন্ত্রণ পাব। মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এখানকার শিক্ষার্থীদের সামনে আমার কাজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া তো দূরের কথা, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়াটাই ছিল অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু আজ আমি মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছি। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ১০ বছরের। এখানকার অনেক শিক্ষার্থী, যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও আমার সুরকে তাদের জীবনের অংশ করে নিয়েছে। আমি তাদের দেখে সত্যিই অভিভূত। এখানকার অভিজ্ঞতাই আমাকে ভারতে একটি 'ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল অবজারভেটরি' তৈরি করার সাহস দিয়েছে। আজ এখানে এসে আমার টুকরো টুকরো অনেক কথা মনে পড়ছে।

প্রথমত, ভ্রমণ থেকে শিক্ষা লাভ করা। মনকে সব সময় বলি, পথ চলতে চলতে যা-ই পাওয়া যায়, তাকে উদার চোখে দেখতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। কোথাও যাওয়ার আগেই তার সবকিছু নিয়ে আমরা কম-বেশি একটা ধারণা তৈরি করে নিই। কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চিন্তাচেতনা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কোনো একটা স্থানের অনেক অন্তর্নিহিত রহস্য থাকে, যা আমরা সশরীরে, স্বচক্ষে, খোলা মনে পর্যবেক্ষণ না করলে কখনো ধরা দেয় না। এই সত্যগুলোকে জানতে হলে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

দ্বিতীয়ত, কখনো তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া। এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমরা কোনো মানুষের বেলায় চিন্তা করি। সব গল্পের পেছনেই একটি ভিন্ন গল্প থাকে, যেমন একটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন হতেই পারে। মানুষের বেলায়ও ঠিক তা-ই। আমাদের সব সময় মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে খুঁজে দেখতে হবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। এমনকি কোনো স্থান, প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্পকলার ব্যাপারেও এই নীতি প্রযোজ্য। আমরা যদি বাইরের দৃশ্যমান রূপটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরে না নিয়ে একটু গভীরভাবে মনের চোখ দিয়ে দেখতে শিখি, একটু ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা হলে আমার বিশ্বাস আমাদের অর্ধেক সমস্যারই কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

তৃতীয়ত, যখন জীবনে কোনো সংকটময় মুহূর্ত আসবে, তখন মনকে শান্ত করে ফেলতে হবে, গতি কমিয়ে আনতে হবে। সংকট সমাধানে যে পদক্ষেপই নাও না কেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে। শুধু একটা কথা মনে রাখবে, কখনো রাতারাতি কোনো পরিবর্তন আশা কোরো না। তোমার পুরস্কার ঠিক সময়েই তোমার হাতে পৌঁছাবে। যদি উপযুক্ত সময়ের আগেই তুমি তোমার সব কাজের মূল্যায়ন পেয়ে যাও, তা হলে সেই মূল্যায়ন আর পুরস্কার একটা সময় তোমার পতনের শুরু করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

চতুর্থত, যারা তোমার চেয়ে কম ভাগ্যবান, জীবন যাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসেনি, সেই দরিদ্রদের জন্য, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সব সময় কিছু করার চেষ্টা করো। তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেয়ো না কিংবা তাদের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করো না। চিন্তা করো, কীভাবে তাদের জীবন আরেকটু সুন্দর করা যায়, কীভাবে তাদের টেনে তোলা যায়। অন্যকে সাহায্য করার জন্য তোমার ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাগুলো আসলে অনেক মহৎ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, সত্য ও সততা–এই গুণগুলোকে অর্জন করা যতটা অসাধ্য বলে মনে করা হয়, তেমনটা মোটেও নয়। তুমি যদি সত্যিই চাও, তা হলে এটা পানির মতোই সহজ ও সরল একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা জীবনের নানা চাহিদা প্রায়ই সততার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ দুটোর মধ্যে একটা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়তো তোমার জীবনের অনেকটা সময়ই পার হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এই ভারসাম্য এতটাই দরকারি আর মূল্যবান যে এর জন্য আজীবন চেষ্টা করার মধ্যেও কোনো গ্লানি নেই। এই ব্যাপারটিকে ভারতে আমরা বলি, 'সত্যমেভ জয়তে' অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই।

আমি কিছু মানুষকে আজ আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে যাঁদের অবদান অপরিসীম। আমার বাবা, মা ও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক, যিনি আমাকে জীবনের প্রথম বড় সুযোগটি দিয়েছিলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা, সমগ্র ভারতবাসী যারা আমাকে ও আমার সুরকে কোনো দ্বিধা বা বৈষম্য ছাড়াই পরম মমতায় বরণ করে নিয়েছেন। আজ আমি একই গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছি হলিউডে এসে, আমি সত্যিই সম্মানিত।
সংগীত কোনো ব্যক্তি, সমাজ কিংবা জাতির নয়। সুর সবার জন্য। আমি যখন 'বাখ' শুনতাম, আমি কখনো ভাবিনি, তার জাতি কী, ধর্মই বা কী। সংগীতের বিশুদ্ধতাই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ২৪ বছর ধরে আমি সেই বিশুদ্ধ সুরের জগতে ডুবে আছি। সেই দর্শনগুলোকে বোঝার চেষ্টা করছি, যা সুরের ভাষার জন্ম দিয়েছে। আজকের এই সমাবর্তন তোমাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি নয়, বরং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এ দিনটি একটি নতুন গল্পের শুরু, যা হয়তো তোমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমি জানি, তোমরা অত্যন্ত মেধাবী। তবে এই যাত্রায় মেধার চেয়েও একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের অনেক বেশি সহায়তা করবে। আর তা হলো, ঠোঁটের কোণে একটি মধুর হাসি। হাসতে শেখো, বাঁচতে শেখো।

সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

সব সময় তাগাদা দিতে হবে নিজেকে - বারাক ওবামা

অভিনন্দন, ২০১১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা!

তোমরা জানো, প্রেসিডেন্ট হওয়াটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার। শুধু আমার ব্যবহারের জন্য একটা আস্ত বিমান আছে, আমার নিজের জন্য একটা থিম সং আছে! কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা ভালো লাগে, সেটা হলো তোমাদের মতো তরুণদের সঙ্গে এমনভাবে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়া। অতএব বুঝতেই পারছ, আমি এখানে এসে নিজেকে কতটা সৌভাগ্যবান মনে করছি আজ।

আমরা আজ এখানে দর্শকসারিতে অনেক বড় মাপের অতিথিদের পেয়েছি। টেনেসির গভর্নর বিল হাসলাম রয়েছেন আমাদের মধ্যে। আসুন, সবাই তাঁকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানাই। আমাদের মধ্যে আরও রয়েছেন সিনেটর বব কর্কার, সিনেটর ল্যামার আলেক্সান্ডার এবং সিনেটর স্টিভ কোহেন। এমনকি মেমফিসের নিজের মানুষ সিনেটর হ্যারল্ড ফোর্ড জুনিয়রও রয়েছেন আমাদের মধ্যে। আরও রয়েছেন মেমফিসের মেয়র এ সি হুয়ারটন। তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে।

আজ তোমাদের প্রত্যেককে নিয়ে আমি গর্বিত। কারণ, তোমরা শেষ পর্যন্ত অনেক শ্রম দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছ। এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে তোমাদের শিক্ষকদের। তাঁরা সব সময় তোমাদের পড়াশোনা করানোকে তাঁদের চাকরির অংশ হিসেবে নয়, বরং নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে চিন্তা করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমাদের পরিবারকে। তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী—সবার অবদান রয়েছে এতে। কারণ, তাঁরা তোমার ওপর আস্থা রেখেছেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান মানেই হলো আনন্দের উপলক্ষ। কিন্তু আজকের এই সমাবর্তন যেন আরও বেশি আনন্দের। কারণ, আমি জানি, বুকার টি নিয়ে অনেকেই এতটা আশাবাদী ছিলেন না। অনেকেই মনে করত, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের কড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে কখনোই নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবে না। কারণ, এই এলাকাটা অনুন্নত, এখানকার রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ভাঙাচোরা। এককথায় এখানকার শিক্ষার্থীরা উন্নত সুযোগ-সুবিধা তেমন পায় না বললেই চলে। কিন্তু তোমরা প্রমাণ করেছ, তোমাদের প্রত্যেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলেছ, 'ইয়েস, উই ক্যান'। হ্যাঁ, আমরাও পারি। আমরা শিখতে পারি, আমরাও পারি সফল হতে। কোথা থেকে এসেছ, সেটা নয়; বরং কোথায় যেতে চাও, সেটাই যে তোমাদের আসল পরিচয়, তা প্রমাণ করেছ তোমরাই।

এই তো বছর খানেক আগের কথা। এমন একটা সময় ছিল, যখন এই প্রতিষ্ঠানের মাত্র অর্ধেক শিক্ষার্থীই পড়াশোনা শেষ করতে পারত। অনেক কাল ধরেই এই প্রতিষ্ঠানের মাত্র হাতে গোনা গুটিকয় শিক্ষার্থীই পারত পরবর্তী ধাপে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। কিন্তু আজ তোমরা যে সবকিছু বদলে দিয়েছ!

এই প্রতিষ্ঠানে যারা নতুন পড়তে আসবে, তাদের সামনে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছ তোমরা। তোমরা এমন একটা ধারা তৈরি করতে পেরেছ, যা কি না পরিশ্রমীদের সাফল্য নিশ্চিত করে। এখানকার প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকেরা আস্থা রেখেছেন। এবং তারই ফলে আজ তোমাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীই তাদের পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পেরেছে সুন্দরভাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদের অনেকেই এখন তাদের নিজের পরিবারের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। আমি আজ এখানে এসেছি, কারণ আমি মনে করি, এমন সাফল্য যদি বুকার টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা পেতে পারে, তবে সেই সাফল্য মেমফিস এলাকাও অর্জন করতে পারে; এই সাফল্য যদি মেমফিস এলাকায় সম্ভব হয়, তাহলে তা সম্ভব হবে পুরো টেনেসি রাজ্যেও; আর টেনেসি রাজ্য যদি তা পারে, তাহলে পুরো যুক্তরাষ্ট্রও পারবে সফল হতে।

তবে এর জন্য আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি মানুষই তার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে। আমরা 'রেস টু টপ' প্রকল্প চালু করেছি এ জন্যই, যেন আমরা বুকার টির মতো সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পাওয়া সাফল্যের জন্য উপযুক্ত সম্মান দিতে পারি। আজ আমি তোমাদের সামনে এমনি এমনিই এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, তা কিন্তু নয়। আজ আমি এখানে তোমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, তার কারণ হলো আমার শিক্ষা। আমার যখন বয়স মাত্র দুই বছর, তখন আমার বাবা আমাদের রেখে চলে যান। আমার অসহায় মা আমাকে আর আমার বোনকে নিয়ে অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন সেই সময়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মা, আমার নানা-নানি কখনো ছাড় দেননি আমাকে। সেটা হলো পড়াশোনা। তাঁরা সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকতেন। আমার কোনো অজুহাত দেওয়ার উপায় ছিল না। আমার শিক্ষকেরাও আমার পেছনে অবিরত লেগে থাকতেন পড়াশোনার জন্য। আমার সৌভাগ্য, তাঁরা কখনো আমাকে পড়াশোনার জন্য তাগাদা দেওয়া থামাননি। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল আমার স্ত্রী মিশেলের বেলায়ও। তার মা-বাবাও সব সময় তার পেছনে লেগে থাকতেন পড়াশোনার জন্য।

একটা কথা বলে রাখি, দেশের সাফল্যের জন্য তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ভালো করলেই হবে না, তোমাদের সবাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সম্ভব হবে দেশের উন্নতি। শিক্ষার মাধ্যমে তোমরা সব ধরনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় আমরা সব সময় আমাদের শিক্ষকদের প্রশ্ন করতাম, এসব 'আলজেব্রা' শিখে আমাদের কী লাভ? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সত্য যে কর্মজীবনে গিয়ে তোমাদের এক্স অথবা ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে না। কিন্তু এসব অঙ্ক করার মাধ্যমে আসলে তোমাদের মস্তিষ্কের সব জট খুলে যাচ্ছে। এসব গণিতের সমস্যা সমাধান করে তোমরা সব ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন তথ্য, সমস্যা ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে সমাধান করা শিখছ। অঙ্কের শিক্ষকদের বলি, আপনারা আপনাদের শিক্ষার্থীদের বলবেন, প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সবাইকে ভালোভাবে গণিত শিখতে হবে।

তোমাদের সবার নিজের নিজের গল্প আছে। অনেকেই অনেক কষ্ট করে এসেছ। দক্ষিণ মেমফিস অঞ্চল সব সময় ছিল অনুন্নত। এখানকার অধিবাসীরা হাত বাড়ালেই সবকিছু পেয়েছে, এমনটা কখনোই হয়নি। তোমরা যা চেয়েছ, তা চাওয়ামাত্র পেয়েছ, এটাও হয়নি কোনো দিন। কিন্তু এতে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং এটা গর্বের ব্যাপার। কারণ, তোমরা যা কিছু পেয়েছ, যত লক্ষ্য অতিক্রম করেছ, যত সাফল্য অর্জন করেছ, যত স্বপ্ন

বাস্তবায়ন করেছ, তার সবই তোমাদের নিজের, একেবারে নিজেদের কৃতিত্ব, নিজেদের পরিশ্রমের ফসল। এসব কারও অনুগ্রহের ফসল নয়।

কিন্তু শিক্ষার্থীরা, একটা কথা মনে রাখবে, আজ তোমাদের যাত্রা শেষ হলো তা নয়, আরও অনেক পথ বাকি রয়েছে। যাত্রা কেবল শুরু হলো। পথের প্রতিটি বাঁকেই নিজেকে ভালো, আরও ভালো করার জন্য তাগাদা দেওয়াটা কখনোই থামাবে না। সামনের দিনগুলোতে তোমরা কতটা সফল হবে, তার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি না; কিন্তু একটা কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, চলার পথে অনেক ভুল করবে তোমরা। অনেক কঠিন সময় আসবে। হয়তো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তোমরা যদি সব সময় নিজেকে তাগাদা দিতে থাকো, তাহলে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে নিজেই। আজ তোমরা যদি এই সংকল্প করো যে সব সময় ভালো কিছু করার জন্য নিজেকে তাগাদা দিতেই থাকবে, তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারি, যে শিক্ষা, ভালোবাসা, সাফল্য তোমরা বুকার টি স্কুল থেকে পেয়েছ, তা দিয়েই সারা বিশ্বে নিজেদের চিহ্ন এঁকে দিতে পারবে তোমরা।

ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ তোমাদের নিজের আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত। অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

নতুন চিন্তাকে গুরুত্ব দাও - স্টিভ বলমার

মাইক্রোসফটের সিইও স্টিভ বলমার ১৯৫৬ সালের ২৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা অবস্থায় ১৯৮১ সালে মাইক্রোসফটে যোগ দেন। ২০১১ সালের ১৩ মে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বক্তব্য দেন স্টিভ বলমার। **সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: ফয়সাল হাসান**

২০১১ সালের স্নাতকদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার নিজের কথাগুলো শুরু করব। সবাই অনেক ভাবের কথা বলবে যে এটা পথচলার শুরু, নতুন জীবনের শুরু—এই সব। কিন্তু আমার কাছে এটা হলো আনন্দ উদ্যাপনের উপলক্ষ। কারণ এটা তোমাদের প্রাপ্য ছিল এবং তোমাদের পরিবারের সদস্যরাও এই কৃতিত্বের অংশীদার। দুই বছর আগেও আমি তোমাদের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কে কিছু জানতাম না। আমি এখানে কোনো দিন আসিওনি। দুই বছর আগে এখানে এসেছিলাম আমার সন্তানের গ্র্যাজুয়েশনের দিন। একটা গল্প বলি তোমাদের। কিছুদিন আগের কথা, আমি এখানে আসছিলাম, তখন আমার এক বন্ধুর ছেলে আমাকে দেখিয়ে বলল, ইউএসসি (ইউনিভার্সিট অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া) ভুয়া, আর ওর নিজের ইউসিএলএ (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস) হলো সেরা। আমি তখন নিমেষের মধ্যে পকেট থেকে আমার উইন্ডোজ মুঠোফোন বের করে ওকে দেখিয়ে দিলাম যে র‍্যাংকিংয়ে ইউএসসির অবস্থান হলো ২৩ আর

ইউসিএলএর অবস্থান ২৫। হাহ্ হাহ্ হাহ্!

আমরা এখন বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার আবিষ্কারের ৬০ বছর পার করে এসেছি। আজ প্রযুক্তি ছাড়া যে বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি তা ভাবতেই অবাক লাগে। শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, যোগাযোগ–সবকিছুতেই আজ প্রযুক্তি ঢুকে গেছে। আমি আমার সামনে উপবিষ্ট অভিভাবকদের প্রশ্ন করব, আপনারা কি ছাত্রজীবনে কখনো ওয়ার্ড প্রসেসর, কম্পিউটার এসবের সাহায্যে কোনো টার্ম পেপার বা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছেন?

আমি যখন মাইক্রোসফটে যোগ দিই তখন আমার পড়াশোনা শেষ হয়নি। আমি তখন এমবিএ পড়ছিলাম। তখন আমার এক বন্ধু, ওর নাম বিল গেটস, আমাকে বলল, 'আ রে পড়াশোনা বাদ দিয়ে আমার সাথে যোগ দাও না কেন?' পড়াশোনা বাদ দেওয়াটা আমার বাবা-মা সহজে মেনে নেবেন না এটা জানতাম। যা-ই হোক, বাসায় গিয়ে এ কথা তুলতেই আঁতকে উঠল বাবা-মা। বাবা-মার জেরা শুরু হলো, 'পড়াশোনা বাদ দিয়ে কার সঙ্গে যোগ দিচ্ছ? কী করে ওরা?' আমি বলি, 'সফটওয়্যার তৈরি করে।' মা বলে, 'সফটওয়্যার জিনিসটা কী?' ভেঙে বলি আমি। শুনে মা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'মানুষ কম্পিউটার নিয়ে কী করবে? এটার আবার কী দরকার!' সময়টা ছিল আশির দশক। আর এখন কী অবস্থা দেখো। এখনো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি তোমাদের শুধু তিনটা বিষয় নিয়েই ভাবতে বলব।

প্রথমত, নতুন ভাবনা, মৌলিক চিন্তাকে গুরুত্ব দাও।

মাইক্রোসফট কিন্তু শুধু একটা মৌলিক চিন্তাকে, নতুন ভাবনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ছিল বিল গেটস আর পল অ্যালেনের অসাধারণ নেতৃত্ব যা আর কোনো প্রতিষ্ঠান পেয়েছে কি না সন্দেহ। মাইক্রো প্রসেসর চালানোর মতো সফটওয়্যার দিয়েই কম্পিউটার হলো। সেই কম্পিউটার ছড়িয়ে গেল সবখানে। গবেষণাগারে, অফিসে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে। এরপর প্রতিটি বাসায় স্থান করে নিল এই প্রযুক্তি। এখন এই প্রযুক্তি তো পকেটেও চলে এসেছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে টেলিভিশনেও। আর এ সবই কিন্তু একটা ছোট্ট ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়েই হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সুপ্ত আগ্রহ। এটা কিন্তু খুব সহজ জিনিস নয়। অনেকেই মনে করে, এটা হয়তো

নিজে থেকেই চলে আসে। অনেকের ধারণা, এটা যার থাকে তার এমনিতেই থাকে, আবার যার থাকে না তার থাকেই না। আমি তোমাদের বলব, এই ধারণাটা ভুল ছাড়া আর কিছুই না। নিজে মন, প্রাণ, মস্তিষ্ক দিয়ে খাটলে এটা কিছুই না। নিজের আসল আগ্রহ কিসে সেটা তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। এমন কিছুর সঙ্গে জড়িত হও, কাজ করার সময় নিজের পছন্দের ক্ষেত্র এমনভাবে বেছে নাও, যেন দুর্দিন এলেও মাথা উঁচু করে বলতে পারো, 'যত সমস্যাই হোক না কেন, আমি আমার নিজের কাজ ভালোবাসি।' এবং শেষটি হলো, লেগে থাকতে হবে সব সময়। কোনো কিছুতে হার মানা যাবে না।

চলার পথ কখনোই সহজ হবে না। কিন্তু হেরে গেলে চলবে না। লেগে থাকতে হবে সব সময়। আমাদের কথাই ধরো, আমাদের সময় শুধু মাইক্রোসফট একা নয়, একই সময় আরও অনেক প্রতিষ্ঠান বাজারে এসেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই আজ ধুলোয় মুছে গেছে। অথচ আজও মাইক্রোসফট টিকে আছে। এর কারণ একটাই, আমরা কখনো হার মানতে রাজি ছিলাম না। আমাদের অনেক কঠিন সময় এসেছে, যখন মনে হয়েছে বাজার থেকে ছিটকে পড়তে হবে আমাদের, কিন্তু আমরা ঠিকই ফিরে এসেছি আবার। কারণ আমরা সব সময় আমাদের কাজের পেছনে সময় দিয়েছি, দিন-রাত লেগে থেকেছি কাজের পেছনে। ঠিক একই ধরনের ইতিহাস অ্যাপল, গুগল, ফেসবুকেরও রয়েছে।

কথাগুলো শুধু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করবে তাদের বলছি না। যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করবে, ব্যবসায় ক্যারিয়ার গড়বে, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবে, তাদের সবাইকে বলছি কথাগুলো। কখনো হার মেনে বসে থাকা যাবে না। সব সময় চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, লেগে থাকতে হবে নিজের কাজের পেছনে। আমি জানি তোমরা পারবে। বিদায়।

ঠিক করো, কীভাবে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখবে

এ পি জে আবদুল কালাম

চারোতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। আমি অভিবাদন জানাচ্ছি স্নাতকদের, তাদের শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য। আরও অভিনন্দন জানাই তাঁদের শিক্ষকদের, যাঁরা এই তরুণ আত্মাগুলোকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

'অসাধারণ গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে মহৎ করে তোলে'—এ বিষয়ে আজ আমি আমার কিছু অভিমত তুলে ধরব।

তৃতীয় বর্ষে বৈমানিক প্রকৌশলবিদ্যা পড়ার সময় পাঁচজন সহপাঠী নিয়ে আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো একটি নিম্নস্তরবর্তী আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধবিমানের নকশা তৈরি করার। সিস্টেম নকশা প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব আমার। প্রকল্পটির আনুষঙ্গিক, বিমানের গতির হিসাব এবং কাঠামোগত নকশাও আমাকে দেখতে হবে। বাকি দলের কর্মীরা দেখবে বিমানের পরিচালনক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্বের ভূমিকাসহ অন্যান্য যান্ত্রিক বিষয়গুলো। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মাদ্রাজ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শ্রীনিবাস। আমাদের কাজ দেখে তিনি ঘোষণা দিলেন, প্রকল্পটির পুরোটাই হতাশাজনক। এতজনের নকশা একত্র করে এ পর্যন্ত উপস্থাপন করতে আমরা যে কতটা পরিশ্রম করেছি এবং কতটা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এসেছি, সেটা তিনি কানেও তুললেন না। আমি এক মাস

সময় চাইলাম। অধ্যাপক শ্রীনিবাস জবাব দিলেন, 'দেখো, ইয়ং ম্যান! আজ শুক্রবার দুপুরবেলা। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিচ্ছি। সোমবার সকালের মধ্যে এই নকশার কনফিগারেশন হাতে না পেলে তোমার স্কলারশিপ বন্ধ।' আমার পুরো জীবনটাই যেন কেঁপে উঠল। স্কলারশিপই আমার বেঁচে থাকার প্রধান মাধ্যম। নয়তো আমার পড়াশোনাই হয়তো থেমে যাবে। তাই এ প্রকল্পটি শেষ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পুরো দল আমরা দিন-রাত কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। রাতে ঘুমাতাম না। খাওয়ারও ঠিক নেই। শনিবার নিলাম এক ঘণ্টার ছুটি। রোববার সকালে আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। হঠাৎ মনে হলো, ল্যাবরেটরিতে কারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীনিবাস, যিনি আমাদের কাজের অগ্রগতি দেখছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে আমার পিঠ চাপড়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি জানতাম আমি তোমাকে খ্ুব চাপের মধ্যে রেখেছি। কিন্তু তুমি তোমার নকশা প্রণয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছ।' অধ্যাপক শ্রীনিবাসের দিকনির্দেশনায় আমি এবং আমার দলের প্রত্যেকেই সময়ের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে বুঝতে শিখেছি। আমি বুঝলাম যখন কোনো মানুষ চরমভাবে ঠেকে যায়, তখন তাঁর ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। সেটাই আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আমাদের শিক্ষাটি ছিল, আমাদের বিশেষ দক্ষতা যেটাই হোক না কেন, শিক্ষার্থীদের পদ্ধতি ও প্রকল্পের প্রয়োজনে প্রস্তুত হতে হবে, যা তাদের নতুন উদ্ভাবন, যন্ত্রনির্মাণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করাতে সচেষ্ট করবে। একজন মহান শিক্ষক সেটাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তস্থ করে দেন।

বন্ধুরা, এ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে কেমন ভারত দেখতে চাও তোমরা? পৃথিবীর মানচিত্রে কীভাবে ভারত তার স্থান ধরে রাখবে? কী ধরনের উন্নত সুযোগ-সুবিধা পেতে চাও ভবিষ্যতে? বিগত বছরগুলোতে আমি বলে চলেছি তরুণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কীভাবে ভারতের উন্নয়নের স্তম্ভ নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে। 'পিলারস অব ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট প্রোফাইল-২০২০'-এর মধ্যে কী কী আছে–

একটি জাতি, যেখানে শহর ও গ্রামের মধ্যে কোনো বিভক্তিরেখা থাকবে না। জ্বালানি ও বিশুদ্ধ পানি সমানভাবে বণ্টনের সুযোগ থাকবে; যেখানে কৃষি, শিল্প, চাকরির ক্ষেত্র একই সঙ্গে কাজ করছে। এমন একটি জাতি যেখানে সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে মেধাবীকে মানসম্পন্ন শিক্ষ্াব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। একটি জাতি যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাশালী বিদ্বান, বিজ্ঞানী এবং বিনিয়োগকারী অবস্থান করে। যেখানে শাসনপদ্ধতি হবে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত। যেখানে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা হয়েছে, অশিক্ষাকে দূর করা হয়েছে এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা হয়েছে। জাতি

হিসেবে এটি উন্নত, স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ, সন্ত্রাসবাদমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, সুখী এবং টেকসই উন্নতির পথে ধাবমান এবং পৃথিবীতে বাস করার শ্রেষ্ঠ দেশ এবং যে জাতি তার নেতৃত্বদানে গর্বিত।

এমন ভারতকে পেতে কৃষি এবং খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি এবং নিজস্ব উৎপাদন ও কারিগরি প্রযুক্তি–এই পাঁচটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। বন্ধুরা, অনুগ্রহ করে এ স্তম্ভগুলো মনে রেখো। তাহলে তোমরা নিজেদের পছন্দসই চ্যালেঞ্জ খুঁজে পাবে। প্রতিটি স্তম্ভই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বহন করে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন রূপান্তর একটি আরেকটির পরিপূরক। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তাদের গবেষণাগারগুলো ঘুরে দেখছিলাম, যেখানে পৃথিবীর স্বনামধন্য অধ্যাপকেরা নিয়োজিত থাকেন। আমি দেখছিলাম, কীভাবে অধ্যাপক হংকুন পার্ক তাঁর 'ন্যানো নিডলস' উদ্ভাবন-প্রক্রিয়া বর্ণনা করছিলেন। যা দিয়ে ক্ষুদ্রাতিস্তম্ভ প্রতিটি সেলকে আলাদা করে কাটা কিংবা বিভক্ত করা যায়। এটির সঙ্গে জৈববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে। আমার দেখা হয়েছিল অধ্যাপক বিনোদ মনোহরণের সঙ্গে, যিনি জৈববিজ্ঞানের সঙ্গে 'ন্যানো ম্যাটেরিয়াল' প্রযুক্তির সংগতি নিয়ে কাজ করছেন। আমি দেখছিলাম, কীভাবে একটি গবেষণাগারে দুটি ভিন্ন বিজ্ঞানের শাখা একে অপরকে প্রযুক্তিগত মেলবন্ধন তৈরি করার পথ খুলে দিচ্ছে। এমনটাই আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উদ্ভাবনের আশা করি। নতুন একটি পথ আজ উন্মোচনের পথে। তা হলো বাস্তুসংস্থানবিদ্যা, সারা পৃথিবীতে যার প্রয়োজন নতুনভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। একুশ শতকে এর নতুন মাত্রা আমাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা জোগায়। তাতে কি আমরা প্রস্তুত?

বন্ধুরা, আমি গত ১০ বছরে প্রায় দেড় শ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ মিলিয়নেরও বেশি তরুণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিশেছি। তাদের সঙ্গে আমার কথোপকথনে আমার কাছে মনে হয়েছে, একুশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু নতুন দর্শনের জোগান দরকার। জাতির প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের অগ্রপথিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজেদের সংশোধন করতে হবে, যাতে তা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। একজন ভালো শিক্ষক পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় থাকতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্ম করে দেওয়া। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রযুক্তির আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া।

সবশেষে, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা নিজেদের কীভাবে স্মরণীয় করে রাখতে চাও? তোমাদের উচিত, নিজেদের বিশ্লেষণ করে জীবনকে প্রকাশ করা। একটি কাগজে লিখেও রাখতে পারো। সেই কাগজটাই হয়তো মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে। তোমাদের জাতির ইতিহাসেও হয়তো ওই একটি পাতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেটা হতে পারে কোনো উদ্ভাবনের জন্য, কোনো কিছু নতুন করে পরিবর্তনের জন্য, আবিষ্কারের জন্য, সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য, দারিদ্র্য নির্মূলে অবদান রাখার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য। আমি নিশ্চিত, তোমরা অবশ্যই অভিনব কিছু করবে। সেগুলো হবে, ধরাবাঁধা গতানুগতিক ধারা থেকে ভিন্ন। সুতরাং কী হবে সেই অভিনব অবদানগুলো? সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শিখতী সানি

ব্যর্থতা জিন্দাবাদ - শাহরুখ খান
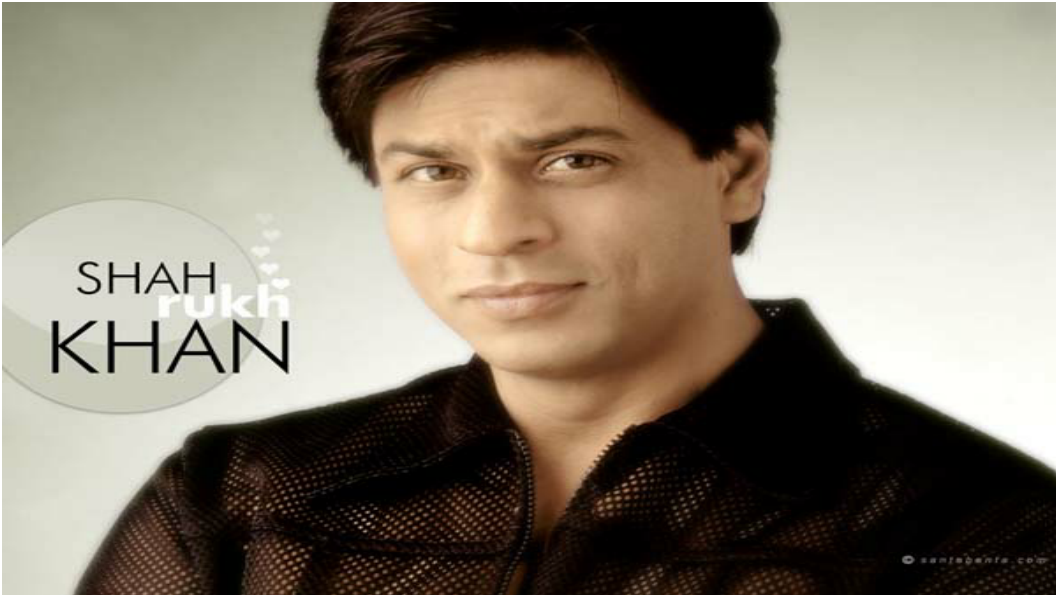
শাহরুখ খান জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা। ১৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

শুভ সন্ধ্যা! আজকে এখানে আসার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আজকে আমি তোমাদের আমার জীবনের সবচেয়ে সরল কথাগুলো বলে যাব। জানি না আমার কথায় তোমরা অনুপ্রাণিত হবে কি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, এই সহজ সত্যগুলো তোমাদের টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

জীবনকে অনেকভাবেই মাপা যায়; বয়স, সময় কিংবা লক্ষ্য দিয়ে বোঝানো যায় জীবনের পথচলা। সময়ের পরিমাপ আমাকে প্রায়ই বিভ্রান্ত করে। যেদিন আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন, সেই একটি দিন আমার কাছে সারা শৈশবের চেয়েও দীর্ঘ মনে হয়। আমার জীবনের গন্তব্য কোথায়, মনে হয় না এই প্রশ্নের উত্তর আমি কখনো জানতাম। আমি হেঁটেছি, প্রাণপণে দৌড়েছি আমার স্বপ্নের পথে, যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু এসেছে, সবই এসেছে নিজেদের নিয়মে। আমি বদলেছি, আমার চারপাশের মানুষেরা বদলেছে, পুরো পৃথিবীটা বদলেছে, এমনকি আমার স্বপ্নও বদলে গেছে। কোথায় পৌঁছাতে হবে, তা আমি সত্যি জানতাম না। আমি শুধু সেটাই করে গেছি, যা আমি জানতাম, আমি সবচেয়ে ভালো পারি।

তাহলে আজকে আমি নিজের মতো করে আমার গল্প বলব। আমার মতে, জীবনের মাপকাঠি হলো হৃদয়ের আর অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা। এর বাইরে আর কিছুতেই তেমন কিছু যায়-আসে না। খ্যাতি, সাফল্য, সৌন্দর্য–এ সবকিছুর চেয়েও একটি পরিপূর্ণ হৃদয়ের মূল্য অনেক বেশি।

আমি একজন অভিনেতা। জর্জ বার্নস বলেছিলেন, ‘অভিনয়ের মূলে রয়েছে সততা’। শুদ্ধ সততার সঙ্গে যখন আমি কোনো চরিত্র রূপ দিতে পারি, তখন সেটাই হয় প্রকৃত অভিনয়। শুদ্ধতম অভিব্যক্তিগুলো আসে অভিনেতার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

এটা সত্যি যে সৃষ্টি যখন সবার সামনে উন্মোচিত হয়, তখনই তা স্রষ্টার থেকে আলাদা হয়ে জনগণের সম্পদ হয়ে যায়। এমন অনেক রাত গেছে, আমি হয়তো কোনো পুরস্কার পেয়ে প্রচণ্ড খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে বাড়ি ফিরেছি। আর তারপর আবিষ্কার করেছি কোনো সমালোচক লিখেছে যে আমাকে পুরস্কারের বদলে কাঁচা কলা দেওয়া উচিত ছিল! রাগে, ক্ষোভে তখন মনে হয়, কাঁচা কলা আর সমালোচক–এই দুটিরই চামড়া ছাড়িয়ে বাঁদরদের উপহার দেওয়া উচিত! এমন মুহূর্তগুলোতে আমি ক্ষণিকের জন্য হাল ছেড়ে দিই, কিন্তু তা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যখন তুমি ভেঙে পড়বে, যখন সারা পৃথিবী তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, তখন টিকে থাকার একটাই উপায়। আর তা হলো, তোমার প্রকৃত সত্তাকে আঁকড়ে ধরা। পৃথিবী

তোমাকে না বুঝতে পারে, ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু অন্তত তোমার নিজেকে চিনতে হবে।

আমার বেলায় ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত সমঝোতার মতো। আমি নিজের মতো অভিনয় করি, করতে চাই, আবার দর্শক আমার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে, সেটাও মাথায় রাখতে হয়। আমাকে একই সঙ্গে আমার সেরা কাজটা দিতে হয়, আবার আমি যাদের জন্য কাজ করছি, তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে যাতে আমি বিচলিত না হয়ে পড়ি, এটাও খেয়াল রাখতে হয়। আমি চেষ্টা করি লাইনচ্যুত না হতে। ভেতরে যা-ই চলতে থাকুক না কেন, বাইরে আমি ঠিকই হাসছি, অটোগ্রাফ দিচ্ছি। কখনো কখনো মনে হয়, আমি একটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে চলছি। আমার দর্শক হচ্ছে পথচারীরা, যারা আমাকে হাততালি দিচ্ছে খানিকটা কৌতুকের বশে, খানিকটা দয়া করে আর খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে। কিন্তু দর্শক যারাই হোক না কেন, আমি জানি আমার অন্তর্নিহিত সত্তা ঠিকই আমার অভিনয় দেখছে, ভালো কাজের জন্য বাহবা দিচ্ছে, আমার বোকামিগুলো দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তাই আমি বলব, নিজেকে চিনতে শেখো, নিজের ওপর থেকে কখনো বিশ্বাস হারিয়ো না। নিজের জীবন নিয়ে কখনো হতাশ হয়ো না। জীবনের ওপর হতাশা আর বিতৃষ্ণা তোমার যত ক্ষতি করবে, তেমনটা আর কোনো কিছুই করতে পারবে না।

নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখো।

সমালোচনা, নিন্দার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। প্রচলিত নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করতে ভয় পেয়ো না। একলা চলতে দ্বিধা কোরো না।

তোমাদের বয়সে আমি যা চাইতাম, আজ আমার সেই সব কিছু আছে। আমি সাফল্য পেয়েছি, খ্যাতি পেয়েছি, আমার যথেষ্ট সম্পদ আছে। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই আমাকে এতটা সুখ দেয়নি, যা দিয়েছে আমার সন্তানেরা। তোমরা এখনো বাবা-মা হওনি, কিন্তু তোমাদের বাবা-মা আছেন, যাঁরা তোমাদের অপরিসীম ভালোবাসেন। পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই তাঁদের ভালোবাসার কোনো তুলনা চলে না। খেয়াল করে দেখবে, সত্যিকারের সুখ এমন সব জিনিসে থাকে, যা কখনো গোনা যায় না। আর দেখ, এই ভালোবাসার বিনিময়ে তাঁরা তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না। তোমরা তাঁদের অনুভূতিগুলোকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, এটাই তাঁদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। আমি দুটো অসম্ভব দুষ্টু শিশুর বাবা হয়ে বলছি। সন্তান হিসেবে তোমরা যা-ই করো না কেন, যত বড় ভুলই করো না কেন, বাবা-মায়ের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই। তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে, তাঁরা বিরক্তিকর,

একঘেয়ে, একগুঁয়ে। আমার সন্তানরাও আমায় তা-ই মনে করে। কিন্তু যদি কখনো কোনো ঝামেলায় পড়ো, তোমার মা-বাবাকেই তুমি সবচেয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারো। আমি অনেক কম বয়সেই মা-বাবাকে হারিয়েছি, আমি জানি, তাঁদের আমি কতটা মিস করি। একটা কথা মনে রেখো, সাফল্য অনেক আকাঙ্ক্ষিত হলেও, বেশির ভাগ সময়ই তা আমাদের বড় কিছু শেখাতে পারে না। আর সেজন্যই সফল হওয়ার চাবিকাঠি-জাতীয় কোনো উপদেশ আমি দেব না। সত্য কথা হলো, আমি যতটা সফল হয়েছি, তা পেরেছি কারণ আমি ব্যর্থতা মানতে পারতাম না। সফল হওয়ার জন্য আমি কখনো এতটা প্রাণপণ চেষ্টা করিনি, যতটা না করেছি ব্যর্থতাকে এড়ানোর জন্য। আমি খুব সাধারণ এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। দারিদ্র্য কী জিনিস তা আমি খুব স্পষ্টভাবে চোখের সামনে দেখেছি। আমি জানি, তার আসল রূপ কতখানি নিষ্ঠুর। যখন আমার বাবা-মা মারা যান, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আর একটি শব্দ যোগ হয়—ব্যর্থতা। আমি কোনোমতেই আর দরিদ্র থাকতে চাইনি। তাই যখন আমি প্রথম অভিনয় শুরু করি, তার সঙ্গে সৃজনশীলতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি যেসব সিনেমা করতাম, তার বেশির ভাগই ছিল অন্যদের ফেলে দেওয়া চরিত্র, অথবা এমন কিছু, যাতে কেউই অভিনয় করতে রাজি হয়নি। আমি সেসব চরিত্রের প্রতিটিতে অভিনয় করেছি, শুধু একটা কারণে, যাতে আমাকে বেকার বসে না থাকতে হয়। এসব করতে করতেই একসময় আমি বড় অভিনেতা হলাম। সাফল্য তার নিজের নিয়মেই আমার জীবনে এসেছে, আমি আমার নিজের কাজটুকু করেছি মাত্র। তাই আমার মনে হয়, ব্যর্থতার যথেষ্ট ভয় না থাকলে, ব্যর্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে সফল হওয়া কঠিন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিছু কথা বলতে পারি।

১. ব্যর্থতা না থাকলে সফল হওয়া কঠিন। ব্যর্থ হওয়ার পর তোমার প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে তুমি এরপর সফল হবে কি না। আমি সব সময় বিশ্বাস করি, যদি একটা উপায় কাজ না করে, তাহলে অন্য কোনো একটা নিশ্চয়ই করবে। তাই আমি চেষ্টা করে যাই।
২. একবার ব্যর্থ হলে আমি আরও বেশি কাজ করা শুরু করি, আরও বেশি চেষ্টা করতে থাকি। বেশির ভাগ সময় এতেই সাফল্য এসে ধরা দেয়।
৩. যখন একের পর এক ব্যর্থতা আসতে থাকে, তখন বুঝতে পারি, আমি হয়তো আমার নিজের সত্তাকে ভুলে আমি যা নই তা হতে চাইছি। তখন আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি, যা আমার কাছে সত্যিকার অর্থেই গুরুত্ব বহন করে, আমি শুধু তাতেই মনোযোগ দিই।
৪. ব্যর্থতা তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কে তোমার প্রকৃত বন্ধু আর কে নয়। সংকটের মুহূর্তগুলোতেই আমাদের সম্পর্কগুলোর পরীক্ষা হয়ে যায়।

৫. যখন আমি ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠি, তখন নিজেকে আরও ভালো করে চিনতে পারি। নিজের সম্ভাবনাগুলোকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করি। এভাবেই আমার আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

জীবনটা আসলে কতগুলো অর্জন, সাফল্য, যোগ্যতা আর পুরস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনকে জানো, স্বপ্ন দেখো; ব্যর্থ হলে ঘুরে দাঁড়াও। তোমার যা আছে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে শেখো। লোকের কথায় কান দিয়ো না আর ব্যর্থতাকে ভুলে যেয়ো না। নিষ্ঠুর হলেও সে-ই প্রকৃত বন্ধু।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

ঝুঁকি নাও, সফল হও - জাভেদ করিম

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাভেদ করিম ১৯৭৯ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৫ সালে সাদ হারলি ও স্টিভ চেনের সঙ্গে মিলে জাওয়াদ করিম জনপ্রিয় ভিডিও বিনিময় ওয়েবসাইট ইউটিউব তৈরি করেন। এই বক্তৃতা তিনি ২০০৭ সালের ১৩ মে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: জাহিদ হোসাইন**

সবারই সম্ভবত ইউটিউব নিয়ে পছন্দ-অপছন্দের মিশ্র অনুভূতি আছে। কারণটা মনে হয় ইউটিউব নিজেই। একদিকে ইউটিউব যেমন প্রত্যেককে রাত জেগে নতুন সব ভিডিও দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। ঠিক উল্টোভাবে বলা যায়, রাতের পর রাত এসব ভিডিও দেখার কারণে ইউটিউব তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।

আমি এ সুযোগে, ইউটিউবের কারণে যাদের সিজিপিএ গ্রেড কমে গেছে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। অনেকে হয়তো জেনে খুশিই হবে যে ইউটিউব তোমাদের থেকে আমার বেশি সময় নষ্ট করেছে! যে কারও থেকে বেশি সময় ভিডিও দেখার জন্য বেশি সময় নষ্ট হয়েছে।

অনেকে খেয়াল করেছ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে যেসব বক্তা আসেন তাদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। খারাপ দিক হলো, বয়সের কারণে আমি তোমাদের জীবন সম্পর্কে গভীর কোনো দর্শনের ধারণা দিতে পারব না। না পারার কারণ হিসেবে বলা যায় আমি নিজেই সেই ধারণা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ভালো দিক হলো তোমরা এবং আমি বয়সে একই প্রজন্মের। তার মানে দাঁড়ায়, আমি যে সুযোগ পেয়েছি, যা শিখতে পেরেছি, তা এখনো প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। তিন বছর আগে আমি যে সুযোগ পেয়েছি, যেসব ধারণা প্রয়োগ করেছি তা তোমরা এখনো একইভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ ও সময় পাবে।

মিনেসোটার হাইস্কুলে পড়ার সময় আমি পৃথিবীর প্রথম জনপ্রিয় ইন্টারনেট ওয়েব ব্রাউজার মোজাইকের কথা শুনি এবং ব্যবহারের সুযোগ পাই। আমি ম্যাপ নিয়ে ইলিনয় খুঁজে বের করি এবং খেয়াল করি জায়গাটা মিনেসোটা থেকে বেশি দূরে নয়। তখনই আমার মাথায় নতুন চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার যদি আমারই বাড়ির আঙিনার লোকজন উদ্ভাবন করে, তাহলে আমি অন্য কোথাও কেন যাব?

সেই সময় আমি কোনো চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমাকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই হবে। আমি হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিলাম কর্তৃপক্ষের চিঠির জন্য। খুব দ্রুতই আমি উত্তর পাই, কিন্তু সে উত্তর ছিল আমার জন্য হতাশাজনক। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলা হয়, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে আমি ভর্তি হতে পারব না। ওই বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়াতে আমার ভর্তির সুযোগ নেই। কিন্তু আমি সিরামিকস প্রকৌশল বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাব। আমি

বলতে চাই না, সিরামিকস বা মৃৎশিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই কিন্তু আমি তো এর জন্য আবেদন করিনি, স্বপ্ন দেখিনি। পুরোপুরি হতাশ হয়েছিলাম আমি। তো আমি তখন কী করতে পারি? আমি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখি এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করা যায় কি না তা জানতে চাই। আমি সেই চিঠিতে লিখেছিলাম, ‘কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ থাকবে আমার আবেদনপত্রের কোনো বিষয়ই যেন উপেক্ষা না করা হয়। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি আমি কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য আগ্রহী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।’

আমার আবেদন পুনরায় বিবেচনা করা হয় এবং আমি কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ পাই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আমার প্রথম শিক্ষা ছিল কোনো কিছুর প্রতি নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকলে তা চূড়ান্ত ফল আনবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরেই আমি এক প্রতিষ্ঠিত ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থ লেনদেনের কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাই। মনে হচ্ছিল, চাকরিটা আমার জন্য বড় একটা সুযোগ। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না পড়াশোনা বাদ দিয়ে কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করা ঠিক হবে কি না? আমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে দুসপ্তাহ সময় নিই। পরে পড়াশোনায় বিরতি দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে পেপ্যাল সদর দপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার মতে, যখন ঝুঁকি গ্রহণের সুযোগ পাবে তা অবহেলা করো না।

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরে সুনামি আঘাত আনে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ধারণ করা সুনামির ভিডিওগুলো খুব দ্রুত গতিতে ইন্টারনেট ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় ইন্টারনেটে কোনো সক্রিয় সাইট ছিল না, যেখান থেকে ভিডিওগুলো সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, দেখা যায়। এলোমেলোভাবে বিভিন্ন সাইটে অপরিকল্পিতভাবে ভিডিওগুলো সংরক্ষণ করা হয়, ভিডিও শেয়ার করার কোনো ভালো সাইট ছিল না। ই-মেইলেও সংযুক্ত করে ভিডিওগুলো পাঠানো যেত না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাকে প্রথমেই একটি ভিডিও প্লেয়ার ইন্সটল করতে হতো। ইন্সটলের পর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল বাড়ির লোকজনকে তা চালানো শেখানো। ইন্টারনেটে ভিডিও দেখার এই সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত সময় ছিল তখন। সুনামির দুই মাসের মধ্যেই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি ও পেপ্যালের দুজন সহকর্মী ভিডিও শেয়ার ও সংরক্ষণের একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করি।

আমরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের দিনে কাজ শুরু করি। ভ্যালেন্টাইনের দিন বলে কি

কাজ বন্ধ থাকবে নাকি? এটাও তো অন্য একটা সাধারণ দিনের মতোই, তাহলে সেদিনই নয় কেন? ২৩ এপ্রিল ইউটিউব ডট কম নামের ওয়েবসাইট আমরা উন্মুক্ত করি। শুরুর দিকে আমাদের ওয়েবসাইট খুব কম জনই ব্যবহার করছে। অন্যদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমরা সাইটটিকে নতুন ধরনের ডেটিং সাইট বলে প্রচার করি। আমরা একটি স্লোগানও ঠিক করি: 'টিউন ইন, হুক আপ'। আমরা কিছু আসল ডেটিং ভিডিও দেখে হতাশ হয়ে উঠেছিলাম। তাই আমরা এখানে সব ধরনের ভিডিও আপলোডের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস ও লাস ভেগাসের মেয়েদের উৎসাহিত করলাম আমাদের সাইটে ভিডিও আপলোডের জন্য। আমরা প্রতি ভিডিওর জন্য তাদের ২০ ডলার পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করলাম। আমাদের এই ঘোষণায় কেউ সাড়া না দিলে পুরস্কার ঘোষণা মাঠে মারা যায়!

আমরা ওয়েবসাইট নিয়ে নতুন চিন্তা শুরু করলাম। পরে জুন মাসেই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক পরিবর্তন আনলাম। সাধারণ একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যেন সব ব্যবহারকারী খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে।

প্রতিষ্ঠার ১৮ মাসের মধ্যেই আমাদের ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা আলোচিত হই। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা খবরের শিরোনাম হই। তাদের অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল, কীভাবে এ ধরনের আইডিয়া আমরা কোথা থেকে পেলাম। আমি তাদের সব সময় একটাই কথা বলি। চারদিকে সব সময়ই মেধাবী মানুষ থাকে, খুঁজে বের করতে হয় তাদের।
তোমরা যখন এই হল থেকে বের হয়ে যাবে, তখন একটা কথাই মনে রাখবে। পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে নতুন কোনো বড় উদ্যোগ সুযোগ সৃষ্টির জন্য। সবাইকে অভিনন্দন।

স্বপ্ন দেখার ডাক দিয়ে যান যিনি - স্টিফেন হকিং

‘বস ঘুমোচ্ছেন’ (Boss asleep)। দরজার ওপর এমন লেখা দেখলে ভেতরে ঢোকাটা মুশকিল। কিন্তু যদি ঠিকঠাকমতো খোঁজ নিয়ে যাও, তাহলে তুমি সাহস করে ভেতরে ঢুকতে চাইবে এবং ঢুকবেও। রুমটা এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো বই, একটা হোয়াইট বোর্ড! রুমের বাসিন্দাকে দেখতে তোমাকে ইতিউতি তাকাতে হবে। প্রথম দর্শনেই যদি দেখতে না পাও, তাহলে হয়তো পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকালেই বুঝবে, তুমি ভুল ঘরে এসেছ। দরজাজোড়া মেরিলিন মনরোর এক বিরাট ছবি! নিজের ভুল বুঝে তুমি যখন বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াবে, তখন শুনবে একটি অদ্ভুত ধাতব কণ্ঠস্বর—স্বাগতম। তুমি ভুল করোনি!

কণ্ঠস্বর শুনে, ঠিকমতো খুঁজে টেবিলের পেছনে, হুইল চেয়ারে বসা বিজ্ঞানীকে দেখতে পাবে। মুখে এক ধরনের হাসি, ‘কী, কেমন চমকে দিলাম।’ ততক্ষণে তুমি সামনাসামনি হয়ে পড়বে এক জীবন্ত কিংবদন্তির! স্টিফেন উইলিয়াম হকিং! হকিংকে বলা হয় আইনস্টাইনের পর সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। কতটা প্রতিভাবান? স্বীকৃতি দিয়েই শুরু করা যাক। কেমব্রিজে যেহেতু তুমি তাঁর রুমে পৌঁছেছ কাজে, নিশ্চয়ই গনভিল ও ফেবুস কলেজের স্টিফেন হকিং ভবন পার হয়েই এসেছ। এবং আসার সময় নিশ্চয়ই তাঁর মূর্তিটিও দেখেছ! দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনেও তাঁর একটি মূর্তি আছে। সান সালভাদরের বিজ্ঞান জাদুঘরটির নাম স্টিফেন হকিং বিজ্ঞান জাদুঘর।

রয়েল সায়েন্স সোসাইটি যখন নতুন ফেলো নির্বাচন করে, তখন তিনি সবার সামনে দিয়ে হেঁটে সভাপতির সামনে রাখা খাতায় সই করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে হকিং যখন ফেলো হন, তখন সভাপতি ওই খাতা নিয়ে একেবারে শেষের সারিতে বসা হকিংয়ের কাছে হেঁটে আসেন। অনেক কষ্ট করে সেদিন হকিং সই করেছেন। কারণ তত দিনে মোটর নিউরন রোগে তাঁর শরীর অসার হতে শুরু হয়েছে! তাঁর পুরস্কারের তালিকা এবার দেখা যাক: এডিংটন মেডেল, হিউজেস মেডেল, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার আলবার্ট আইনস্টাইন মেডেল, রয়াল অ্যাসট্রোনমিক্যালা সোসাইটির স্বর্ণপদক, কপলে মেডেল–এসব পদার্থবিজ্ঞানের সব পুরস্কার তো আছেই, এই সঙ্গে আছে আমেরিকার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম। মনে হতে পারে, তাঁকে সম্মানিত করার জন্য সবাই যেন উঠেপড়ে লেগেছে! কেন? হকিং কাজ করেন এমন একটা বিষয় নিয়ে, যা সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষকে ভাবিত করেছে–দুনিয়ার জন্ম-মৃত্যু! বিশ্বজগতের নিয়মকানুনের রাজা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের খবর দেয় কোয়ান্টাম বিজ্ঞান। এই দুইকে ছাতনাতলে নিয়ে যান প্রথম এই হকিংই। রজার পেনরোজের সঙ্গে মিলে তিনি দেখালেন বিগব্যাং থেকেই এই মহাবিশ্বের (universe) শুরু! অবিশ্বাসীরা চোখ তুলে বলল, ‘সে কী, বিগব্যাংয়ের আগে তাহলে কী ছিল।’ হেসে জবাব দেন হকিং, ‘তার আগে বলো উত্তর মেরুর উত্তরে কী আছে?’

শুধু শুরুতে নয়, কোয়ান্টাম জগতের অনিশ্চয়তা নীতিকে তিনি নিয়ে গেলেন কৃষ্ণবিবরের (ব্ল্যাকহোলের) কাছে এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন কৃষ্ণবিবর কালো নয়! ওর থেকে বের হয়ে আসছে কণাস্রোত! তার মানে, কণা বের হয়ে একসময় কৃষ্ণবিবরও লয় পাবে! কী ভয়ানক! তাহলে তো সবই বিকিরণ হয়ে যাবে শেষ বিচারে!

১৯৭৩ সালে হকিং যখন কৃষ্ণবিবরের কণাস্রোতের কথা বললেন, তখন অনেকেই ভ্রূ কুঁচকেছেন। এখন এই কণাস্রোতের নাম হকিং বিকিরণ! হকিং চেষ্টা করেছেন কালভ্রমণের (Time travel) একটা উপায় বের করার। দেখলেন ওয়ার্মহোল দিয়ে চলে যাওয়া যায় অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে! পদার্থবিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য এমন একটা তত্ত্ব বের করা, যাতে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। এমন একটি তত্ত্বের সন্ধানে এখন হকিং ব্যস্ত! কখনো স্ট্রিং থিউরি, কখনো ভিন্ন কিছু। ১৯৪২ সালে যেদিন ইংল্যান্ডে হকিংয়ের জন্ম, ঠিক এর ৩০০ বছর আগে ইতালিতে মারা যান গ্যালিলিও গ্যালিলি। ২১ বছর বয়সে হকিং আক্রান্ত হন স্নায়ুরোগে, যা এএলএস ডিজিজ নামে পরিচিত। ২০০৯ সালের দিকে এসে তিনি পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছেন। তবে, তাঁর স্বপ্ন রচনা থেমে নেই। জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে তিনি

নিজের চিন্তাকে বিকশিত করেন। বর্তমান স্ত্রীর আগের স্বামীর বানানো কম্পিউটার সফটওয়্যার দিয়ে কথাও বলতে পারেন! তা নিয়ে তিনি ছুটে যান দেশ থেকে দেশে, লোকেদের শোনান বিজ্ঞানের কথা। বলেন, বিজ্ঞান আর গবেষণাকে ভালোবাসতে, যাতে মানবজাতি এগোতে পারে।

কেবল বক্তৃতা নয়, লিখে ফেলেছেন বিজ্ঞানকে সহজ করে বলা বই। এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, ইউনিভার্স ইন এ নাটশেল, ব্রিফার হিস্টরি অব টাইম, ব্ল্যাকহোল অ্যান্ড বেবি ইউনিভার্স প্রভৃতি বই। মেয়ে লুসির কাছে সর্বশেষ লিখেছেন, জর্জ'স সিক্রেট কি টু ইউনিভার্স, যেখানে হ্যারি পটারের স্টাইলে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

হকিং অভিনয় করেছেন স্টারট্রেকের ডিসেন্ট এপিসোডে। যারা তোমরা পিঙ্ক ফ্লয়েডের ডিভিশন বেল অ্যালবামের 'কিপ টকিং' গানটা শুনেছ, তারা সবাই কিন্তু হকিংয়ের সিনথেসাইজড শব্দও শুনেছ! সেখানে তাঁর সিনথেসাইজড ভয়েস ব্যবহার করা হয়েছে।

হকিং যদি বিজ্ঞানী নাও হতেন, তাহলেও তিনি বিখ্যাত হতেন। কারণ ৪৫ বছর ধরে এএলএস রোগে আক্রান্ত কেউ বেঁচে আছেন, এমন কোনো রেকর্ড নেই!

তবে আমাদের সৌভাগ্য যে রোগ তাঁর চলৎশক্তি কেড়ে নিলেও তাঁর মেধা, মনন, দৃষ্টিকে কেড়ে নিতে পারেনি। সে জন্য তিনি স্বপ্ন দেখার ডাক দিয়ে যান।

ভয়কে করো জয় - টম হ্যাঙ্কস

টম হ্যাঙ্কস বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক। জন্ম ১৯৫৬ সালে। তিনি দুবার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, যা অস্কার নামে বহুল পরিচিত। ২০১১ সালের ২২ মে ইয়েল কলেজের এক অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তৃতা দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: শিখতী সানী**

আজকের দিনটি শুধুই তোমাদের। প্লিজ, তোমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো বন্ধ করে ফেলো না যেন। তোমার আইফোন, আইপ্যাড, ব্ল্যাকবেরি, রেকর্ড করার যন্ত্র যেগুলো তথ্য, ছবি, কথা ছড়িয়ে দিতে পারে, সেগুলো বন্ধ করে দিয়ো না। এখান থেকে বেরিয়ে তোমরা টুইটার বা ফেসবুকে তর্কবিতর্ক করে তুলনা করতে পারবে যে আজ স্মরণীয় কিছু ঘটেছে না ঘটেনি। এমনকি এই উপদেশটাও 'টুইট' করতে পারো!

আমার বক্তব্যের মধ্যে একটু গানটান দিয়ে, গ্রাফিকস 'এডিট' করে ওয়েবে ছেড়ে দাও। এটা 'সেনসেশনাল' হয়ে উঠতে পারে। সেটা নিয়ে নেটে অনেক আড্ডা হতে পারে। আমাদের সব

সম্ভবের এই বিশ্বে এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়। সামনের এই বিশ্বে তোমাদের স্বাগতম। এক চাচা তাঁর ভাস্তেকে বলেছিলেন, 'যত দিন পারো কলেজে থেকে যাও। কারণ ঠিক যেদিন তুমি এখান থেকে বের হবে, এর পরদিন থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি তোমাকে কাজ করে যেতে হবে।'

আমি যতবারই কোনো হিসাব-নিকাশে যাই, ততবারই আমাদের আশাভরসার সঙ্গে এসে যায় আমাদের ভয়। আমি এই 'ভয়' শব্দটাকে নিয়ে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। ভয় আমাদের ২০১১ সালের সবচেয়ে মানসিক বাধা। আমরা তোমাদের কলেজে প্রতিবছরই এই প্রত্যাশা করি, এটাই গড়ে দিতে চাই যে ভয় থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো। কারণ আমরা আসলেই বহু কিছু ভয় পাই। ভয় যেন এ শতকের সবচেয়ে সস্তা একটা পণ্যতে পরিণত হয়ে গেছে। সহজে ছড়িয়ে যায় এবং সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে ভয় সবকিছুকে বদলে দেয়। অনেক আগে মার্কিন নৌকর্মকর্তা জন পল জোনস বলেছিলেন, ভয়কে যদি বাড়তে দেওয়া যায় তাহলে সেটা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমি ভয়কে দেখি ভীতিপ্রদ ও স্থবির হিসেবে। আর বিশ্বাসকে সেভাবেই দেখি যা আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে রেখেছি। ভয় প্রতিদিন আমাদের মুখের ওপর চিৎকার করে। বিশ্বাসকে তাই গতিশীল হতে হবে আমাদের চেষ্টায় যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন আয়নায় আমরা নিজেদের দেখব আত্মবিশ্বাসীরূপে। তাই কে হবে আমার গুরু, ভয় না বিশ্বাস?

তিনজনকে খুঁজে পাওয়া গেল যারা ভয়ের চোটে রাতে ঘুমাতে পারে না। এটা অবশ্যই একটা গল্প। মনের ভয় দূর করতে এই তিনজন তীর্থপথে রওনা হলো কোনো এক জ্ঞানীর খোঁজে। অনেক দূরে, পাহাড়ের গুহায় জ্ঞানীর খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানে কোনো গাছ হয় না, কোনো প্রাণী বাস করে না, এমনকি পোকামাকড়ও না। তিনজন পৌঁছে কাতরভাবে শরণাপন্ন হলো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে। প্রথমজন বলল, 'আমাকে রক্ষা করো, ভয় আমাকে পঙ্গু করে ফেলল!' জ্ঞানী ব্যক্তি জানতে চাইলেন, 'কী তোমার ভয়ের কারণ?' সে উত্তর দিল, 'মৃত্যু। কখন যে সে আমার জন্য আসবে!' জ্ঞানী ব্যক্তি উপদেশ দিলেন, 'তোমার ভয়কে দূর করতে দাও আমাকে। মৃত্যু ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে আলিঙ্গন না করছ। তুমি যখনই এই সত্য ধারণ করবে, মৃত্যু আর তোমাকে ভয় দেখাবে না।'
দ্বিতীয় ব্যক্তি তার ভয়ের কারণ জানাল, 'অপরিচিত ব্যক্তি, আমার নতুন প্রতিবেশী, তারা আমার থেকে আলাদা।' জ্ঞানী উত্তর দিলেন, 'ভেবো না আমি তোমার এই ভয় কাটিয়ে দেব। বাড়ি গিয়ে একটি কেক বানিয়ে তোমার প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে যাও। তাদের শিশুদের নতুন

খেলনা উপহার দাও। তাদের গানবাজনায় যোগ দাও, তাদের জীবনধারাকে জানতে শেখো। তুমি তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবে, বন্ধু হবে। আর তোমার ভয় দূর হবে।'

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, 'প্রতিরাতে ঘুমাতে গেলে মনে হয় মাকড়সা সিলিং বেয়ে আমার মাংসের জন্য নেমে আসছে।' জ্ঞানী ব্যক্তি খেঁকিয়ে বললেন, 'তোমার কী ধারণা, আমি এত ওপরে এই পাহাড়ের গুহায় কী করছি যেখানে কোনো প্রাণী বাস করে না? এমনকি মাকড়সাও না?'

ভয় আমাদের সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর সবচেয়ে খারাপ দিকটা নিয়ে নেয় আর আমরা সেটা সম্ভব হতেও দিই।

আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করি যেখানে সবাই এমন বহু জিনিসে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে যেগুলোর অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। জাতিগত বৈচিত্র্য আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি না, যা হয়তো আমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করতে পারত। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি ভয়কে শক্তিশালী হতে উসকে দেবে, নাকি আত্মবিশ্বাসকে একটা সুযোগ দেবে? তোমাকে ঠিক করতে হবে কোনটিকে হতে দেবে। ইয়েল কলেজে আজকের দিনে তোমার সব অর্জন, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতা দিয়ে তোমরা জানো তোমাদের কী করতে হবে।

সামনের দিনগুলোয় সারা পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যোদ্ধারা দেশে ফিরতে থাকবে। ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে তাদের আত্মবিশ্বাস ভয়ে পরিণত হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হবে সেই ভয় দূর করা তাদের চোখ থেকে। তাদের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা জানতে পারে। কাজ দিতে হবে যাতে তারা যোদ্ধা থ েকে একজন সচেতন নাগরিক হতে পারে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বুনে দিয়ো। বাকিটা তারা নিজেরাই করে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তো, সমাবর্তন তো এল বলে। তোমাদের দায়িত্ব শুরু হলো। কিন্তু সব সময় কাজের ক্ষেত্রটি আমাদের জন্য সুখকর হবে না। পরিশ্রম সব সময় সাফল্য না-ও এনে দিতে পারে। দিনগুলো একটির চেয়ে আরেকটিকে অসহ্য মনে হতে পারে। সমাবর্তন থেকে বাকি জীবন পর্যন্ত প্রতিদিন কাজ করে যেতে হবে। ভয় আর আত্মবিশ্বাসের মধ্যে সমঝোতা করতে হবে। ভয় তোমাকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস তোমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোন পথে তুমি যাবে? সব সময় সামনে এগিয়ে যাও। তারপর তোমার ফল টুইটারে জানাও সারা পৃথিবীকে। ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন সবাইকে।

জাগাও সম্প্রীতির বন্ধন - মেলিন্ডা গেটস

উদ্যোক্তা ও সমাজসেবক মেলিন্ডা গেটসের জন্ম ১৫ আগস্ট ১৯৬৪। তিনি বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারপারসন। ব্যক্তিজীবনে তিনি মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটসের সহধর্মিণী। চলতি বছর ১২ মে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এ বক্তব্য দেন মেলিন্ডা।

উপস্থিত সভাপ্রধান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমার প্রিয় শিক্ষাঙ্গনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। সম্মানজনক যে ডিগ্রিটি আমাকে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সদ্য স্নাতক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের সামনে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ সালের কথা মনে পড়ছে। আমি ও তোমরা আসলে একই অনুভূতির অংশীদার। সময় কত দ্রুত কেটে যায়! যদিও আমি এখনো নিজেকে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম মনে করি। যাদের সঙ্গে এখানে আমি চার-চারটি বছর পড়াশোনা করেছি, আর সেই সঙ্গে সারা জীবনের জন্য যেসব বন্ধুকে পেয়েছি, তাদের সঙ্গেও এখনো আমি গভীর আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করি।

১৯৮২ সালে আমি যখন ডালাসে আমার বাসা ছেড়ে এখানে পড়ার জন্য চলে আসি, মা-বাবা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন অলিম্পাস বি-১২ মডেলের বহনযোগ্য একটি টাইপরাইটার। আমার জন্য এই উপহারটি ছিল ভীষণ চমকপ্রদ। কারণটা ছিল তখনকার সময়ের তুলনায় এর হালকা ওজন, যা ছিল প্রায় ১২ পাউন্ড! তখন কম্‌্পিউটার পাওয়া যেত খুবই অল্পসংখ্যক। ওই সময়ে ব্যক্তিগত কম্পিউটার টাইপরাইটারের জায়গা দখল করে নিচ্ছিল। আমরা যারা তখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি, তারা এই বদলে যাওয়াটা সবচেয়ে ভালোভাবে দেখেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর যখন আমি মাইক্রোসফটে চাকরিজীবন শুরু করলাম, তখন শুরু হয় একটা নতুন যুগ, সে যুগ যোগাযোগের। আমার সন্তানেরা তোমাদের থেকে হয়তো বা কয়েক বছরের ছোট হবে, কিন্তু তাদের বড় করার সময় আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি আমাদের প্রজন্ম আর তোমাদের মধ্যে একটিই মাত্র বড় পার্থক্য—তোমাদের একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের ধরন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট এই 'সি' প্রজন্মকে বিশেষায়িত করেছে এভাবে—এরা সব সময় 'কানেক্টেড, 'কমিউনিকেটিং', 'কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' এবং অবশ্যই 'ক্‌্লিকিং'। কিন্তু এত সব যোগাযোগ সত্ত্বেও তোমরা পর্যায়ক্রমে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছো। কারণ, তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে সত্যিকারভাবে সময় কাটানোর থেকে 'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট' জোগাড় করতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছ। একটা ভালো খাবার খেয়ে দেখার থেকে সেই খাবারের ছবি ফেসবুকে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করছ।

তবে আমি মনে করি যারা বলে প্রযুক্তি তোমাদের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, তারা ভুল। এমনকি সেসব মানুষও ভুল, যারা মনে করে প্রযুক্তি তোমাদের আপনা-আপনি কাছাকাছি নিয়ে আসছে। প্রযুক্তি হলো শুধুই শক্তিশালী একটা মাধ্যম, যার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সহজভাবে সম্পর্ক তৈরি করা যায়। কিন্তু সত্যিকারের মানুষের একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক একদম অন্য রকম।

পৃথিবীকে সবার জন্য সম্প্রীতিময় করে তোলার কনসেপ্টটা আসলে কী? তোমাদের মতো সদ্য পাস করে বের হওয়াদের জন্য প্রশ্নটা আসলেই কঠিন। তুমি নিজের মধ্যেই অন্যদের কীভাবে মূল্যায়ন করবে সেই সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে পারো। তুমি সবার ভিতরের মানবিকতাকে প্রথমে দেখতে পারো, তাহলে সবাই সবার থকে আলাদা হয়েও একজন আরেকজনের মিলগুলো দেখতে পারবে। তুমি যদি কেবল বিশ্বাস করো, পৃথিবীর

৭০০ কোটি মানুষের তোমার মতো ইচ্ছাশক্তি আছে, শুধু তখনই তুমি পৃথিবীকে সবার জন্য সমান বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে পারবে।

আমি এখানে এমন একজনের কথা বলতে চাই, যে এখন এখানেই বসে আছে আমাদের মাঝে। পল ফার্মার, ডিউক থেকেই স্নাতক করা মেডিসিনের এই চিকিৎসকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ২০০৩ সালে হাইতিতে, যেখানে তিনি একটি ক্লিনিক পরিচালনা করতেন। ক্লিনিকটা পল তৈরি করেছিলেন অতিদরিদ্র মানুষগুলোর জন্য, যাদের চিকিৎসা নেওয়ার ন্যূনতম সুযোগ ছিল না। তাঁর ক্লিনিকে যাওয়ার সময় আমাদের প্রায় ১০০ গজের মতো হাঁটতে হয়েছিল গাড়ি থেকে নেমে। এই পুরো রাস্তায় দেখা হওয়া প্রতিটি মানুষের সঙ্গে পল তাদের নাম ধরে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন! আর যখন আমরা ক্লিনিকের রোগীদের অপেক্ষা করার জায়গায় পৌঁছাই, সেখানে আমি একটি সুন্দর ছায়াঘেরা বাগান আবিষ্কার করি। অথচ হাইতিতেই আমি একই রকম একটা ক্লিনিকে গিয়েছি, যেখানে গরিব মানুষদের প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে বাইরে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

পল নিজের মধ্যে ছোট্ট একটু পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক তৈরি করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সময় বের করে নিয়েছিলেন সেই বাগানটা তৈরি করার জন্য, মানুষের নাম মনে রাখার জন্য, আর সবার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলার জন্য। অবশ্য সবাইকেই পল ফা্র্মারের মতো হতে হবে না। শুধু গরিব মানুষদের চিকিৎসা দেওয়া মহৎ মানুষেরাই নয়, তোমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারো সবার সঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে মিশে যাওয়ার নতুন পথ।

আফ্রিকা মহাদেশেও এখন প্রায় ৭০ কোটির মতো মুঠোফোন রয়েছে। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে বিদ্যুৎ না থাকার পরও তরুণেরা বাজারে গিয়ে তাদের মুঠোফোন চার্জ করে আনে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমরা তরুণেরা একজন আরেকজনের সঙ্গে নিজের গল্পগুলোকে মেলে ধরতে পারো। একজন আরেকজনের জীবনে ঢুকে যেতে পারো, দেখতে পারো ওরা কী পড়ছে, শুনতে পারো ওরা যা শুনছে।

আমি এটা হলফ করে বলতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে তোমরা এই পৃথিবীকে আরও এগিয়ে নিতে পারো এবং আরও নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। আমি এও বিশ্বাস করি, এই নতুন যোগাযোগ তোমাদের সাহায্য করবে তোমাদের কাজে, সাহায্য করবে পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে।

তোমরা পারো পুরো পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষকে এক ছায়াতলে নিয়ে আসতে। বিশ্বের অন্যতম ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বছর কাটিয়ে তোমরা শিখেছ কেমন করে সফল হতে হয়। আমার প্রত্যাশা, প্রযুক্তির এই অসাধারণ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে তোমরাই তৈরি করবে একটা সুন্দর পৃথিবী। একটা পৃথিবী যা হবে সৌহার্দ্যের, বন্ধুত্বের। অধীর আগ্রহে আমি অপেক্ষা করছি সেই দিনটি দেখার জন্য। সবাইকে আবারও একবার অভিনন্দন।

সূত্র: টুডে ডিউক, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: আফরিনা হোসেন

শিখতে হবে জীবন থেকে - অং সান সু চি

ঘোষণার ১৯ বছর পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'সিভিল ল ডক্টরেট' সম্মাননা গ্রহণ করলেন মিয়ানমারের (বার্মা) অবিসংবাদিত নেত্রী অং সান সু চি। নোবেলজয়ী সু চি ষাটের দশকে অক্সফোর্ডের সেন্ট হাগস্ কলেজে পড়েছেন দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি

বিষয়ে। আশির দশকে অক্সফোর্ডে কেটেছে তাঁর পারিবারিক জীবন। দীর্ঘ গৃহবন্দিত্বের অবসানের পর ২০ জুন ২০১২ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই বক্তৃতাটি দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: শিখতী সানী**

আজকে আমার জীবনের অনেকগুলো মোড় যেন একসূত্রে এসে মিলেছে। মনে পড়ছে সেন্ট হাগ্স কলেজে শিক্ষার্থী হিসেবে কাটানো সেই বছরটি; পার্ক টাউনে একজন স্ত্রী এবং মা হিসেবে কাটানো সেই দিনগুলো। মনে পড়ছে, সেই বছরটি, যে বছর আমি গৃহবন্দী হলাম, যখন পুরো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়–আমার বিশ্ববিদ্যালয়–আমাকে সমর্থন করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অক্সফোর্ডে কাটানো এমন সুখকর মুহূর্তগুলোই আমার জীবনের কঠিন দিনগুলোতে প্রেরণা জুগিয়েছে। দুঃসহ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য সেই স্মৃতিগুলো আমার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিল।

এই স্মৃতিগুলো সব কিন্তু খুব সাধারণ। আমি হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে শেরওয়ালে বেড়াতে গিয়েছিলাম কিংবা কলেজ প্রাঙ্গণে বসে বই পড়েই কাটিয়েছিলাম। কিংবা লাইব্রেরিতে বসে বইয়ের দিকে না তাকিয়ে উদাসভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু দিনগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। কারণ, তখন আমার জীবনটা ছিল অসাধারণ আনন্দের। সেই আনন্দের জীবনটাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মিয়ানমারের তরুণ প্রজন্মের চাওয়াকে, যারা এমন একটা জীবন চায়, যে জীবনের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ এবং বাস্তবতা তাদের নেই।

আজ যখন আমি অক্সফোর্ডকে দেখি, এখানকার শিক্ষার্থীদের দেখি (এই গতকালও আমি ঘুরে বেড়িয়েছি আমার সেন্ট হাগস্ কলেজে) আমি আমার মধ্যে সেই তরুণ সু চিকে খুঁজে পাই–স্বাধীন, নির্ঝঞ্ঝাট, চমৎকার।

আমার অক্সফোর্ডের দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। মনে পড়ে আমার প্রিয় বন্ধু অ্যানের সঙ্গে বাসে করে যেতে যেতে ছোটখাট নানা বিষয়কে দর্শনতত্ত্ব বানিয়ে ফেলার সময়গুলো। পৃথিবী তো আসলেই নানা বৈচিত্র্যে গড়া। তবে সেটা নিয়ে আমরা ভীত ছিলাম না। ভিন্নতার জন্যই আমরা শক্তিশালী। এখানে আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সমস্যায় আমরা কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে চলব। আমি এখানে ‘জন লো ক্যারের’ কথা স্মরণ করতে

চাই, যাঁর বই আমার গৃহবন্দিত্বের সময় অনেক সাহায্য করছিল। এতে ছিল মুক্তির কথা, বৃহত্তর এই পৃথিবী ভ্রমণের কথা। এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর নয়, চিন্তা আর ধ্যান-ধারণার সফর। এই সফরের প্রেরণাই মানবসমাজ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। আমি কখনো একা ছিলাম না। আমার পদচারণ ছিল বিস্তৃত। আর এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে অক্সফোর্ডের ক্যাম্পাসে এবং বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো আমার সেই সুন্দর দিনগুলোর জন্য। আমি চাই, আমাদের তরুণেরা জানুক কেমন অনুভূতি হয় যখন এই পৃথিবীটা তাদের এবং তারাই এই পৃথিবীর সব। এতে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাবালক হয়ে উঠবে।

আমার কাছে অক্সফোর্ড সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো, এখানে আমি যা শিখেছি, সেগুলো টেক্সট বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আমি এখানে মানবসভ্যতাকে সম্মান করতে শিখেছি।

আমি প্রায়ই ভাবি, গত কয়েক যুগ ধরে মিয়ানমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসজীবনবিহীন দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা। ক্যাম্পাসজীবন মানেই যেখানে আমাদের তরুণ প্রজন্ম তাদের মতো করে পৃথিবীকে গড়ে তুলবে; তাদের নিজেদের পৃথিবীকে নির্মাণ করবে নিজেরাই। কিন্তু মিয়ানমারে তাদের একটি শৃঙ্খলে রাখা হতো। সবাই জানে, তরুণকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যায় না, নিয়মে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। তাই আমি মিয়ানমারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেই সোনালি সুযোগ গড়ে দিতে চাই। আর আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব যদি আমার বিশ্ববিদ্যালয়—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়—সেটি গড়তে সাহায্য করে।

আমার অক্সফোর্ড জীবনে আমি-ই একমাত্র মিয়ানমার থেকে পড়তে এসেছিলাম। প্রথম বছরগুলোতে আমার দেশের কোনো বন্ধু ছিল না। মূলত ইংরেজ আর ঘানা, ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগতরাই পড়ত সেখানে। কিন্তু আমার কখনো নিজেকে আলাদা মনে হয়নি। সবাই আমরা যেন এক ছিলাম—আমরা সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এটি জাদুমন্ত্রের মতো আমাদের বেঁধে রেখেছিল, যা কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতা আলাদা করতে পারবে না। অক্সফোর্ড ছিল আমাদের মুক্তমনকে বিকশিত করার স্থান। ছিল না কোনো পক্ষপাতিত্ব। প্রত্যেকে এখানে ধারণ করে আছে নিজেদের মূল্যবোধ এবং সম্মান। মিয়ানমারে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি এই মূল্যবোধকেই ধারণ করে ছিলাম। মিয়ানমার একটি নতুন পথ প্রতিষ্ঠায় শুরুতে দাঁড়িয়ে। ইংল্যান্ডের মতো আমাদের এই পথ সহজ নয়। আমাদের এই পথ পাড়ি দিতে হবে এবং সামনে এগোতে হবে। মিয়ানমারকে নিয়ে অনেকের আশার শেষ নেই। তারা

ভাবছে, লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডের পথের মতোই হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে আমরা। কিন্তু আমি বলব, এই পথের প্রতিটি ইঞ্চি আমাদের নির্মাণ করতে হবে এবং আমি আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

আমি আজ আমার পুরোনো কলেজে ফিরে আসতে পেরে গর্বিত। এমন সম্মাননা পেয়ে, অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসতে পেরে আমি উদ্বেলিত। আমি যেন আমাদের অক্সফোর্ড শিক্ষাজীবনে ফিরে গেছি। তাই তোমাদের চেয়ে আমাকে তেমন আলাদা মনে হয় না। তবে আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা নতুনদের থেকে আলাাদা। সামনের পথ আমার জন্য সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, অক্সফোর্ড আমার কাছে সবচেয়ে সেরাটাই আশা করে।

তাই আজ অক্সফোর্ড তার মধ্যেই আমাকে ধারণ করে নিয়েছে। অক্সফোর্ডের কাছ থেকে এ অর্জিত প্রেরণাই আমাকে সামনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার শক্তি জোগাবে।

জীবনে ঘুরে দাঁড়াতে হয় লড়াই করে - মিশেল ওবামা

অরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটি ২০১২-এর শিক্ষার্থীদের সামনে আসতে পেরে আমি শিহরিত হচ্ছি।

আজকে যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছ, তাদের জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

এই কঠোর পরিশ্রম তোমরা কেউ কিন্তু একা করোনি। আজ তোমরা সবাই তাঁদের সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছ। তাঁরা হলেন তোমাদের বাবা-মা। সবাই জোরে হাততালি দাও তাঁদের জন্য।
আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি তার কারণ হলো আমার পরিবার। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল দলের কোচ ক্রেগ রবিনসন আমার বড় ভাই। গত বছর সে

আমাকে বলে রেখেছিল যে এবার যদি আমি ওদের সমাবর্তনে না আসি, তাহলে মায়ের কাছে আমার নামে নালিশ দেবে!

যুক্তরাষ্ট্রে তোমরা অনন্য নজির স্থাপন করেছ। কৃষি থেকে শুরু করে ন্যানো টেকনোলজি–সব ক্ষেত্রেই তোমরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছ। তোমরা সব ক্ষেত্রেই অবদান রাখছ; শিক্ষক হিসেবে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে, ক্ষুধা ও রোগের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ করে। তাই আমাকে বলতেই হবে, এখানকার পরিবেশটা অনেকটা ক্রেগের মানে আমাদের নিজেদের বাসার মতো। কারণ, এখানকার মূল্যবোধ, চর্চা সবই যেন আমাকে সেই পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছিলাম। আমরা শিকাগোতে থাকতাম। আমি, আমার ভাই, বাবা আর মা। এই চারজন মিলে ছোট্ট এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম আমরা। হ্যাঁ, আমাদের বাসা ছোট্ট ছিল সেটা ঠিক। কিন্তু বাসার সব জায়গায় ছিল আন্তরিকতার ছাপ, ভালোবাসার ছড়াছড়ি। প্রতি রাতেই আমরা খাবার টেবিলে হাজার ধরনের গল্পে মেতে উঠতাম। একসঙ্গে কার্ডসহ বিভিন্ন ধরনের বোর্ডগেম খেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতাম আমরা চারজন। আমরা জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে রাঙিয়ে তুলতাম। স্কুলের রিপোর্ট কার্ড পাওয়াটাও ছিল মজার উপলক্ষ। ভালো গ্রেড মানেই ছিল পিৎজা পার্টি। বাবা যখন ঘুমাতেন, তখন তাঁর চশমার কাচে শেভিং ক্রিম লাগিয়ে মজা করতাম আমরা দুই ভাইবোন। কিন্তু বাসায় যে শুধু মজাই ছিল তা নয়। আমাদের পড়াশোনা নিয়ে বাবা-মা সব সময় অনেক বেশি সিরিয়াস ছিলেন। কিন্ডারগার্টেনে ভর্তির অনেক আগেই আমাকে আর ক্রেগকে পড়তে শিখিয়েছিলেন আমার মা। বাসার পাশের স্কুলটিতে মা পড়াতেন। এমনি একদিন ক্রেগের বয়স যখন ১০, তখন ও বাবাকে খুব সহজ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। প্রশ্নটা ছিল, 'বাবা, আমরা কি বড়লোক?'

এ কথার উত্তর বাবা দিলেন একটু অন্যভাবে। যেদিন তিনি বেতন পেলেন, সেদিন বেতনের চেকটা ভাঙিয়ে বেতনের সব টাকা বাসায় নিয়ে এসে একটি টেবিলে ছড়িয়ে দিলেন। তা দেখে ক্রেগ যেন খুশিতে আত্মহারা। 'আমাদের যেহেতু এত টাকা, তাহলে আমরা অবশ্যই অনেক বড়লোক।' কিন্তু এর পরই বাবা ওই টাকাগুলো আলাদা আলাদা ভাগ করে দেখিয়ে দিতে থাকলেন, এর কোনো অংশটা যায় বাড়িভাড়ায়, কোনোটা যায় গ্যাসে, কোনোটা যায় বাজারসদাই করতে... এভাবে ভাগ করতে করতে আর একটা টাকাও অবশিষ্ট থাকল না। ক্রেগ এটা দেখে অনেক বিস্মিত হলো, আমিও কম বিস্মিত হলাম না!

আমরা এমন একটা পরিবারেই বেড়ে উঠেছি। আমরা হয়তো যথেষ্ট ধনী ছিলাম না। কিন্তু

ওই অল্প টাকাতেই নিজেরা ধনীর মতো করে কখনো কোনো কিছুর জন্য আক্ষেপ না করে বাঁচতে শিখেছি। আমি তোমাদের পরামর্শ দেব, সব সময় মনে রাখবে জীবনে যত কঠিন সময়ই আসুক না কেন, চিন্তা করবে তোমার কাছে কি আছে সেটা, যেটা নেই সেটার জন্য আফসোস করবে না কখনোই।

জীবনে কতটা সুখী হলে, কত আরামে থাকলে তাতে জীবনের সার্থকতা নয়। জীবনের আসল সার্থকতা হলো বিপদের সময় হার মেনে না নিয়ে লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ানো। বিপদের সময় প্রশ্ন একটাই, 'যা নেই সেটার কথা ভেবে হার মানবে না, যা আছে সেটাকেই শক্তি ভেবে লড়াই চালিয়ে যাবে।' নিজের স্বপ্নকে নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে জীবনে। যেটা তোমার স্বপ্নের কাজ, সেটা করার চেষ্টা করবে সব সময়। অন্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নে যত আনন্দ, তার চেয়ে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আনন্দ অনেক বেশি।

শেষ করব একটি উপদেশ দিয়ে। জীবনে অসম্পূর্ণ কিছু রাখবে না। যখন যেটা করে ফেলতে পারো করে ফেলো। সামনের জন্য কাজ জমিয়ে রাখাটা ঠিক নয়।

যদি কখনো লড়াই করতে হয়, তবে সেটার জন্য ঠিকভাবে প্রস্তুত হও।

যদি কষ্ট পাও, তবে সেটাকে বিলীন হতে দাও।

কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেললে ক্ষমা চাও।

কাউকে ভালোবাসলে সেটা তাকে জানাও।

কাউকে ভালোবাসলে সেটা শুধু মুখে বলো না, কাজেও করে দেখাও।

শুধু ফেসবুকে লাইক আর টুইটারে শেয়ার করেই বসে থেকো না। কারও পাশে দাঁড়ানো মানে হলো তার কাছে গিয়ে পাশে দাঁড়ান। আমার আজও ভালো লাগে, যখন দেখি পরিবারের সবার ভেতরের টানটা। সবাই সবার সঙ্গে হাসিখুশি মনে কথা বলছে, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে। আর এসব নিয়েই, পরিবারের ভালোবাসা নিয়েই আমি আর ক্রেগ সারা জীবন নিজেদের ধনী ভাবতে পেরেছি। আজকের দিনটায় আমার কামনা, তোমরা যেন সব সময় নিজেকে ধনী ভাবতে পারো। কখনোই নিজেদের ছোট মনে করবে না। যা আছে

তা-ই নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে শেখো। তোমাদের অসাধারণ অর্জনের জন্য আরও একবার অভিনন্দন জানাই।

(মিশেল ওবামা মার্কিন ফার্স্ট লেডি। জন্ম ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৪। অরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে ২০১২ সালের ১৭ জুন তিনি এই বক্তৃতা দেন অরেগন)

সূত্র: ওয়েবসাইট
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

জানার জন্যই জানতে চাই - মাইক বেকার

২০১১ সালে অক্সফোর্ড ব্রুকস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বক্তব্য দেন মাইক বেকার। দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা করেছেন বিবিসিতে, শিক্ষা বিষয়ে। **ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ: রুহিনা তাসকিন**

আজ আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। সবাইকে অভিনন্দন।

আমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছি ৩২ বছর আগে, ১৯৭৯ সালে। মার্গারেট থ্যাচার তখন সবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, সনি ওয়াকম্যানকেই ধরা হতো শীর্ষ প্রযুক্তিপণ্য, গড়পড়তা বাড়ির দাম

ছিল ১৩ হাজার পাউন্ড, মুদ্রাস্ফীতি ১৭ শতাংশ...আর আপনাদের বিশ্বাস হবে না, ফুটবল লিগে আমার প্রিয় দল ইপসউইচ টাউন ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চেয়েও দুই ধাপ আগে! সেটা একেবারেই একটা অন্যরকম দুনিয়া ছিল।

তখন ইংল্যান্ডের স্কুলগুলো জাতীয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে এ পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে থ্যাচারের আমল থেকেই।

এর কিছু সময় পর থেকেই আমি শিক্ষা নিয়ে সাংবাদিকতা করতে শুরু করি।

আশির দশকের শেষে থ্যাচারই শুরু করেন জাতীয় পাঠ্যক্রম ও জাতীয় পরীক্ষার। এরই ধারাবাহিকতা চলছে এখনো।

তবে এখন আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষাক্ষেত্রকে স্বাধীনতা থেকে জবাবদিহির পর্যায়ে আনাটা অনেকটাই লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে। পরীক্ষাগুলো সঠিক হচ্ছে না, তা বলছি না। কিন্তু এত ঘন ঘন পরীক্ষা নেওয়া আর এগুলোকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারও ঘটছে।

ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় একসময় সবচেয়ে কম পরীক্ষা নেওয়া হতো। মাত্র কয়েক দশকেই এখন তা হয়ে গেছে অনেক বেশি। বেশির ভাগ স্কুলই শেখানোর বিষয়টাকে সঙ্কুচিত করে এনেছে। তারা জোর দিচ্ছে শুধু পরীক্ষার সিলেবাসের ওপর।

আমি ভাগ্যবান যে সিলেবাসের বাইরে অনেক কিছুই আমাদের শেখানো হতো। আর সে বিষয়গুলোই আমার জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে।

যেমন, আমাদের ইংরেজি শিক্ষকের মনে হয়েছিল ও লেভেলে ইংরেজি সিলেবাসটা খুবই ছোট। তাই তিনি আমাদের নিজস্ব সিলেবাস তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর তখনই আমি আবিষ্কার করি জর্জ অরওয়েলের সাহিত্য, যা পরে আমার সাংবাদিক জীবনের বীজ বুনে দিয়েছিল।

বলা যায়, সেই প্রাইমারি স্কুলশিক্ষকের কথা, যিনি স্কুলে দুপুরের খাবারের সময়ে টেলিভিশনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে দিয়েছিলেন; যা আমাকে সারাজীবনের জন্য ক্রিকেটে আগ্রহী করে

তুলেছে।

এসব কথা বললাম, বড় পরিসরে শিক্ষার বিষয়টি বলার জন্য। পরীক্ষার তারিখে চোখ না রেখে, ক্যারিয়ার বা শিক্ষায় পরের ধাপ পার হওয়ার বাধ্যবাধকতায় না থেকে শুধু শেখার বিষয়টি ভাবার জন্য।

তবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ, শিশুরা যাতে সেসব শেখে, যাকে আমাদের রাজনীতিকেরা মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য সব শিক্ষাকেও যেন আমরা সঙ্কুচিত না করি। শুধু শেখার আনন্দ পাওয়ার জন্য, নতুন কিছু জানার জন্যও যেন শিখি।

আর আমার এ ধারণা আরও শক্ত হয়েছে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর।

ছয় মাস আগে আমার চতুর্থ পর্যায়ের ফুসফুস ক্যানসার ধরা পড়ে। আমি হতবাক হয়ে যাই। কারণ, আমি কখনোই ধূমপান করতাম না।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, একদম আগের মতোই জীবন যাপন করা। ক্যানসার আমাকে হারাতে পারবে না।

কিন্তু যখন কেমোথেরাপির প্রভাব পড়তে শুরু হলো, জীবন কতটা ছোট, তা আমি ভাবতে শুরু করলাম। আর তখন থেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যেতে লাগল।

আমি আমার কাজটা খুব উপভোগ করতাম।

কিন্তু এই সময়ে আমি উপলব্ধি করলাম, কাজকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমি যেন অন্যান্য বিষয়ে খুব সাদামাটা থেকে গেছি।

সব সময় আমি ডেডলাইন ধরার জন্য ছুটতাম। ১০টার খবরে কীভাবে আমার রিপোর্ট ধরাব, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতাম।

কিন্তু এখন আমি কাজ আর জীবনের ভারসাম্য চাই। আর শুধু আনন্দ পাওয়ার জন্যই ছোটখাটো কিছু বিষয় শিখতে চাই।

যেমন, আমার আশপাশের গাছগুলো নিয়ে আমি জানতে চাই। এখন তাই আমি হাঁটতে যাই গাছ চেনে এমন একজনকে সঙ্গে নিয়ে। আর কাঠের কাজ শেখার ক্লাসেও ভর্তি হয়ে গেছি।

এই তালিকাটা বেশ লম্বা, সেটা শুনিয়ে আপনাদের আর বিরক্ত করতে চাই না।

কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিস আছে–সেটা হলো, শেখার আগ্রহ। পেশাজীবনে ভালো করা বা উপার্জনের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা থেকে নয়, শুধু জানার জন্যই জানতে চাই।

আর এখন এটাই আমার উপলব্ধি, ডেডলাইন ধরার তাড়ায় যা কিছু আমি আগে এড়িয়ে গেছি, তা এখন শিখতে চাই।

আপনারা শিক্ষক হতে যাচ্ছেন, শুধু গ্রেড আর পাস নম্বরেই মনোযোগ দেওয়ার জন্য চাপ আসবে আপনাদের ওপর। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান।

মনে রাখবেন, এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর বাইরে অনেক বিছু শেখানোর আছে। যার প্রভাবে হয়তো আপনাদের জীবনটাই বদলে যাবে।

শেখার আনন্দ শেখা, এটাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

ব্যতিক্রম বিশ্ব ব্যক্তিত্ব - ওয়ারেন বাফেট

ওয়ারেন বাফেট। এক সময় মুদি দোকানে কাজ করতেন। ছিলেন হকার। বিক্রি করতেন সংবাদপত্র। এখন দুনিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী। বর্তমানে ৬৩টি কোম্পানির মালিক। এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১০০ কোটি ডলার দান করেছেন বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায়। তারপরও তিনি ৪ হাজার কোটি ডলারের মালিক। এখন তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক বিশেষণ। মার্কিন বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী এবং লোকহিতৈষী বলে পরিচিতি পেয়েছেন। অনেকে তাকে 'মিরাকল অব ওমাহা' নামে ডাকেন। এত বিত্তবেসাতের মালিক হয়েও তার মধ্যে নেই কোন বিলাসিতা।

জীবন যাপন করেন অতি সাধারণ মানের। ৫০ বছর আগে বিয়ের পরে ৩ বেডরুমের যে বাড়িটি কিনেছিলেন এখনও সেখানেই বাস করেন। এমনকি বাড়িটির চারপাশে নেই কোন আলাদা প্রাচীর। তিনি বলেন, আমার যা কিছু দরকার তার সবই আছে এখানে। বিশ্বের এত বড় ধনী, তার বাসার চারদিকে নেই কোন বেড়া বা সীমানা প্রাচীর। এ বিষয়ে তার পরামর্শ হলো- প্রকৃতপক্ষে আপনার যতটুকু দরকার তার বেশি কিছু কিনবেন না। আপনার সন্তানদেরও এমনটা ভাবতে ও করতে শেখান। নিজের গাড়ি তিনি নিজেই চালান। তার আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জেট কোম্পানি। কিন্তু ভ্রমণ করেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইকোনমিক ক্লাসে। অনেকেই ভাবতে পারেন, এটা অসম্ভব। কিন্তু তিনি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সমপ্রতি তিনি সিএনবিসি-কে এক ঘণ্টার একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তুলে ধরেছেন জীবনের উত্থান কাহিনী। তার মতে, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য নিজেকে

আগে স্থির করতে হয় তার লক্ষ্য। তিনি এমনই এক লক্ষ্য নিয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম শেয়ার কিনেছিলেন। তারপরও তিনি মনে করেন এ ব্যবসায় আসতে তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরও আগে ব্যবসা শুরু করা উচিত ছিল। তাই তার পরামর্শ আপনার সন্তানকে বিনিয়োগে উৎসাহিত কর্বন। সংবাদপত্র বিক্রি করা অর্থ দিয়ে তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে ছোট্ট একটি ফার্ম কেনেন। তার মতে, অল্প অল্প করে জমানো অর্থ দিয়ে যে কেউ কিনতে পারেন অনেক কিছু। সেজন্য সন্তানদের তিনি কোন না কোন ব্যবসায় নিয়োজিত করার পরামর্শ দেন।

১৯৩০ সালের ৩০শে আগস্ট নেবরাসকা'র ওমাহা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এই বরেণ্য ব্যক্তি। তার পিতার নাম হাওয়ার্ড বাফেট। ওয়ারেন হলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। শৈশবে কাজ করেছেন মুদির দোকানে । মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে তিনি জমা দেন আয়কর রিটার্ন। সেখানে তিনি নিজেকে সংবাদপত্র বিলিকারী হিসেবে পরিচয় দেন। তার পিতা হাওয়ার্ড যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পর তিনি পড়াশোনা করেন ওয়াশিংটনের উডরো উইলসন হাই স্কুলে। ১৯৪৫ সালে তিনি হাই স্কুলে থাকতেই এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবহার করা একটি পিনবল মেশিন কেনেন মাত্র ২৫ ডলারে। মেশিনটি বসানোর মতো জায়গা ছিল না তাদের। তারা এক নাপিতের দোকানের ভেতরে তা বসিয়ে দিলেন। এর মাত্র কয়েক মাসের মাথায় তারা বিভিন্ন স্থানে বসালেন একই রকম তিনটি মেশিন। এভাবেই তার ব্যবসায় যাত্রা শুর্ব। তিনি ১৯৫০ সালে ইউনিভার্সিটি অব নেবরাসকা থেকে অর্থনীতিতে অর্জন করেন বিএস ডিগ্রি। ১৯৫১ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে এমএস হন। ১৯৫১ থেকে '৫৪ পর্যন্ত বাফেট-ফক অ্যান্ড কো.-তে ইনভেস্টম্যান সেলসম্যান হিসেবে চাকরি করেন।

নিউ ইয়র্কে গ্রাহাম-নিউম্যান করপোরেশনে সিকিউরিটি এনালিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৫৪ থেকে '৫৬ পর্যন্ত। এছাড়া তিনি বাফেট পার্টনারশিপ লি., বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ইনস্যুরেন্সসহ বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করেছেন। এর বেশির ভাগই তার নিজের। ১৯৬২ সালে তিনি পরিণত হন মিলিয়নিয়ারে। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে হলো একটি টেক্সটাইল কারখানা। এখানকার প্রতিটি শেয়ার তিনি ৭.৬০ ডলারে জনগণের মাঝে ছেড়ে দেন। এক পর্যায়ে ১৯৬৫ সালে প্রতি শেয়ারের বিপরীতে কোম্পানি ১৪.৮৬ ডলার দেয়। এর মধ্যে ফ্যাক্টরি এবং সরঞ্জাম দেখানো হয়নি। এরপর তিনি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কেন চেস-এর নাম ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি শেয়ার হোল্ডারদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত চিঠি লেখা শুর্ব করেন। শেয়ারহোল্ডারদের কাছে এ চিঠি ভীষণ

জনপ্রিয়তা পায়। এ সময়ে বেতন হিসেবে তিনি বছরে পেতেন ৫০ হাজার ডলার। ১৯৭৯ সালে তার বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে প্রতি শেয়ারের জন্য ৭৭৫ ডলার দিয়ে ব্যবসা করতে থাকে। এই শেয়ারের দাম ১৩১০ ডলার পর্যন্ত ওঠে। এ সময়ে তার নিট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২ কোটি ডলার। এর ফলে ফরবিস ম্যাগাজিনে প্রথমবারের জন্য তিনি ফরবিস ৪০০-তে স্থান পান। ২০০৬ সালের জুনে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি বার্কশায়ার হোল্ডিংয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ বার্ষিক উপহার হিসেবে পাঁচটি ফাউন্ডেশনে দিয়ে দেবেন এবং তা শুরু হবে জুলাই থেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ দেয়া হয় বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনকে। ২০০৭ সালে তিনি শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে এক চিঠিতে জানান, শিগগিরই তিনি একজন তরুন উত্তরসূরি নিয়োগ দিতে লোক খুঁজছেন। ২০০৮ সালে তিনি বিল গেটসকে হটিয়ে নিজে হন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী। ফরবিসের মতে, তখন তার সম্পদের পরিমাণ ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার। তবে ইয়াহু'র মতে তার তখনকার সম্পদের পরিমাণ ৫ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। এর আগে পর পর ১৩ বছর ফরবিস ম্যাগাজিনের হিসাবে বিশ্বের এক নম্বর ধনী ছিলেন বিল গেটস। এর পর ২০০৯ সালে গেটস তার শীর্ষস্থান পুনর্বদ্ধার করেন। দ্বিতীয় স্থানে চলে আসেন ওয়ারেন বাফেট। ২০০৮ থেকে ২০০৯ অর্থবছরে ওয়ারেন বাফেট লোকসান করেছেন ১২০০ কোটি ডলার।

ব্যক্তিগত জীবন ওয়ারেন বাফেট ১৯৫২ সালে বিয়ে করেন সুসান থম্পসনকে। তাদের রয়েছে তিন সন্তান- সুসান বাফেট, হাওয়ার্ড গ্রাহাম বাফেট এবং পিটার বাফেট। ২০০৪ সালের জুলাই মাসে স্ত্রী সুসান মারা যান। এর আগে ১৯৭৭ সাল থেকে তাদের বিচ্ছেদ না ঘটলেও তারা আলাদা বসবাস করতেন। তাদের মেয়ে সুসান ওমাহাতে বসবাস করেন। তিনি সুসান এ. বাফেট ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে সেবামূলক কাজ করেন। ওয়ারেন বাফেট ২০০৬ সালে ৭৬তম জন্মদিনে বিয়ে করেন তার দীর্ঘ দিনের সঙ্গী অ্যাস্ট্রিড মেনগুকে। ২০০৬ সালে ওয়ারেন বাফেটের বার্ষিক বেতন ছিল ১ লাখ ডলার। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে তার বেতন বেড়ে হয় ১ লাখ ৭৫ হাজার ডলার। ওমাহা এলাকার ডান্ডিতে তিনি ৩১ হাজার ৫০০ ডলার দিয়ে বর্তমান বাড়িটি কিনেছিলেন। এর বর্তমান দাম ৭ লাখ ডলার। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার লেগুনা বিচে রয়েছে তার ৪০ লাখ ডলার দামের একটি বাড়ি।

তিনি খুব ভাল তাস খেলতে জানেন। তাস খেলেন শ্যারন ওসবার্গ ও বিল গেটসের সঙ্গে। সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা কাটে তার তাস খেলে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে খবর প্রকাশিত হয় যে, ওয়ারেন কোন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। তাছাড়া তার ডেস্কে নেই কোন কম্পিউটার। তার কোম্পানি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে এখন ৬৩টি কোম্পানির মালিক। এসব

কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অফিসারকে তিনি বছরে মাত্র একটি চিঠি লেখেন। তাতে সারা বছরের কর্মকৌশল বলে দেয়া থাকে। নিয়মিত তাদেরকে নিয়ে তিনি মিটিং করেন না। এজন্য তার পরামর্শ হলো- ঠিক জায়গায় ঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচিত কর্বন। অর্থাৎ ঠিক জায়গায় ঠিক ব্যক্তিকে নিয়োেগ করা হলে তাকে কাজের কথা বলে দিতে হয় না। ওয়ারেন বাফেট তার নির্বাহীদের দু'টি মাত্র নিয়ম বলে দিয়েছেন। তার প্রথমটি হলো- শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ নষ্ট করো না। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো- প্রথম নিয়মকে ভুলে যাবে না। লক্ষ্য স্থির করো এবং সেদিকে লোকেের দৃষ্টি কাড়তে চেষ্টা করো।

তার জীবনধারাকে স্পর্শ করেনি সমাজের উচ্চশ্রেণীর সামাজিকতা। তিনি নিজেই নিজের খাবার তৈরি করেন। কিছু পপকর্ন নিজেই প্রস্তুত করে খান এবং বাসায় বসে টেলিভিশন দেখেন। তার সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বিল গেটসের পরিচয় হয় মাত্র ৫ বছর আগে। তখনও বিল গেটস জানতেন না যে, ওয়ারেনের সঙ্গে তার অনেকটাই মিল আছে। ফলে মাত্র আধা ঘণ্টা পর তিনি ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করেন। যখন ওয়ারেনের সঙ্গে তার দেখা হয় তা স্থায়ী হয়েছিল দশ ঘণ্টা। এর পর থেকেই তার ভক্ত হয়ে যান বিল গেটস।

যুব সম্প্রদায়ের জন্য ওয়ারেন বাফেটের পরামর্শ হলো- ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক লোন থেকে দূরে থাকুন। নিজের যা আছে তাই বিনিয়োগ করুন। মনে রাখবেন- ক) টাকা মানুষ সৃষ্টি করে না। কিন্তু মানুষ টাকা সৃষ্টি করে। খ) যতটা সম্ভব জীবনধারাকে সহজ-সরল করার চেষ্টা করুন। গ) অন্যরা যা বলে তাই করবেন না। তাদের কথা শুনুন। তারপর আপনার যা ভাল মনে হয় তাই করুন। ঘ) অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে অর্থ খরচ করবেন না। ঙ) জীবন আপনার। সেজন্য আপনার জীবনকে চালাতে অন্যদের কেন সুযোগ দেবেন?

সহায়তা /সুত্র : ইন্টারনেট, মানবজমিন-০৯/১১/০৯

সুযোগ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে - বিজ স্টোন

টুইটারের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিজ স্টোন। তাঁর জন্ম ১৯৭৪ সালের ১০ মার্চ, যুক্তরাষ্ট্রে। ১৪ মে, ২০১১ সালে ব্যবসন কলেজের সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মারুফা ইসহাক**

আজকে এখানে আসতে পেরে আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। গ্র্যাজুয়েটদের অনেক অভিনন্দন। তোমরা নিঃসন্দেহে বিশেষ কিছু অর্জন করেছ এবং তোমাদের যাত্রা মোটে শুরু হলো।

যখন আমি ছোট্ট শিশু, তখন আমার মাকে বলেছিলাম, আমি বড় হয়ে ব্যবসনে একজন ব্যবসায়ী হতে যাব। কিছুটা অবিশ্বাস্যভাবেই আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের সঙ্গে। এখানে আসার জন্য আমি আমার একান্ত নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছিলাম। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে সুযোগ, সৃজনশীলতা, ব্যর্থতা ও সহানুভূতি সম্পর্কে চারটা গল্প বলব। এ গল্পগুলোর অন্তর্গত বোধ আমার ব্যবসা, আনন্দ এবং সাফল্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে রঙিন করে তুলেছে।

সুযোগ: প্রথম গল্পের বিষয় আমার বয়স যখন ছয় থেকে দশ, তখন মা আমাকে বয় রেঞ্জার নামে একটা কর্মসূচিতে দিল। এটা বয়স্কাউটের পূর্ববর্তী পর্যায়। স্থানীয় মার্কিন

আদিবাসীরা আমাদের আদর্শ ছিল। সেখানে আমরা এক ধরনের পুঁতি ও পালক দিয়ে মাথার মুকুট তৈরি করতাম। দড়িতে গিঁট দেওয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক কৌশলও আমরা শিখেছিলাম। এসব করে আমার সময়ই হতো না সমবয়সীদের সঙ্গে বেসবল, ফুটবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলায় অংশ নেওয়ার। হাইস্কুলে উঠে আমি আমাদের ক্রীড়া দলে যোগ দিতে চাইলাম। কিন্তু বাস্কেটবল কোর্টের সব লাইন দেখে অবিশ্বাস্য রকমের আতঙ্কিত হতাম। খেলার নিয়মকানুনও বেশ কঠিন লাগত, যদিও সবার কাছে সেসব ছিল খুবই সহজ। আমার এই আতঙ্কের কারণে আমি কোনো দলেই সুযোগ পেলাম না। সে সময় আমি নিজেই এক ধরনের গবেষণা শুরু করলাম। দেখলাম, 'ল্যাক্রোস' নামের খেলাটা আমাদের স্কুলে খেলা হয় না। যদি কেউই খেলতে না জানে, তবে আমার মতো সবারই অসহায় অবস্থা হবে। তাই স্কুল প্রশাসনের কাছে গিয়ে বললাম, যদি কোচ ও শিক্ষার্থী জোগাড় করতে পারি, তবে কি আমি ল্যাক্রোস টিম শুরু করতে পারি? তারা রাজি হলো। ল্যাক্রোস টিম যাত্রা শুরু করল। যখন আমার আতঙ্ক কেটে গেল, তখন দেখা গেল এই খেলায় আমি খুবই ভালো করছি এবং একসময় আমি দলের অধিনায়ক হয়ে গ েছি।

এ অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে কী করে সুযোগ তৈরি করে নেওয়া যায়। কোনো কাজ করার জন্য যে সঠিক পরিস্থিতির দরকার, তার জন্য অপেক্ষা না করে তুমি নিজেই সেই পরিস্থিতি তৈরি করে নিতে পারো।

সৃজনশীলতার গল্প

হাইস্কুল শেষে কলেজে আমি শিল্পকলা বিষয়ে পড়তে লাগলাম। পাশাপাশি বেকন হিলের এক প্রকাশনা সংস্থায় একটা চাকরিও পেয়ে গেলাম। একদিন যখন পুরো আর্ট ডিপার্টমেন্ট দুপুরের খাবার খেতে বাইরে গেছে, তখন কম্পিউটারে আমি একটা বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন করে ফেললাম। অন্য প্রচ্ছদগুলোর সঙ্গে সেটাও অনুমোদন করার জন্য রেখে দিলাম। শিল্প পরিচালক নিউইয়র্ক থেকে ফিরলেন। প্রচ্ছদগুলো দেখার সময় আমারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে করেছে? আমি জানালাম যে এটা আমার করা। তিনি ভীষণ অবাক হলেন। শুধু যে আমার প্রচ্ছদটাই নির্বাচিত হলো তা না, আমাকে বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনার চাকরির প্রস্তাব করা হলো। একজন বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারার দারুণ সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাই আমি একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিলাম–কলেজ ছেড়ে কাজ শেখার এই দুর্লভ সুযোগকে কাজে লাগালাম। এভাবেই আমার গ্রাফিক ডিজাইন শেখা শুরু। এ শেখাটাই আমাকে নতুন ধরনের চিন্তার জগতে নিয়ে এল।

কখনো ভেবো না, তোমার মধ্যে সৃষ্টিশীলতা নেই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এ সম্পদটা আছে।

আমার তৃতীয় গল্পের বিষয় ব্যর্থতা

১৯৮৭ সালে একটা জার্মান রোমান্টিক ফ্যান্টাসি সিনেমা দেখেছিলাম। নির্দেশক ছিলেন উইম ওয়েনডার্স। এই সিনেমার আমেরিকান ভার্সনটা হলো উইংস অব ডিজায়ার। কাহিনির সময়টা ১৯৮০-র দশক, যখন পশ্চিম বার্লিনে গৃহযুদ্ধ প্রায় শেষ। দুজন দেবদূতকে (ক্যাসেল ও ড্যামিয়েল) রাখা হয়েছে বার্লিন শহরের দিকে খেয়াল রাখার জন্য। মানুষজন ও শহর গড়ে ওঠার আগে থেকেই তারা সেখানে ছিল। তাদের মৃত্যু নেই। সেখানকার জনগণের চিন্তাভাবনা বোঝা, কথা শোনা এসবই ছিল তাদের কাজ। কিন্তু তারা বাস্তবজগতে ছিল অদৃশ্য, কেউ তাদের দেখতে পেত না বা তাদের কথাও শুনতে পেত না।

সবকিছুই তো আর পরিকল্পনামতো চলে না। একসময় ড্যামিয়েল এক প্রতিভাসম্পন্ন, সুদর্শনা সার্কাস আর্টিস্ট ম্যারিওনকে ভালোবেসে ফেলে। তার চিন্তায় বারবার আনাগোনা করতে থাকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অনুভূতি কেমন হতে পারে। একদিন অবিশ্বাস্য একটা কাজ করে ফেলে সে। তার অসীম অমর জীবন ত্যাগ করে একা পৃথিবীতে চলে আসে। বহু ত্যাগ স্বীকারের পর ম্যারিওনকে পায়।

আমার তৃতীয় উপদেশ অনেকটা ড্যামিয়েলের সিদ্ধান্তের মতো। কোনো আকর্ষণীয় সাফল্য অর্জনের জন্য তোমাকে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে আকর্ষণীয় কোনো ব্যর্থতার জন্য। লক্ষ্য অর্জনে মৃত্যুর জন্য হাসিমুখে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বলছি না তোমাদের সত্যিই মরতে হবে। আমার কথার মানে হলো, ব্যর্থতাকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

সহানুভূতি: আমার চতুর্থ গল্প

মানুষকে বুঝতে পারা ও তার অনুভূতিগুলো ভাগ করে নেওয়াই হলো সহানুভূতি। আমাদের প্রায় সবার মধ্যেই এই গুণটা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে তা আমরা অনেকেই জানি না। ১০ বছর ধরে আমি বড় পরিসরে সামাজিক যোগাযোগ প্রসারের পরিকল্পনা করছি। যেমনটা হচ্ছে এখনকার সময়ে টুইটার।

নিজে বিত্তশালী হওয়ার পরে অন্যকে সাহায্য করতে হবে–এমনটা ভাবা ঠিক নয়। ডোনার চুজ সংস্থার মাধ্যমে আমি ও আমার স্ত্রী বেশ অনেক বছর ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে আসছি। এর মূল্য যদিও অনেক কম, তবে প্রতিদান অনেক বেশি। আমরা ছোট্ট শিশুদের হাতে লেখা ধন্যবাদসূচক প্রচুর চিঠি পাই। এগুলো সত্যিই অনেক মূল্যবান। পৃথিবীতে সবাই আমরা একসঙ্গে থাকি, একজন অন্যজনের ওপর নির্ভর করি। যখন আমরা একে অপরকে সাহায্য করি, পরোক্ষভাবে নিজেদেরই সাহায্য করা হয়। তাই আমার সর্বশেষ উপদেশ হলো, তুমি যত তাড়াতাড়ি অন্যদ‌ের প্রতি তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া শুরু করবে, তুমি তোমার জীবনে তত বেশি এর প্রতিদান পাবে।

সবশেষে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি, তোমরা নিজেরা নিজেদের সুযোগ তৈরি করো, তোমাদের ভেতরকার অসীম সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলো, ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করো এবং সহানুভূতিশীল হও। নিজেকে জ্ঞান ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে গড়ে তোলো। এতে তুমি শুধু পৃথিবীকেই বদলাবে না, তুমি নিজেও আনন্দ পাবে এবং থাকবে প্রশান্তিতে। আমি তোমাদের জন্য গর্বিত। ধন্যবাদ।

লক্ষ্য ঠিক করে এগিয়ে যাও - মাইকেল ফেল্পস
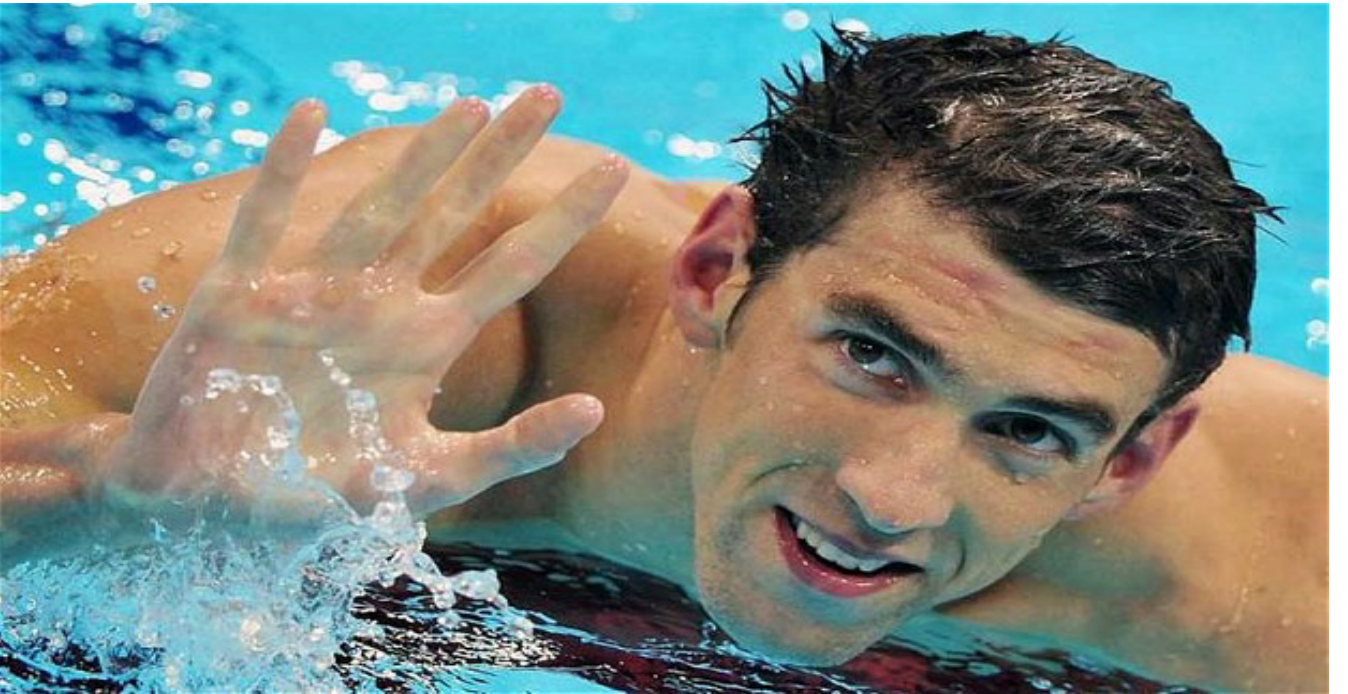
সাঁতারের বিস্ময় মাইকেল ফেল্পস ১৮টি স্বর্ণপদকসহ ২২টি অলিম্পিক পদক জয় করে সর্বকালের রেকর্ড গড়েছেন। এথেন্স অলিম্পিকে ছয়টি, বেইজিং অলিম্পিকে আটটি, আর এবারের লন্ডন অলিম্পিকে জিতেছেন চারটি স্বর্ণপদক। মাইকেল ফ্রেড ফেল্পেসর জন্ম ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০৮ সালে প্রকাশিত ফেল্পেসর আত্মজীবনী নো লিমিটস: দ্য উইল টু সাকসিড এবং সিএনএনের সাক্ষাৎকার অবলম্বনে। **ভাষান্তর জাহিদ হোসাইন**

ছোটবেলা থেকে কোনো কিছুকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মনেপ্রাণে ধারণ করলে তা একদিন বাস্তব হবেই। আমার বড় দুই বোনের কারণে অনেক ছোটবেলায় আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আমার মা আমাদের পুলে ফেলে দিতেন। সেটা সাঁতারু হওয়ার জন্য ছিল না, ছিল জীবনের নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তার জন্যে শেখা সাঁতারকে অজান্তেই পছন্দ করে ফেলি একসময়। মা আর বোনদের উৎসাহেই আমি মাত্র সাত বছর বয়সে সাঁতারু জীবন শুরু করি। আমার বয়স যখন ১১ বছর, তখন আমার কোচ বব বাউম্যান আমাকে বলেন, পরিশ্রম করলেই আমি অলিম্পিক গেমসে সাঁতারে অংশ নিতে পারব। কোচের কথামতো প্রশিক্ষণ আর পরিশ্রম করা শুরু করি।

২০০০ সালে সিডনি অলিম্পিকে আমি সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে মার্কিন সাঁতারু দলে যোগ দিই। কিন্তু সেবার আমি প্রচণ্ড হতাশ হই। কারন আমি আমার প্রথম অলিম্পিকের ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে পঞ্চম স্থান অধিকার করি। হতাশার পরে আমি আমার লক্ষ্য নতুন করে তৈরি করি। আমি অলিম্পিকের সাঁতারের আট ইভেন্টেই স্বর্ণ জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আগের থেকে বেশি পরিশ্রম আর সাঁতারে মনোযোগ দিতে থাকি। অলিম্পিকে সাঁতারের সবগুলো স্বর্ণ অর্জন হয়ে ওঠে আমার নতুন লক্ষ্য। যার ফলে ২০০১ সালে ১৫ বছর বয়সে ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে এক মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের কম সময়ে (১:৫৪.৯২ সে) অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করি। প্রচণ্ড আগ্রহে আমি পুলে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকি।

২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে আমি ছয়টি স্বর্ণপদকও লাভ করে ফেলি। কিন্তু তার পরও আমি ভীষণ হতাশ হই। কারণ সাঁতারের ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ও চারজনের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলে সাঁতারের হিট রাউন্ডেই ফলাফল খারাপ করি। ফ্রি-স্টাইলের বাছাইপর্বে আমি পঞ্চম হয়ে ফাইনালে অংশ নিই। আবার চারজনের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলেতে তৃতীয় দল হিসেবে পরবর্তী রাউন্ডে অংশ নিই। ব্যর্থতার কারণে আমি কোচের কাছে

হতাশা প্রকাশ করি। পরের দুটি ইভেন্টে অংশ নিতে অনিচ্ছা জানাই। কোচের নির্দেশ আর উৎসাহে আমি অংশ নিতে রাজি হই। হতাশার মধ্যে আমি আরও দুটি ব্রোঞ্জপদক দিয়েই সেবারের অলিম্পিক শেষ করি।

এ রকম দুঃসময় আমার জীবনে অনেকবারই এসেছে। আমার সাঁতার ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেছে। তখন আমার মা আমাকে প্রায়ই একটা কথা জিজ্ঞেস করেন, 'আমি আমার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কি না?' আমি চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারি, এটা আমার জন্য সেরা সিদ্ধান্ত হবে না। আমি ফের আমার লক্ষ্যের দিকে তাকাই, আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি হাল ছেড়ে দেব না, আমি আমার লক্ষ্য পূরণ করবই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার কিছু হারানোর নেই, নিঃশেষ হলে হয়ে যাবে। এই ইচ্ছাতেই আবার পানিতে নামি। আমি হাল ছেড়ে না দিয়ে হতাশা কাটানোর জন্য পুলে সময় কাটাতে থাকি।

আমি সব সময়ই আমার সেরা সময় আর দুঃসময়ের কথা চিন্তা করি। আমি যেকোনো সময়ই সাঁতারে অযোগ্য হতে পারি, কখনো আমার গগলসে পানি ঢুকে যেতে পারে, গগলস হারিয়েও যেতে পারে। এই চিন্তা আমাকে বেশ সাহায্য করে। আমি হারতে পছন্দ করি না। তার পরও যদি আমি হেরে যাই, তখন নিজেকে প্রশ্ন করি, 'আমি কী করলে এই ব্যর্থতা আর হবে না?' এটা আমাকে বুঝতে সাহায্য করে চোখের পলকেই যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।

আমি বুঝতে পারি কল্পনার যেকোনো কিছুই বাস্তবে ঘটতে পারে। একবার সাঁতারের সময় আমার কবজি ভেঙে যায়। তার পরও আমি পানিতে নামি। আমি প্রথম কয়েক দিন খুবই হতাশ ছিলাম। তখন আমি অনেক সময় পেয়েছিলাম চিন্তাভাবনা করার। আমি বুঝতে পারলাম যারা বলে আমি কিছু করতে পারব না, তাদের কথাবার্তায় আমার পথকে আরও কঠিন করে দেয়। আমি তাদের কথা পাত্তা না দিয়েই পানিতে নেমে পড়ি। সেবারই আমি প্রথম শিখতে পারি 'কখনো হাল না ছাড়া'।

জীবনে কোনো অর্জনই সহজে আসে না। প্রাপ্তি নির্ভর করে কীভাবে তুমি বাধাবিপত্তি সামলাবে। বাধাগুলো এক এক করে দূর করলেই তুমি হয়ে উঠবে শক্তিশালী মানুষ। কিন্তু ব্যর্থ হলে কী হবে? ব্যর্থতাগুলো যখন পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে, তখন কোনো একসময় তুমি সফলতা লাভ করবেই। আমার স্কুলের সাঁতারের শিক্ষক বলতেন, 'কোনো কিছুতেই শেষ সীমানা তৈরি করা যাবে না। যত বেশি স্বপ্ন দেখবে তত বেশি সামনে যাবে।' সেই স্বপ্ন

দেখার ফল আসে আমার হাতে, যখন আমি পরের বেইজিং অলিম্পিকে রেকর্ড আটটি স্বর্ণপদক লাভ করি।

আমি সব সময়ই চেষ্টা করি আগের মাইকেল ফেলপ্সকে অতিক্রম করে যেতে। আমার জীবনের আদর্শ মাইকেল জর্ডান। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই দেখা হয়নি, তার পরও তিনি আমার আদর্শ। তিনি জানেন, কীভাবে বাস্কেটবল কোর্টের ভেতরে ও বাইরে খেলতে হয়। বাস্কেটবল কোর্টে তিনি শুধুই খেলতেন, অন্যদিকে মনোযোগ ছিল না তাঁর। এটাই আমার আদর্শ—আমি যখন যা করব তাতে থাকবে সম্পূর্ণ মনোযোগ।

আমি সব সময় অন্যদের কথা চিন্তা করে শিহরিত হই। অলিম্পিক ভিলেজে আমি এক ছাদের তলায় মার্কিন বাস্কেটবল দল, টেনিসের রাফায়েল নাদাল-রজার ফেদেরারকে দেখতে পাই। আমি বড়মাপের এই খেলোয়াড়দের দেখে রোমাঞ্চিত হই। আমি যখনই হতাশ হয়ে পড়ি তখনই তাদের দেখে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। এই বড়ম‌ােপের মানুষদের দেখার জন্য আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই খেলার চ্যানেলে চোখ রাখি। আগের রাতে তারা কী করছে তা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকি।

আমি সাঁতারের জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও ফোন পেয়ে থাকি। আমাকে সবাই উৎসাহ দেয়। আমি সেই উৎসাহকে আমার জন্য বিশাল কিছু মনে করি। মনে হয় তাদের জন্য হলেও আমাকে পানিতে সাঁতরাতে হবে!
আমার লকারে একটা ছবি রাখা ছিল। ছবিটা ছিল ইয়ান ক্রকারের, যে আমাকে ২০০৫ সালের এক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেয়। আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম যখন অস্ট্রেলীয় সাঁতারু ইয়ান থর্প বলেছিল আটটি স্বর্ণপদক জেতা কারও পক্ষে কখনোই সম্ভব না। আমি আমার প্রস্তুতির সময় সেই ছবিটা আর থর্প‌েের সাক্ষাৎকার ছাপানো সংবাদপত্রের কাটা অংশটা প্রতিদিন দেখতাম। এই দুটি জিনিস আমাকে আরও পরিশ্রমী করে তোলে। আমাকে কেউ সমালোচনা না করে সন্দেহ করলে আমি বেশ রেগে যাই, যা আমাকে আরও জেদি করে তোলে। আমি সব সময়ই আমার নিজের জন্য উৎস‌াহ খুঁজে বেড়াই। আমি হতাশার মাঝেও উৎসাহ খুঁজে বেড়াই, যা আমাকে আবার জেগে উঠতে সাহায্য করে। ইয়ান থর্প আমার প্রতিযোগী হলেও আমি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। যদিও তার জন্যই ২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে হতাশা তৈরি হয়েছিল। তাকে প্রতিযোগী হিসেবে অবহেলার কিছু নেই, তার কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। তার কারণেই বিশ্ব সাঁতার অনেক ওপরে উঠে এসেছে।

যে কাজই করুন না কেন, আপনাকে অবশ্যই নীতির সঙ্গে কাজে মনোযোগ দিতে হবে। শক্তিশালী মন তৈরি করতে হবে প্রেরণা গ্রহণের জন্য। এই শক্তিশালী মনই আপনার মাঝে অনেক কিছু নিয়ে আসে, আপনি নিজেই নিজেকে নতুন করে চিনবেন। আমি সব সময়ই এমনই কিছু করার চেষ্টা করি যা কেউ আগে করেনি, আমি সাঁতারের ধারণা বদলে দিতে চেয়েছি মাত্র।

নিজের ওপর আস্থা রেখে এগিয়ে যাও - নিল আর্মস্ট্রং

১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই প্রথম মানুষ হিসেবে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করে মার্কিন নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং। তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালের ৫ আগস্ট। সম্প্রতি (২৫ আগস্ট ২০১২) তিনি ৮২ বছরে মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৫ সালের ১৩ মে সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এই ভাষণটি দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর: জাহিদ হোসাইন**

সবাইকে স্বাগতম। অভিনন্দন নতুন গ্র্যাজুয়েটদের।

জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হাইনরিশ শ্লাইমান মনে করতেন হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড-এর সূত্র ধরে প্রাচীন ট্রয় নগরের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রচলিত ধারণার বাইরে ছিল তাঁর এই বিশ্বাস।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ট্রয় নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করেন। ধ্বংসাবশেষে শুধু ট্রয় নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, আরও নয়টি নগর সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। একটি সভ্যতা যখন ধ্বংস হয়, তখন তার ওপর নির্মাণ করা হয় আরেকটি সমাজ-সভ্যতা। পূর্বতন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো নতুন সভ্যতা। ট্রয় নগরের দশম সভ্যতার মানুষের কয়েকজন নতুন আরেকটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বেছে নেয় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই উপকূলকে। নতুন প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজের মূল লক্ষ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছানো। অনুসন্ধানের নতুন এক সুযোগ সৃষ্টি করা।

আজকে আমরা একত্র হয়ে সেই মহাসাগরের উপকূলে দাঁড়িয়ে ট্রয়বাসীকে সম্মান জানাচ্ছি। তাদের সৃষ্টি করা অনুসন্ধানকেই আঁকড়ে ধরে তোমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে যাচ্ছ। তোমরা হতে যাচ্ছ গ্র্যাজুয়েট।

যারা গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছ, তাদের জন্য আজ বিশেষ একটি দিন। শুধু তাদের জন্যই না– তাদের পিতামাতা, শিক্ষকদের জন্যও আজ স্মরণীয় দিন। কয়েক বছর আগে আমি একজন বক্তার কাছে শুনেছিলাম, ‘আমরা যা বলি এই পৃথিবীর কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই; কেউ মনে রাখবে না সে কথা।’ সত্যি বলতে কি সেই বক্তা ভুল বলেছিলেন। আমরা যা বলি তার গুরুত্ব অবশ্যই আছে এবং তা পৃথিবীতে অনেক দিন টিকে থাকে। আমাদের চলে যাওয়ার পরও। তারপরও আমি সেই বক্তার ভুল কথাটি আজ তোমাদের বলতে চাই। আজকে আমি যা বলব, তা তোমাদের অনেক দিন ধরে মনে রাখার কোনো দরকার নেই। তোমরা আজকের দিনটা শুধু তোমাদের আনন্দের দিন হিসেবে মনে রেখো। শুধুই আনন্দের দিন, প্রত্যাশার একটি দিন।

নতুন গ্র্যাজুয়েটদের কিছু বলতে চাই। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আজকের দিন বিশেষ একটি দিন। আজকের দিনটির জন্য তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছ, অনেক সময় দিয়েছ। তোমরা এখন একটি শিক্ষা সনদের গর্বিত বাহক। এই সনদ সুনিশ্চিত করবে তোমার শিক্ষার মাপকাঠি। তোমরা এখানে শিখেছ জীবনের বাস্তবতা ও নানা মুনির নানা মতের গুরুত্ব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তোমরা এখন বাস্তবতা ও ভিন্ন মতের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছ। এ জন্যই হয়তো তোমাদের সংবাদপত্রগুলোর বিশেষজ্ঞ আলোচনায় দেখা যাবে।

তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে, সবাই তোমরা যেকোনো ক্ষেত্রে সরলতার গুরুত্ব

অনুধাবন করতে পারবে। বলতে অনেকটা সহজ হলেও বাস্তবে কোনো বিষয়ের ভেতরে সরলতাকে খুঁজে বের করা কিন্তু অনেক কষ্টকর। আমি প্রত্যাশা করব, তোমরা যৌক্তিকভাবে যেকোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। অন্য কোনো কিছু যেন তোমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে না পারে। সুনির্দিষ্ট করে বলা চলে, তোমার নিজের চিন্তাশক্তিকে আলিঙ্গন করে নাও। রবার্ট ফ্রস্টের বিখ্যাত একটি উক্তি আছে চিন্তাশক্তি নিয়ে। তিনি বলতেন, 'কোনো কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা সে বিষয়ে একমত বা দ্বিমত পোষণ করা বোঝায় না, চিন্তাভাবনা হচ্ছে ওই ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তি-ইচ্ছার অভিব্যক্তি।' চিন্তাভাবনা এবং শেখার ইচ্ছার কারণেই আজকে তোমাদের জীবনে এই দিনকে তোমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

তোমাদের অনেকে অন্য কোনো ভিন্ন জায়গা থেকে এই জায়গায় পড়াশোনা করতে এসেছ। তোমরা আমাদের গর্বিত করেছ। আমাদের দেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তোমরা আমাদের সম্মানিত করেছ। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, তোমাদের সময় ও শ্রমের যে বিনিয়োগ করেছ, এখানে তা অবশ্যই কাজে লাগবে এবং এই বন্ধুত্ব অনেক দিন ধরে টিকে থাকবে।

১৯৪০-এর দশকে আমাদের শিক্ষার্থীদের ছিল না কোনো ক্যালকুলেটর, মুঠোফোন, ক্রেডিট কার্ড, কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেট। তারপরও আমাদের প্রজন্মকে অনেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করত। আমার কলেজ গ্র্যাজুয়েশনের সময় দূরপাল্লার বিমানগুলোতে প্রোপেলার ব্যবহার করা হতো। সামরিক বাহিনীতে কিছুসংখ্যক জেট ইঞ্জিনের বিমান ছিল, রকেটের ইঞ্জিন ছিল সেকেলে প্রাথমিক যুগের। সেই সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক যদি নভোযান পরিচালনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের পরামর্শ দিতেন, সবাই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত। সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নভোযানের যাত্রা দেখা যেত প্রতি সন্ধ্যায় 'দি ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অব ডিজনি' টেলিভিশন অনুষ্ঠানে। কিন্তু হঠাৎ করে মানুষ বদলে ফেলে তার সমাজকে। নির্মাণ করে নতুন ইতিহাস, নতুন যুগের। তিন বছরের মধ্যে সোভিয়েত প্রকৌশলীরা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করেন। শুরু হয় নতুন নভোযুগের। এক দশকের মধ্যেই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের নভোযান প্রেরণ করা হয় পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহগুলোতে। শুরু হয় মানুষের মহাশূন্যে যাতায়াতের নতুন যুগ। চাঁদে ও পৃথিবীর কাছের গ্রহ মঙ্গলে মানুষের পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার অলীক স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবে দেখা মিলতে শুরু করে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের অগ্রগতিই তোমাদের মধ্যে এনে দিয়েছে নতুন সুযোগ, কাজ করার নতুন ক্ষেত্র। তৈরি করেছে নতুন সম্ভাবনার। আশা করা যায়, তোমরা যা শিখেছ তা কর্মক্ষেত্রে কাজে

লাগাতে পারবে। ভবিষ্যতে তোমরা কখনোই নিজেকে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করবে না। জ্ঞান অর্জন করা যায় সমগ্র জীবন ধরে। তোমাদের সেই শুরুটা আমাদের থেকেও অনেক ভালো। ট্রয়বাসীর মতোই তোমরা নিজেদের উন্নত করতে থাকবে। একেকজন হয়ে উঠবে একজন ট্রয়-যোদ্ধা। প্রচলিত রীতি অনুসারে আমাকে বক্তা হিসেবে তোমাদের কিছু উপদেশ দিতে হচ্ছে। উপদেশ দিতে হলে অনেক আত্মবিশ্বাস থাকতে হয়। অস্বস্তির পরেও আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। আমি মনে করি, উপদেশ থেকেও আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসই তোমাদের মনোযোগ আর্কষণ করবে। আমি শুধু তোমাদের একটি বিশ্বাসের কথা বলতে চাই। মাঝেমধ্যে অনেক কিছু তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার জন্য তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে পারে। তোমার অর্থ-সম্পত্তি কোনো না কোনোভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে। তোমার কাছ থেকে শ‌ুধু একটা জিনিসই তোমার অনিচ্ছায় হারিয়ে যেতে পারবে না, সেটা হলো তোমার নীতিবোধ, তোমার আদর্শ। এটাই তোমার দখলে যেসব জিনিস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি তোমার ভেতরের নীতিবোধগুলোকে পরিচর্যা করতে থাকো, সতর্কতার সঙ্গে নির্মাণ করতে পারো তোমার ব্যক্তি-আদর্শ, তা হলেই তুমি ট্রয়বাসীর মতোই সফল। এই নীতিবোধ, আদর্শই তোমাকে পরিচালনা করবে, তোমার সমাজকে পরিচালিত করবে। সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মানব চরিত্রের নীতিবোধ, আদর্শের ওপর। ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কী নিয়ে আসবে? সেটা আমি জানি না, কিন্তু যা আনবে তা নিশ্চয়ই রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক। ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য নিজের জ্ঞান-মেধাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাও, তাকে নিয়ে কোনো ধরনের পূর্বধারণার দরকার নেই। ট্রয়বাসীকে ছাপিয়ে তোমার পরিশ্রমের ওপরই নির্মাণ করা হবে আগামীর সমাজ, দেশ, নতুন সভ্যতা। সবাইকে ধন্যবাদ, সবার জন্য শুভ কামনা।

নিজের সিদ্ধান্তই নিজের পরিচয়: জেফ বিজোস

মার্কিন উদ্যোক্তা জেফ বিজোস amazon.com.inc-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। অনলাইনভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বই ও অন্যান্য পণ্যের বিশাল এক বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ২০১০ সালের ৩০ মে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: মারুফা ইসহাক

ছোটবেলায় গ্রীষ্মের ছুটি কাটত টেক্সাসে আমার দাদাবাড়িতে। সেখানে পশুর খামারে ঘুরে বেড়াতাম আমি। বিভিন্ন কাজে সাহায্যও করতাম। যেমন—বায়ুকল ঠিক করা, গবাদিপশুদের টিকা দেওয়া ইত্যাদি। প্রত্যেক বিকেলে যেতাম যাত্রা দেখতে, বিশেষ করে ডেইজ অব আওয়ার লাইফস। আমার দাদা-দাদি ক্যারাভান ক্লাবের সদস্য ছিলেন, যাঁরা ঘুরে বেড়াতেন আমেরিকা ও কানাডার নানা জায়গা। প্রায় প্রত্যেক গ্রীষ্মে আমরা সেখানে যোগ দিতাম। এমনি করে ঘুরে বেড়াতে আমি খুবই মজা পেতাম। একবার এ রকম এক ভ্রমণে আমি খেয়াল করলাম পুরো সময়টাতে আমার দাদি সিগারেট টেনে চলেছেন, সিগারেটের সেই গন্ধ আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। অল্প বয়স থেকেই আমি টুকটাক অঙ্ক কষতাম আর বিভিন্ন বিষয়ে অনুমান করার চেষ্টা করতাম। ধূমপান নিয়ে একটা প্রচারণা শুনেছিলাম আমি। মূলত সেখানে বলা হয়েছিল, সিগারেটের প্রতিটি টান জীবন থেকে দুই মিনিট করে সময় নিয়ে নেয়। যে হারেই হোক না কেন, ভাবলাম দাদিকে নিয়ে হিসাবটা করি। প্রতিদিন ধূমপানের জন্য তাঁর সিগারেটের সংখ্যা, প্রতিটি সিগারেটে টান দেওয়ার সংখ্যা ইত্যাদি অনুমান করে

দাদিকে বললাম, 'প্রতি টানে দুই মিনিট করে তোমার জীবনের নয় বছর তুমি হারিয়ে ফেলছ।'

স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি, এরপর কী হয়েছিল। পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গেল। ভেবেছিলাম, আমার বুদ্ধি ও গাণিতিক যুক্তির জন্য প্রশংসিত হব। কিন্তু তেমনটা হলো না। আমার দাদি খুব করে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি বুঝতেই পারছিলাম না কী করব। দাদা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হাইওয়েতে গাড়ি সাইড করে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে নামতে বললেন। আমি কি কোনো বিপদে পড়লাম? দাদা বেশ জ্ঞানী ও চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ। কখনোই তিনি আমার সঙ্গে কঠিন করে কথা বলেননি। কিন্তু যদি এবারে বলেন? যদি বলেন গাড়িতে ফিরে দাদির কাছে ক্ষমা চাইতে? এমনি নানা চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। দাদা আমার দিকে তাকালেন, কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'জেফ, একদিন তুমি বুঝতে পারবে যে বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে স্নেহশীল হওয়াটা কঠিন।'

আজকে আমি তোমাদের সহজাত গুণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই দুয়ের মধ্যে কী পার্থক্য তা নিয়ে বলতে চাই। বুদ্ধিমত্তা হলো একটা সহজাত গুণ, অপরদিকে স্নেহশীল হওয়া হচ্ছে এক ধরনের সিদ্ধান্ত। আর এই সিদ্ধান্তের কাজটিই কিছুটা কঠিন। তুমি যদি সচেতন না হও, তবে তুমি তোমার সহজাত গুণ থ্াকা সত্ত্বেও ভুল পথে পা দিতে পারো; যেটা তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে।

আমি নিশ্চিত তোমরা যারা এখানে আছো তারা বহু গুণসম্পন্ন, তোমাদের রয়েছে দারুণ বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্ক। তা না হলে এ পর্যন্ত তোমরা আসতে পারতে না।

আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে আমি 'আমাজন' তৈরির পরিকল্পনা করেছিলাম। আমি জেনেছিলাম যে ওয়েবের ব্যবহার প্রত্যেক বছরে শতকরা দুই ২,৩০০ হারে বাড়ছে। এর মতো এত দ্রুত হারে কোনো কিছুর ব্যবহার বাড়তে আমি কখনোই দেখিনি বা শুনিনি। অনলাইন বুকস্টোর তৈরি করার চিন্তা আমার জন্য দারুণ রোমাঞ্চকর ছিল। কারণ, সে সময়ে এ ধরনের কিছু ছিল না। তখন আমার বয়স ৩০। মোটে এক বছর হয়েছে বিয়ে করেছি। আমার সহধর্মিণী ম্যাককেঞ্জিকে বললাম যে আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাচ্ছি আর নতুন একটা কাজে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছি, যার ভবিষ্যৎ আমার জানা নেই। ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে উদ্ভাবন করার মানসিকতা ছিল। আমি সব সময়ই উদ্ভাবক হতে চেয়েছি। ম্যাককেঞ্জির কাছ থেকে আমি উৎসাহ ও সমর্থন পেলাম। আমি আমার আগ্রহের দিকে

এগিয়ে যাই, সেটাই সে চেয়েছিল।

নিউইয়র্ক সিটিতে আমি একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলাম। আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শ্রদ্ধা করার মতোই বুদ্ধিমান ছিলেন। একদিন তাঁকে বললাম যে ইন্টারনেটে আমি বই বিক্রির একটা কোম্পানি শুরু করতে চাই। সেন্ট্রাল পার্কে বেশ অনেকক্ষণ আমরা হাঁটলাম। আমার সব কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর বললেন, এটা নিঃসন্দেহে খুব দারুণ একটা চিন্তা। তবে যার কোনো ভালো চাকরি নেই তার জন্যই এই চিন্তাটা অনেক বেশি ভালো। তাঁর যুক্তি আমাকে কিছুটা ভাবনার জগতে ঠেলে দিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও দুই দিন আমাকে ভেবে দেখতে বললেন।

সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বেশ কঠিন ছিল আমার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হলাম। আমার মনে হলো, চেষ্টা করা ও ব্যর্থতা বরণ করা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই বা হবে না। কম নিরাপদ পথটাকেই আমি বেছে নিলাম, যে পথে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। আমার সেই সিদ্ধান্তের জন্য আমি গর্বিত। আগামীকাল থেকে তোমাদের নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হবে, যে জীবনের রচয়িতা তুমি নিজে।

তোমার বয়স যখন ৮০ বছরের মতো হবে, একটা নীরব মুহূর্তে তুমি তোমার জীবনের প্রতিচ্ছবি তোমার সামনে দেখবে। তোমার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোকেই সবচেয়ে অর্থপূর্ণ মনে হবে। আমরা হচ্ছি আমাদের সিদ্ধান্তেরই প্রতিফলন। নিজেই নিজের মহৎ গল্প তৈরি করো। তোমাদের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ।

কখনো হাল ছেড়ো না - ফেলিপে কালদেরন

ফেলিপে কালদেরন মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি। ১৯৬২ সালের ১৮ আগস্ট তাঁর জন্ম। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মারুফা ইসহাক**

সর্বপ্রথম তোমাদের অভিনন্দন। আমি জানি, তোমরা তোমাদের অর্জনের জন্য অনেক আনন্দিত ও গর্বিত।

আজকের এই সমাবর্তন কোনো কিছুর শেষ নয়, বরং আজকের দিনটা হচ্ছে তোমাদের জীবনে একটা নতুন যাত্রা শুরুর দিন। একদিন তোমাদের মধ্যকার অনেকেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী, আইনজীবী, লেখক, চিকিৎসক অথবা প্রকৌশলী হবে। তা যা-ই হও না কেন, একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হোক তোমার জীবনের ব্রত। নিজের দেশের একজন ভালো নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীর একজন যোগ্য মানুষও তোমাকে হতে হবে। আজকে তোমরা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছো সবচেয়ে আধুনিক জ্ঞান নিয়ে। নিঃসন্দেহে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা সম্মানের এবং একই সঙ্গে দায়িত্বের।

তোমাদের সুযোগ আছে অন্যদের জন্য কিছু করার। তোমরাই পারবে তোমাদের মেধা ও সাহস দিয়ে পৃথিবীকে সঠিক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিতে–যদিও অনেকের কাছেই তা অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধীর সেই কথাটা মনে করো। নিজেকে জিজ্ঞেস করো, যে পরিবর্তন তুমি দেখতে চাও, তা নিজেকে দিয়েই কি শুরু করতে চাও?

তোমাদের আমি আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম, মেক্সিকোতে তখনো স্বৈরাচারী শাসন ছিল। প্রতিটি প্রদেশের গভর্নর এবং সিনেটররা ছিলেন একই দলের সদস্য। বহু বছর ধরে সেই দলই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। যেমন–গণমাধ্যম কী বলবে, স্কুল কী শিক্ষা দেবে, কোন ধরনের রক কনসার্ট করা যাবে ইত্যাদি। একসময় তোমাদের মতো শিক্ষার্থীরাই এর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করল। রাষ্ট্রজুড়ে তখনো আশার আলো ছিল এবং গণতন্ত্রের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিল। আমার বাবা সরাসরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খুব কঠিন সময় ছিল সেটা। আমার ভাইবোন ও আমি বাবার সঙ্গে ছিলাম। দরজায় ধাক্কা দিতে, চিৎকার করে স্লোগান দিতে খুব ভালো লাগত আমার।

ধীরে ধীরে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নির্বাচনী জালিয়াতিও শুরু হলো। ক্ষমতার হতাশাজনক অপব্যবহার দেখে একদিন বাবাকে বললাম যে আমাদের সব চেষ্টা বৃথা। একদিকে সরকার ভোট চুরি করছে, অন্যদিকে দেশের মানুষও এসব নিয়ে ভাবছে না। তখন তিনি বললেন, ‘আমি তোমার আক্ষেপের কারণ বুঝতে পারছি। আমরা যা করেছি, তা দেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব। হয়তো আমাদের দল থেকে আমরা কোনো প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর পাব না। কিন্তু মেক্সিকোকে শান্তিপূর্ণভাবে বদলানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, এখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলানো। আমরা না করলে আর কেউ সেটা করবে না। গণতন্ত্র খুব ভালো করে আসার আগেই আমার বাবা মারা যান এবং এর কয়েক বছর পর সব ধরনের বিপত্তি কাটিয়ে আমি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হই।

তোমরা কখনোই তোমাদের স্বপ্ন ও চিন্তার জগৎ থেকে সরে এসো না। বিশ্বাস করে লড়ে যাও। তোমার প্রচেষ্টার মধ্যে কখনো সংশয় রেখো না। কারণ, মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার ধ্বংস করার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলো। তোমার নীতিতে অটল থেকো। পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আজকের পৃথিবী। যেমন–জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, বেকারত্ব ইত্যাদি।

প্রায় ৪০ বছর আগে ক্লাব অব রোমের বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা মানবতার ধারা নিয়ে গবেষণা করে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, তা হলো 'ম্যানকাইন্ড অ্যাট দ্য টার্নিং পয়েন্ট'। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমান সময়ে দুই ধরনের শূন্যতা চোখে পড়ে। একটা হলো মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে এবং অপরটা হলো ধনী-গরিবের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক। দিন দিন দরিদ্রতা বেড়ে চলেছে। ১০০ কোটির বেশি মানুষ এখন এক ডলারের চেয়ে কম উপার্জনে বেঁচে রয়েছে। অন্যদিকে, কার্বন নিঃসরণের কারণে গত শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বেড়ে গেছে। সঠিক উদ্যোগের অভাব হলে এই শতাব্দীর শেষে তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব রয়েছে। অর্থনীতির উন্নয়ন নাকি পরিবেশ রক্ষা—কোনটাকে বেছে নেওয়া হবে, সেটা এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেও অর্থনীতির উন্নয়ন করা সম্ভব। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তন ও দরিদ্রতার সঙ্গেও একসঙ্গে লড়াই করা সম্ভব। একধরনের উভয় সংকটপূর্ণ অবস্থা দূর করার জন্য দরকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মন।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা অনেক দূর এসেছ। আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। একটা শেষ উপদেশ দিচ্ছি, জীবনটাকে উপভোগ করো, আনন্দ খুঁজে নাও—এটাই হলো বেঁচে থাকার নির্যাস। পৃথিবীতে তোমার বেঁচে থাকার অর্থ অনুসন্ধান করো। তুমি যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাও, তা নিয়ে ভাবো ও কাজ করে যাও। জীবনতরীকে ঝড়ের বিপরীতে চালাতে ভয় পেয়ো না। আজ থেকে তোমাদের নতুন এক যাত্রা শুরু হলো।

সাফল্য লাভের জন্য চাই ধৈর্য - এলন মাস্ক

মার্কিন উদ্যোক্তা এলন মাস্কের জন্ম ২৮ জুন, ১৯৭১। ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থ আদান-প্রদান সেবাপ্রদানকারী ওয়েবসাইট পেপালের সহপ্রতিষ্ঠাতা তিনি। ২০১২ সালের ১৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন। **সূত্র: ওয়েবসাইট। ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর জাহিদ হোসাইন**

উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা।

আমি ভাবছিলাম, আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কী বললে আপনাদের উপকার হবে। আমি এখন যে অবস্থানে আছি, তার কথা আপনাদের শোনালে, সেই জীবনের গল্প আপনাদের জন্য অনুপ্রেরণার হবে। কী শিক্ষণীয় আছে সেই গল্পে?

তরুণ বয়সে আমাকে যখন সবাই জিজ্ঞেস করত, আমি কী হতে চাই। তখন আমি জানতামই না, বড় হয়ে আমি কী হতে চাই। তার পরও ভাবতাম, কোনো কিছু উদ্ভাবনের মতো অদ্ভুত কাজ আর হতে পারে না। আমার এই অদ্ভুত ভাবনার পেছনের কারণ ছিল, বিজ্ঞান কল্পকাহিনির লেখক আর্থার সি ক্লার্ক। তাঁর লেখায় জেনেছিলাম, 'একটি পরিপূর্ণ উন্নত প্রযুক্তি সহজেই জাদু থেকে আলাদা করা যায়।' এখন আকাশে ওড়া সম্ভব। আপনি যদি ৩০০ বছর আগে ফিরে গিয়ে আকাশে ওড়ার গল্প কাউকে বলতেন, তা হলে আপনাকে

নির্ঘাত আগুনে পোড়ানো হতো। ইন্টারনেট এমনই একটি মাধ্যম, যা দিয়ে আপনি সহজেই অনেক দূরের জিনিস দেখতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। নিমেষেই চোখের পলকে প্রবেশ করতে পারেন পৃথিবীর তথ্যের জ্ঞানভান্ডারে। ইন্টারনেটকে আপনি জাদুই বলতে পারেন।

এখন অনেক কিছু বাস্তবে দেখা গেলেও সেগুলো কিন্তু অতীতে কল্পনার জগতেও বাস করত না। আমরা সেই অতীতের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছি। এমন কোনো কিছু করাই আমার ইচ্ছা ছিল, যা জাদুর মতোই লাগবে এবং অদ্ভুত মনে হবে। সব সময় ভাবতাম, কোনো কিছু থাকার মানে কী? খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম সেই রহস্য। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের জগৎ উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সচেতনতার মাত্রা বাড়াতে হবে। তা হলেই আমরা আলোকিত মানুষ হতে পারব। সঠিক প্রশ্ন করার গুণ অর্জন করতে পারব। এই দিয়েই পৃথিবীবাসী প্রগতির পথে আরও এগিয়ে যাব।

এ জন্যই হয়তো আমি পদার্থবিজ্ঞান আর অর্থনীতি পড়া শুরু করেছিলাম। কারণ, এ জন্য আপনাকে অনেক জানতে হবে। পৃথিবী কীভাবে কাজ করে, অর্থনীতি কী করে এবং সাধারণ মানুষকে একসঙ্গে আনার কৌশল জানতে হবে। এগুলো দিয়েই তৈরি হবে আপনার উদ্ভাবন। এককভাবে আপনার পক্ষে এখন কোনো কিছু করা প্রায়ই অসম্ভব। ১৯৯৫ সালে আমার চিন্তা ছিল, ইন্টারনেট নামের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করা। সফলতা আসবে কি না, আমি জানতাম না। কারণ, সফলতা বেশ কঠিন একটি চক্কর। আপনার হাতে সে ধরা দেবে কি না, আপনি কখনোই জানবেন না। আমি শুধু প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলাম। সে জন্য আমি যা করেছিলাম, তা আপনাদের কখনোই অনুকরণের পরামর্শ দেব না। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউটের সিদ্ধান্ত নিই এবং ইন্টারনেট নিয়ে কাজ শুরু করি। এ রকমই আমার একটা কাজ ছিল, ইন্টারনেটে অর্থ আদান-প্রদানের জন্য পেপাল প্রতিষ্ঠা। এখন পেপাল অনেক জনপ্রিয় হলেও শুরুটা কিন্তু এমন ছিল না। প্রথমে আমরা সব ধরনের আর্থিক সেবা এই সাইটের মাধ্যমে দিতে শুরু করলাম। কেউ আমাদের কথা শুনল না। আমরা তখন অনেক সময় নিয়ে সবাইকে ই-মেইলের মাধ্যমে লেনদেনের কথা বোঝালাম। সেই চেষ্টার ফল আপনারা এখন পেপালের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

পেপালের পর আমি চিন্তা করেছিলাম, কোন সমস্যাগুলো মানুষের ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

মানুষের জীবনকে এক পৃথিবীকেন্দ্রিক না রেখে বহু গ্রহকেন্দ্রিক করলে ভবিষ্যতের মানুষের উপকার হবে। এ জন্য আমি উদ্যোগ নিলাম স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠার।

আমি মঙ্গলে অবতরণ করার কথা না ভেবে সহজলভ্য মহাকাশ যোগাযোগব্যবস্থায় মনোযোগ দিলাম। সেই থেকে শুরু স্পেসএক্সের। আমি একা কিছুই করতে পারব না। একাকী কঠিন পথ পার হওয়া বেশ হতাশাজনক। আত্মপ্রত্যয়ী কয়েকজন মানুষ নিয়ে আমার দল গঠন করলাম। যাত্রা শুরু করলাম দুর্জয়কে জয় করার।

২০০৮ সালে আমরা প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করি। আমরা সফল হই। না হলে সর্বনাশ ছিল। কারণ, সব টাকা-পয়সা আমরা বিনিয়োগ করে ফেলেছিলাম। আমাদের সব টাকার বিনিয়োগের ফলাফল রকেটটি যখন পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছাল, তখন আমরা বিশ্বজয়ের সাধ পেয়েছিলাম। গুরুত্বসহকারে মহাকাশে গমন নিয়ে কাজ শুরু করলাম। আমরা ফ্যালকন ১ নভোযানকে আকাশে পাঠাতে সক্ষম হই। সবশেষে ড্রাগন নভোযান নির্মাণে মনোযোগ দিই।

আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না, আকাশে আমার নভোযান গিয়েছে। ভবিষ্যতের মানুষকে বহু গ্রহের বাসিন্দা হতে হলে আরও গবেষণা করতে হবে। হয়তো সেই গবেষণার সঙ্গে আপনারা অনেকেই ভবিষ্যতে অংশ নেবেন। সাফল্য লাভে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর বয়স চার বিলিয়ন বছরের বেশি, কিন্‌্তু তার চেয়েও তরুণ আমাদের মানবসভ্যতার বয়স। আমরা মাত্র ১০ হাজার বছর ধরে লিখতে পারি। এটিই আমাদের মানবসভ্যতার সাফল্য। আমি সব সময়ই ভবিষ্যৎ পৃথিবী নিয়ে আশাবাদী। আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তার পরও আশাবাদী।

আপনি যদি নিজের কোম্পানি চালু করতে চান, তা হলে আপনাকে কাজপাগল হতে হবে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে সবকিছু দেখতে ভালো লাগে, সেখানে আপনি যা ইচ্ছা তা-ই বানাতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার কাজের নমুনা তৈরি করে সবাইকে দেখান, সেই নমুনা দেখতে আকর্ষণীয় না হলেও, অনেকেই আপনার কাজের প্রতি আগ্রহী হবে।

যেখানেই কোনো কিছু ঘটে, সেখান থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করা যায়। আপনারা তরুণেরা একুশ শতকের জাদুকর। কোনো কিছুই আপনাদের আটকে রাখতে পারবে না। কল্পনার মাত্রা হয়তো সীমিত। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও আপনারা নতুন কোনো জাদু ও চমক সৃষ্টি করে বদলে দিতে পারেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিহাস। সবাইকে ধন্যবাদ।

অসম্ভব বলে কিছু নেই - অপরাহ উইনফ্রে

অপরাহ উইনফ্রে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী, ধনী ও কৃষ্ণাঙ্গ উপস্থাপক। তাঁর বিশ্বখ্যাতি স্বপরিচালিত দি অপরাহ উইনফ্রে শোর জন্য। ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া এই শো শেষ হয় ২০১১-তে। যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিতে ১৯৫৪ সালের ২৯ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৯৯৭ সালে ওয়েলেসলি কলেজের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তব্য দেন। **সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার**

তোমাদের সবাইকে আমার অভিবাদন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আজ এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একসময় আমিও এই কলেজে পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কোনো স্কলারশিপ ছিল না বলে তা হয়ে ওঠেনি। আমি তোমাদের নিয়ে সত্যিই গর্বিত।

আজ আমি তোমাদের কাছে পাঁচটি বিষয় তুলে ধরব, যা আমাকে জীবন সাজাতে শিখিয়েছে। প্রথমত, জীবন একটা ভ্রমণ। ওয়েলেসলির একটি দিক আমার খুবই ভালো লাগে। এখানে মেয়েদের তাদের জীবনের সবটুকু সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে দেওয়া হয়; নিজেদের সত্তাকে চিনতে উৎসাহিত করা হয়। আমার এ ব্যাপার বুঝতে বেশ দেরি হয়েছিল যে প্রতিদিনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাগুলো দিয়েই নিজেকে আবিষ্কার করে আপন আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া যায়। আমি বহুদিন ধরে নিজেকে চিনতে পারিনি। নিজে যা নই, তা-ই হতে চেয়েছি। আমার বয়স যখন ১০, টিভিতে ডায়ানা রসকে দেখে আমি ঠিক তাঁর মতো হতে চাইতাম। অনেক দিন পর বুঝলাম, আমি যতই ডায়েট করি, আমার দৈহিক গড়ন ডায়ানার মতো হবে না। টেলিভিশনে কাজ শুরুর প্রথম দিকে আমার বার্তা পরিচালক আমাকে এমন কিছু একটা বানাতে চেয়েছিলেন, যা আমি নই। তাঁর মতে, আমার চুল ছিল অতিরিক্ত ঘন। তাই আমি নিউইয়র্কের এক বিউটি পারলারে গিয়ে হাজির হলাম। তারা আমার চুলে যে কসমেটিকস ব্যবহার করল, তাতে আমার মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনকার আমি আজকের অপরাহ ছিলাম না। আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি যে আমার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। পরের এক সপ্তাহের মধ্যে আমার মাথার প্রায় সব চুল পড়ে গেল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী, যার মাথায় চুল বলতে কিছুই নেই, সেই অবস্থায় আমি টেলিভিশনে উপস্থাপক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তখন আমি নিজেকে চিনতে পারি, বুঝতে পারি আমি ডায়ানা রস কিংবা বারবারা ওয়াল্টারস নই, যাঁদের মতো আমি হতে চেয়েছিলাম।

এভাবে ভুল করতে করতেই অনেক কিছু শিখেছি আমি। অনেক ভুল করার পর বুঝেছি, নিজেকে 'বারবারা' বানানোর চেয়ে দারুণ একজন 'অপরাহ' বানানোই অধিকতর যুক্তিসংগত। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, বারবারাকে দেখে আমি শিখব, কিন্তু আমি 'অপরাহ'কে ছাপিয়ে বারবারা হতে চাইব না। আজ আমার এই সাফল্যের মূলে রয়েছে নিজেকে চিনতে পারা, নিজের মতো থাকা। নিজের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যকে আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যের কাছে দায়বদ্ধ থাকা।

আমার বন্ধু মায়ার কাছ থেকে আমি আরেকটি চমৎকার জিনিস শিখেছি। এটা তোমরা আয়ত্ত করতে পারলে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় বাঁচাতে পারবে, অনেক ভুল সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। যখন কারও প্রকৃত চেহারা তোমার সামনে উন্মোচিত হবে, সেটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করো। প্রথমবারেই বুঝে নাও, সতর্ক হও; ২৯ বার দেখার বা সহ্য করার পর নয়। বিশেষ করে সম্পর্কের বেলায় এটা খুবই সত্য। যখন কেউ প্রথমবার তোমাকে আঘাত করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, জেনে রাখো, একই কাজ সে আবার

করতে পারে। হয়তো বারবার করবে। তোমার জীবন বিষিয়ে তুলবে। তাই প্রথমবারেই সাবধান হও। সত্যকে অবলম্বন করে বাঁচো। বাকি সবকিছুই তুমি সামলে নিতে পারবে। সব বাধাই কাটিয়ে উঠতে পারবে। দেরিতে হলেও আমি এটা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম যে একমাত্র সত্যই আমাকে মুক্তি দিতে পারে।

শোককে শক্তিতে পরিণত করো। জীবনে অনেক আঘাত পাবে, অনেক ভুল করবে। এসব দেখে অনেকে তোমাকে বলবে, তুমি ব্যর্থ। কিন্তু বিশ্বাস করো, যা তুমি ব্যর্থতা বলে মনে করছ, তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আসলে তোমাকে বলছেন, 'তুমি ভুল পথে চলছ।' নিজেকে ব্যর্থ ভেবে হতাশ হয়ো না। এটা একটা অভিজ্ঞতা মাত্র। একে কাজে লাগাও। একসময় বাল্টিমোরে আমাকে টেলিভিশনে সাংবাদিকতা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, আমি এ কাজের যোগ্য নই। কারণ, আমি নেতিবাচক খবর উপস্থাপন করতে করতে কেঁদে ফেলতাম। ধরো, কোথাও আগুন লেগেছে আর সাংবাদিক নিজেই তা বলতে বলতে গৃহহারা মানুষের জন্য কেঁদে ফেলছে। ব্যাপারটা মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু যত দিন পর্যন্ত না আমার পদাবনতি হলো আর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো 'টক শো' করার জন্য, তত দিন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, আমার ভেতরে কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। সেই ১৯৭৮ সালে যেদিন আমি প্রথম টক শো উপস্থাপনা করি, এক অদ্ভুত ভালো লাগায় মন ভরে গিয়েছিল। যেন নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি নিজের ভুলেই সাংবাদিকতা থেকে বাদ পড়েছিলাম, যেটাকে আমার ক্যারিয়ারের এক বিরাট ব্যর্থতা মনে হতে পারে, কিন্তু আমি সেই ভুল থেকেই টক শোর জগতে প্রবেশ করি। আর এই ক্যারিয়ার আমাকে নিঃসন্দেহে ব্যর্থতা দেয়নি!

নিজের ভেতরে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত করো।

আমার বয়স যখন ১৫, তখন থেকে আমি ডায়েরি লেখা শুরু করি। ১৫-১৬ বছরের লেখাগুলো সব প্রেমঘটিত জটিলতায় ভরা! কিন্তু যত বড় হয়েছি, তত আমি বর্তমানকে গ্রহণ করতে, ভালোবাসতে শিখেছি। আমি বলব, তোমরাও প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকাকে উপভোগ করো। যেসব জিনিসের জন্য তুমি জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ, তা একটা ডায়েরিতে লেখো। আজ সারা দিনে ঘটে যাওয়া যেসব ঘটনার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ, এমন পাঁচটি ব্যাপার লিখে রাখার অভ্যাস করো। এতে সারা দিন নিয়ে, এমনকি জীবন নিয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। তোমার যা আছে, তার প্রতি তুমি যখন মনোযোগ দিতে শিখবে, তখন দেখবে পৃথিবীতে কোনো কিছুর কমতি নেই। আর যদি কী নেই, কী পেলাম না—সে হিসাব মেলাতে ব্যস্ত

থাকো, তা হলে কোনো কিছুই আর তোমাকে সুখী করতে পারবে না।

জীবনে স্বপ্ন দেখার কোনো সীমা নেই। তোমার লক্ষ্যকে ও স্বপ্নকে আকাশ ছাড়িয়ে যেতে দাও। কারণ, তুমি যা বিশ্বাস করবে, তুমি তা-ই হবে। আমি যখন মিসিসিপির এক অতি সাধারণ ছোট্ট মেয়ে, আমি দেখতাম, আমার দাদি বড় এক ডেকচিতে কাপড় সেদ্ধ করে পরিষ্কার করছেন। আমাদের কোনো ওয়াশিং মেশিন ছিল না। জানি না, কেন তখন দাদিকে দেখতে দেখতে আমার মনে হতো—যদিও আমি খুব সাধারণ এক কালো মেয়ে, তাও আমি চোখের সামনে যা দেখছি—সেটাই আমার জীবনের পরিণতি হবে না। আমি বড় হব, অনেক বড় কিছু হব। চার-পাঁচ বছরের আমি সেই গভীর অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম না। কিন্তু আমি সমস্ত মন দিয়ে তা অনুভব করতাম এবং সেই উপলব্ধিকে বিশ্বাস করে পথ চলতাম।

আমি যেখানে জন্মে, যেভাবে বড় হয়ে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, যত দূর আসতে পেরেছি, এ থেকেই বোঝা যায় অসম্ভব বলতে কিছুই নেই। আমার মধ্যে অসাধারণ কিছুই ছিল না; তবু আমি পেরেছি।

স্বপ্ন দেখো। নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে পিছিয়ে যেয়ো না। নিজের চেয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে হবে তোমাদের। জীবনের লক্ষ্যকে যত দূর সম্ভব সামনে নিয়ে যাও। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, স্বপ্ন সফল হবেই। ধন্যবাদ।

নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভেবো না - বারাক ওবামা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, ৪ আগস্ট ১৯৬১। সম্প্রতি ৬ নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১২ সালের ১৪ মে বার্নার্ড কলেজের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তৃতা দেন। **সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার।**

উপস্থিত সবাইকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ! অভিনন্দন ২০১২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা! তোমাদের চারপাশের সবাই আজ তোমাদের নিয়ে গর্বিত। তোমাদের বাবা-মা, পরিবার, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, সবাইকে অভিনন্দন!

আমি গ্র্যাজুয়েশন করি ১৯৮৩ সালে। তখন আমাদের আইপড ছিল না, ছিল শুধু ওয়াকম্যান। টাইমস স্কয়ারও আজকের মতো ছিল না। সেসব এখন ইতিহাস। আমি জানি, সমাবর্তন বক্তা ইতিহাসের বুলি কপচানো শুরু করলে তার মতো বিরক্তিকর ব্যাপার আর হয় না!

তোমাদের জন্য আমার প্রথম উপদেশ, কোনো কাজই দায়সারাভাবে করবে না। কাজ যখন

করবেই, দারুণ কিছু একটা করবে। নিজের স্বপ্নের জন্য সংগ্রাম করবে। যদি বড় কিছু হতে চাও, তার জন্য কাজও সেভাবেই করতে হবে। তোমাদের সামনে যে অবারিত সুযোগ আছে, সেগুলোকে ঠিক সময়ে কাজে লাগাতে হবে। শুধু নিজেদের উন্নতির জন্য নয়, যারা তোমাদের সমান সুযোগ এখনো পায়নি, তাদের উন্নয়নের জন্য তোমাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

তোমার ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে অন্যের কথায় কান দিয়ো না। জীবন তোমার নিজের হাতে। কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত–নিজেই বুঝে নিতে শেখো। সব সময় নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করে নিতে হবে। তোমার সমস্যা তোমাকেই সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, রাস্তায় তোমাকেই নামতে হবে। শুধু বসে বসে কী হচ্ছে দেখলে চলবে না।

যা ঠিক, তাকে জোর গলায় বলতে দ্বিধা কোরো না। অন্য কেউ বলবে, সেই আশায় বসেও থেকো না। হয়তো অন্যরাও একই কথা ভাবছে, হয়তো সবাই তোমার অপেক্ষায় বসে আছে, কে জানে! আর তাই তোমাদের জন্য আমার দ্বিতীয় উপদেশ, নিজেকে কখনো অবমূল্যায়ন কোরো না। তুমি নিজেই সম্ভাবনার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠতে পারো, তখন তোমার সাফল্য আর দশজনকে স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহিত করবে। নিজের এই বিপুল সম্ভাবনাকে কখনো ছোট করে দেখো না। তোমাদের আমি এক নারীর গল্প বলতে পারি। তার পরিবার এ দেশে অভিবাসী হয়ে এসেছিল। স্কুলে থাকতে তাকে বলা হতো, তার মাথায় যে বুদ্ধি, তাতে কলেজে ভর্তি না হওয়াই শ্রেয়। তার শিক্ষক উপদেশ দিয়েছিলেন, স্কুলের পড়ার পাট চুকিয়ে কোনো একটা কাজে লেগে যেতে। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভীষণ জেদি, সে শিক্ষকের কথা কানে তোলেনি। সে কলেজে ভর্তি হলো। একসময় মাস্টার্স ডিগ্রিও লাভ করল। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচল করল, জিতে গেল। প্রাদেশিক পদের জন্য লড়াই করল, সেখানেও জিতল। কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিল, সেখানেও না জিতে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত হিলডা সলিস পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে, কাজও করছে। তবে যেখানে-সেখানে নয়, সে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে!

ভেবে দেখো, আজ যখন কোনো ছোট্ট লাতিন মেয়ে দেখছে তার মতোই আরেকজন মেয়ে দেশের মন্ত্রী হতে পেরেছে, তখন সে কতটা উৎসাহিত বোধ করে! একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী যখন দেখে তার মতো কেউ জাতিসংঘের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার স্বপ্ন কতটা বদলে যায়! তুমি জানোও না, নিজের অজান্তেই এই পৃথিবীতে তুমি কত কিছু বদলে দিতে পারো। নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভেবো না, নিজের

সম্ভাবনার অমর্যাদা কোরো না। নিজেকে দশজনের জন্য রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো। তুমি আজ যেখানে এসেছ, সেখানে আসতে অন্যদের উৎসাহিত করো, সহযোগিতা করো। একজন মেয়ে যত দিন না নিজেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার কিংবা সামরিক কমান্ডার হিসেবে কল্পনা করবে না, তত দিন সে তা হতেও পারবে না। আশপাশের নারীরা যত দিন তাকে না জানাবে যে বাহ্যিক সৌন্দর্য কিংবা ফ্যাশন ছাড়াও চিন্তাভাবনার অনেক কিছু আছে–নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে–তত দিন পর্যন্ত সে হয়তো ভাববে সৌন্দর্যের মধ্যেই তার জগৎ সীমাবদ্ধ। তোমরা নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করো এবং নিজেদের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাও।

আমার শেষ উপদেশ হলো, ধৈর্য ধরো। শুনতে খুবই সহজ আর সাদামাটা মনে হচ্ছে, কিন্তু এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ভালো জিনিসই সহজে পাওয়া যায় না। এমন কোনো সফল মানুষ পাবে না, যে ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। বরং তার উল্টোটাই হতে দেখা যায় সব সময়। তারা মারাত্মক সব ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। তারা ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা কখনো হাল ছেড়ে দেয় না।

তোমাদের বয়সে আমার পকেটে টাকা বলতে গেলে ছিলই না, সামনে এত সুযোগও ছিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি নিজের স্থান খুঁজে ফিরছিলাম। আমি চাইতাম বড় কিছু করতে, চারপাশকে বদলে দিতে। কিন্তু কীভাবে তা করব, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না আমার। গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাকে এই নিউইয়র্কে অনেক ছোটখাটো কাজ করে জীবন চালাতে হয়েছে। তবু আমি ভুলে যাইনি আসলে কী করতে চেয়েছিলাম।

অসীম ধৈর্য আমার জন্মগত কোনো গুণ নয়। আমি ধৈর্য ধরতে শিখেছি। শৈশবে যে নারীরা আমাকে লালনপালন করেছিলেন, তাঁদের দেখে আমি শিখেছি ধৈর্য কী জিনিস। আমার মা কী সংগ্রাম করে একই সঙ্গে পড়াশোনা, চাকরি আর আমাকে সামলেছেন, তা আমি দেখেছি। অসম্ভব অর্থকষ্ট, তার ওপর ভেঙে যাওয়া সংসার। কিন্তু তিনি কখনো হাল ছাড়েননি। খুব ভোরে মা আমাকে ডেকে তুলতেন ইংরেজি পড়ার জন্য। আমার বিরক্তির সীমা ছাড়িয়ে যেত। অভিযোগ করলে মা বলতেন, 'এটা আমার জন্যও পিকনিক নয়, গাধা কোথাকার!' পরে আমি আমার নানির কাছে বেড়ে উঠি। তিনি হাইস্কুলের পর আর পড়তে পারেননি। একটা স্থানীয় ব্যাংকে কাজ করতেন নানি। যেসব পুরুষকে তিনি একসময় প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাঁর চোখের সামনে তারা পদোন্নতি পেয়ে ওপরে উঠে যেত। কিন্তু তিনি ভেঙে

পড়েননি। নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে কাজ করে গেছেন। একসময় তিনি সেই ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। না, তিনিও হার মানেননি।

পরে আমার সঙ্গে এক নারীর দেখা হয়, যাঁর দায়িত্ব ছিল আমার চাকরির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া। তিনি আমাকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে বিয়েই করে ফেলি! বিয়ের পর ক্যারিয়ার আর সংসার একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে মিশেল ও আমি দুজনেই দারুণ হিমশিম খেয়েছি। আমাদের ধৈর্য ছিল বলেই সেই কঠিন সময়গুলোতে সংসার টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। মিশেলের বাবা-মা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শের গুণেই আজ মিশেল এত কিছু সামলে নিতে পেরেছে, আমার জীবনের ওঠানামার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

এই মানুষেরাই আমার সব অনুপ্রেরণার উৎস। যাদের কথা কখনো খবরে আসে না, যারা দেশের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে, কেউ চেনেও না তাদের। তারা শুধু নিজের দায়িত্ব নিঃশব্দে পালন করে যায়, বিপদের সামনে শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, কোনো কিছুতেই তারা হার মানে না। আমি আজ তাদের জন্যই এতদূর আসতে পেরেছি। তারা নিজেরা পৃথিবী বদলানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেনি, কিন্তু তারা আছে বলেই পৃথিবীটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, যাবে।

মনে রেখো, এই পৃথিবীতে নিজের চিহ্ন রেখে যাওয়া সোজা নয়। এর জন্য ধৈর্য ধরতে হয়, প্রতিজ্ঞা থাকতে হয়। হেসেখেলে সফল হওয়া যায় না। সাফল্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তুমি যদি সংগ্রাম করে নিজের জায়গা করে নিতে পিছপা না হও, দশজনের সামনে নিজেকে দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারো আর যত বাধা আসুক না কেন হাল ছেড়ে না দিয়ে লেগে থাকতে জানো, তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, শুধু তুমিই সফল হবে না, তোমাকে দেখে আরও অনেকে সফল হতে শিখবে। তোমাদের সাফল্যে গোটা জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি নয়, নিজেই হও উদ্যোক্তা - রিড হফম্যান

ব্যবসাভিত্তিক অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক 'লিঙ্কড ইন'-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা রিড হফম্যানের জন্ম ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্কড ইনের ব্যবহারকার্ীর সংখ্যা এখন সারাবিশ্বে এক কোটি ৭৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

সূত্র: ওয়েবসাইট . ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

আজ আমি বক্তৃতা শুরু করব ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি বলেছেন, 'সব মানুষই আসলে উদ্যোক্তা হয়ে জন্ম নেয়। মানুষ যখন গুহায় বাস করত, তখন তারা সবাই ছিল এক অর্থে উদ্যোক্তা। তারা নিজেরাই খাবার সংগ্রহ করত, নিজেদের কাজের সংস্থানও করত। এভাবে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেই মানব ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। সভ্যতার সূচনালগ্নে বেকার বলে কোনো শব্দ ছিল না। কিন্তু সময় যত পেরিয়েছে, আমরা আমাদের সহজাত উদ্যোক্তাসুলভ মনোভাবকে তত দমিয়ে ফেলেছি। আমরা উদ্যোক্তা থেকে পরিণত হয়েছি শ্রমিকে। আমাদের মগজে পাকাপাকিভ্াবে এই ধারণা ঢুকে গিয়েছে যে আমাদের চাকরি করতে হবে।'

আমি এই উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম, কারণ উদ্যোক্তারা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আজ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের অধিকাংশই অভিবাসী কিংবা অভিবাসীদের বংশধর। তাদের পূর্বপ্রজন্ম মহাসাগরের ওপার থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একদিন এই নতুন ভূখণ্ডে এসেছিল। আজকে অনেক বড় বড় কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা একদিন অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা ফেলেছিলেন, তাঁদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন বলতে আজ এটিই বোঝায়, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর মেধার সমন্বয়ে নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে নিজের হাতে গড়ে তোলা।

উদ্যোক্তারা হলো সেসব হাতেগোনা মানুষ যারা সমাজের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নিজেদের পথ নিজেরাই সৃষ্টি করে নেয়। তাঁরা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং অন্যদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এর সবকিছুই সমাজকে এগিয়ে নিতে অপরিহার্য। এখন বেকারত্বের হার কত একটু ভেবে দেখো। আজ যদি আমাদের মধ্যে আরও অনেক উদ্যোক্তা থাকতেন, আরও নতুন নতুন ব্যবসা গড়ে উঠত! তা হলে বেকারত্ব দূর করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। এই আধুনিক সমাজে ব্যবসায় উদ্যোগ শুধু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আর মানুষের কর্মসংস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্যোগী মনোভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজ প্রায় সব পেশাতেই দরকার। নিঃসন্দেহে এটি একটি নতুন ব্যাপার।

পৃথিবী এখন বিশ্বায়ন আর প্রযুক্তির কল্যাণে যত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। গত দশকে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে ধাপে ধাপে তার ক্যারিয়ার গড়ে তুলত। কর্মক্ষেত্রে তার কাজের একটি নির্দিষ্ট বিভাগ থাকত, ক্যারিয়ারের পথ ছিল সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। যে কোম্পানিতেই কাজ করুক না কেন, সে সেই ছকের ভেতরে থেকেই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেত।

পরিশ্রম এবং কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা পেলে ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়ন যেখানে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীকে বদলে দিচ্ছে, সেখানে তোমাদের মতো তরুণদের ক্যারিয়ার-ভাবনাও বদলে ফেলতে হবে। আগে ক্যারিয়ার ছিল একটি সোজা ওপরে উঠে যাওয়া সিঁড়ি, এখন তা পরিণত হয়েছে গোলকধাঁধার মতো এক পাহাড়ি এলাকায়। এখানে ওপরে উঠে যেতে হলে তোমাকে কখনো নিচেও নামতে হতে পারে, অনেক চড়াই-উতরাই পাশ কাটিয়ে যেতে হতে পারে বুদ্ধি করে, কখনো কখনো ঝুঁকি নিয়ে লাফ দিতেও হতে পারে। আবার সময়ের প্রয়োজনে হয়তো তোমাকে পাহাড়ের পাদদেশে নেমেও আসতে হতে

পারে। হয়তো দেখা যাবে পাহাড়ের গা ঘেঁষে তুমি সুন্দর একটা খেলার জায়গা বানিয়ে ফেলেছ! কিছুই আসলে একরকম থাকবে না, কখনো থাকে না। যা আছে তা বদলায়, কখনো বদলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি হয়, কখনো আগে যা ছিল তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আধুনিক ক্যারিয়ার, যা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তার এভাবেই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনকেই তোমাদের একমাত্র স্থায়ী ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে। আশপাশের সবকিছুই বদলে যাবে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তোমার দক্ষতা ও সামর্থ্যকেও দ্রুত বদলে ফেলতে হবে। বর্তমান সময়ে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন কৌশল। আর সেই কৌশলটি হলো, উদ্যোক্তাদের মতো চিন্তা করা। বসে বসে দীর্ঘ পরিকল্পনা করে জীবন পার করে দিলে চলবে না, কাজে নেমে পড়তে হবে। নিজের কাজ, নিজের ক্যারিয়ার নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হবে। তোমাদের মধ্যে খুব কমই নিজের ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান শুরু করবে, কিন্তু তার পরও প্রত্যেকেরই উদ্যোক্তাদের মতো চিন্তা করা উচিত। কীভাবে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে বা নিজের ভেতরে উদ্যোগী-ভাবনা জাগিয়ে তুলবে, তা নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে। কিন্তু আমার কাছে যদি একটিমাত্র পরামর্শ চাওয়া হয় এ ব্যাপারে তা হলে আমি বলব, নিজের ‘নেটওয়ার্ক’ তৈরি করো। তোমার পরিচিতজনেরাই তোমাকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

তোমার নেটওয়ার্ক যত শক্তিশালী হবে, তুমি তত বেশি তথ্য পাবে, ব্যবহারিক জ্ঞান পাবে। তোমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তোমাকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এমনভাবে সাহায্য করবে, যা তুমি হয়তো চিন্তাও করতে পারবে না। মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন, সেটা তোমার সফল হওয়ার পেছনে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তোমার নেটওয়ার্ক থেকে তুমি যেমন মূল্যবান তথ্য আর প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে পারো, তেমনি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কঠিন চ্যালেঞ্জ, যা তোমার একার পক্ষে কখনোই মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না, তাও তুমি সামাল দিতে পারো। অনেক অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা আর দুর্যোগকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারো, অনেক নতুন সম্ভাবনাও খুঁজে বের করতে পারো, শুধু তোমাকে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। আজ যেখানে তোমরা সমাবর্তনের জন্য হাজির হয়েছ, এখানেও তোমাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। আমাকে প্রথম চাকরি দিয়েছিল আমার এক বন্ধুর রুমমেট, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আমি ‘পেপাল’-এর প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড মেম্বার, সেটিও হয়েছিল আমার এক কাছের বন্ধুর মাধ্যমে যে কোম্পানিটির সহপ্রতিষ্ঠাতা। আসলে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক শুধু যারা তোমার পরিচিত তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, একটা মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে

পড়ে। যাদের সঙ্গে তোমার সুসম্পর্ক তারা, তাদের পরিচিত মানুষেরা, এমনকি সেই মানুষদেরও পরিচিত মানুষেরা–সবাই এক অদৃশ্য সুতায় জড়িয়ে আছে। জীবন একটি দলগত খেলা, যেখানে একাকী তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমার আশপাশের সবকিছু, তোমার দলের সবাইকে নিয়েই ‘তুমি’।

উদ্যোক্তাদের অদম্য মনোভাব থেকে যেকোনো পেশার মানুষই তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা নিতে পারে। আজকের পৃথিবী খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তাই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা আর নতুন কিছু আবিষ্কার করার তাগিদও দিন দিন বাড়ছে। এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে হলে উদ্যোক্ত্াদের মতো ভাবতে হবে, তারাই নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন, আমাদের উদ্যোক্তা প্রয়োজন।

২০১২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা, ভুলে যেয়ো না তোমরাই আমাদের নেতা, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তোমাদের মধ্যে থেকেই নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, তোমরাই সমাজকে বদলে দেবে। তোমরা শুধু নিজেরা উদ্যোক্তা হয়েই থেমে যেয়ো না। তোমাদের মতো আরও অসংখ্য উদ্যোক্তা যাতে সৃষ্্টি হতে পারে, বিকাশ লাভ করতে পারে, এ সমাজে তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে এগিয়ে এসো। জেনে রেখো, একজন মানুষ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেই পরিবর্তন ফলপ্রসূ হয় তখনই যখন আরও অসংখ্য মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। আজ থেকে তোমরা এক নতুন পথে পা বাড়ালে, এখনই সময় নতুন কিছু করে দেখানোর। তোমাদের জন্য শুভকামনা।

মূল্যায়নের আশায় থেকো না - বব ডিলান

বব ডিলান 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর অন্যতম শিল্পী। কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে। বব ডিলানের জন্ম ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায়। বিগত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে সংগীতজগৎ। গ্র্যামি, গোল্ডেন গ্লোব, অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড, পুলিৎজারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। বব ডিলান টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অন্যতম। **সূত্র: ওয়েবসাইট. ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে স্কট কোহেনকে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছেন অঞ্জলি সরকার**

অনেকেই আমার সাক্ষাৎকার নিতে চায়। কিন্তু আমি যদি পারতাম, তাহলে সেই সব মানুষের সাক্ষাৎকার নিতাম, যারা আজ বেঁচে নেই, কিন্তু ফেলে রেখে গেছেন অনেক অসমাপ্ত কাহিনি, জন্ম দিয়েছেন অনেক প্রশ্নের। হ্যাঙ্ক উইলিয়ামস, মেরিলিন মনরো, জন এফ কেনেডি, এমন আরও অনেকে, যাঁদের জীবন মানুষকে এখনো ভাবিয়ে তোলে। কোটিপতিদের জীবন আমাকে আকৃষ্ট করে না। আমি জানি না, টাকার পাহাড় জীবনে কী-ই বা দিতে পারে। যাঁদের কাজ আমার পছন্দ হয়, আমি সেই কাজগুলোকে শ্রদ্ধা করেই খুশি থাকি।

আমার মনে হয়, একজন গীতিকারের সবচেয়ে অসাধারণ গানগুলো পুরোপুরি তাঁর কল্পনার জগৎ থেকে আসে, যা তিনি বাস্তবে কখনো ছুঁয়ে দেখেননি। এ যেন এক অন্য রকম মুক্তি! যদিও নিজের বেলায় এমনটা করা সাধারণত হয়ে ওঠে না। বেশির ভাগ সময় চারপাশে যা ঘটে চলেছে, সেটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। কলেজের পড়াশোনার পাট আমার প্রথম বছরেই চুকে গিয়েছিল। লেখালেখি কিংবা সাহিত্য নিয়ে আমার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। আমি শুধু আমার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াই। আমি জানি, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আমার অনেক জানাশোনা থাকার কথা, কিন্তু সত্যিটা তার বিপরীত। আমি এসব নিয়ে তেমন কিছুই জানি না। আমি লিখতে শুরু করেছিলাম কারণ, আমি গান গাইতাম। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল আমার জন্য। সবকিছু তখন খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিল আর আমার কেবলই মনে হতো, কোনো একটি ব্যাপার নিয়ে গান থাকা উচিত। কারও না কারও সেই গানটি লেখা উচিত। তখন আমিই সেই গান লিখতে শুরু করে দিলাম। কারণ, আমি তা গাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। আমার আগেই যদি সেসব গান কেউ লিখে ফেলত, তাহলে আমি আর গান লেখা শুরু করতাম না।

এভাবেই জীবনে একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার জন্ম দেয়। আমিও নিজের মতো গান লিখতে থাকি। এসবের কোনোটাই আমি খুব গুছিয়ে কিংবা পরিকল্পনা করে করিনি। কবিতার বেলায়ও ঠিক তাই। হাইস্কুলের চৌকাঠ পেরোনোর আগে আমি কখনো কবিতা লিখিনি।

আমার বয়স যখন ১৮, তখন আমার হাতে এসে পড়ে গিন্সবার্গ, গ্যারি সিন্ডার, ফিলিপ হোয়ালেনের লেখা। তারপর আমি ফরাসি সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ি, কবিতায় সুর বসাতে থাকি। তখনকার দিনে ফোক মিউজিক আর জ্যাজ ক্লাবের দারুণ চল ছিল, সেখানে কবিরা গানের সঙ্গে তাঁদের কবিতাও পড়ে শোনাতেন। আমার মনে বইয়ের পাতায় আটকে থাকা কবিতার চেয়ে কবির কণ্ঠে সেই প্রাণবন্ত কবিতা অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৬১ সালে আমি একের পর এক ফোক মিউজিক কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হই। ফোকওয়েজ, ট্র্যাডিশন, প্রেস্টিজ, ভ্যানগার্ড—এরা সবাই আমাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর আমি কলাম্বিয়া রেকর্ডসের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করি। সেটা ছিল আমার জন্য একটি বিরাট ঘটনা। এভাবেই হয়তো আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যর্থতা মনে হয়, নিজের অজান্তে সেটি ভবিষ্যতের সাফল্য বয়ে আনে। তখন আমি যদি সেই কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ফোক মিউজিকের চুক্তি

করতাম, তাহলে আমার সবকিছুই অন্য রকমভাবে হতো। মনে হয় না তাদের সঙ্গে আমার বেশি দিন থাকা হতো। মজার ব্যাপার হলো, তাদের অনেকের ব্যবসাই এখন উঠে গেছে!

১৯৬৬ সালে আমার খুব খারাপ ধরনের একটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটে। আমার মেরুদণ্ডের কয়েকটি হাড় ভেঙে যায় আর আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আমার ক্যারিয়ার যেভাবে এগিয়ে চলছিল, তাতে বেশ ভালোভাবেই ছেদ পড়ে। কিন্তু একই সঙ্গে এই দুর্ঘটনা জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দেয়, আমি নতুন করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করি। এখন আমার মনে হয় সেই দুর্ঘটনা আমার জীবনে আশীর্বাদই বয়ে এনেছিল!

আমার ছোটবেলা কেটেছে দাদির কাছে। দারুণ একজন মানুষ ছিলেন তিনি, এখনো খুব মনে পড়ে তাঁকে। অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বড় হতে হয়েছে আমাকে। এমনকি কিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, ভবিষ্যতে কী হবে তাও সব সময় পরিষ্কার ছিল না। আমার একাকিত্বই আমাকে শক্তি জোগাত। কারণ, আমার জীবনকে আমি সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলাম আর যা চাইতাম, ঠিক তা-ই করতাম। মিনেসোটার উত্তরে আমার ছোটবেলার দিনগুলোতে আমার জীবনের অনেকখানি মিশে আছে। আমি জানি না, আমার জীবনটা কেমন হতো যদি আমি ইথিওপিয়া কিংবা দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়ে উঠতাম। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্ম নিলেও আমি হয়তো সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষে পরিণত হতাম। আমার মনে হয়, পরিবেশের এই প্রভাবটা সবার বেলায়ই সত্যি।

যখন কেউ নতুন কিছু করে, পরিবর্তনের কথা বলে, তখন অধিকাংশ সময়ই তার পরিচিত মানুষেরা বা নিজের দেশের লোকেরা তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে না। স্বদেশে সে হয়তো উপহাসের পাত্র হয়, কিন্তু দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের লোকেরা ঠিকই তার কদর বুঝতে পারে। গৌতম বুদ্ধের কথাই ধরা যাক, তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সম্পদ। এখন বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছে কোথায়? চীন, জাপানসহ এশিয়ার অন্য প্রান্তে। তবে হ্যাঁ, সত্যকে প্রথম প্রথম কেউই মেনে নিতে না চাইলেও একসময় তা নিজগুণেই প্রকাশিত হয়। তত দিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাকে মেনে নেওয়ার মানসিকতাও গড়ে ওঠে। আপনা-আপনিই তখন লোকে সেই আদর্শে চলতে থাকে, যে আদর্শকে তারাই একদিন তাচ্ছিল্য করেছিল।

লোকে তোমার নামে অনেক কিছুই বলতে পারে। গণমাধ্যম অনেক গল্পই বানাতে পারে তোমাকে নিয়ে। এখনকার দিনে কোনো কিছু গণমাধ্যমে না আসার অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার

আদৌ কোনো অস্তিত্বই নেই! সবকিছুই যেন ব্যবসা; ভালোবাসা, সত্য, সৌন্দর্য–সব। মানুষের স্বাভাবিক কথোপকথনও আজ বাণিজ্যের উপকরণ। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কাছে এসবের কোনো কিছুই টিকবে না। তুমি নিজেকে কী মনে করো, তোমার কত বড় উপাধি আছে, এসব তাঁর কাছে অর্থহীন। তিনি কখনো মানুষকে সম্পদ কিংবা পেশা দিয়ে বিবেচনা করবেন না। তিনি বলবেন না এ একজন কোটিপতি, ও একজন চিকিৎসক, সে একজন খেটে খাওয়া মানুষ।

এখন পৃথিবীর রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে গেছে। ষাটের দশকে শিক্ষার্থীরা রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করত, তাদের অধ্যাপকেরা ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তাঁদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা পথে ছড়িয়ে পড়ত। আমি রাজনীতি নিয়ে যা জেনেছি, শিখেছি, সবই এসেছে পথে নামা সেই মানুষগুলোর কাছ থেকে। তখনকার পরিবেশটাই ছিল অন্য রকম। এখন সবাই অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, যে যার ঘর গোছাতে ব্যস্ত। একতা বলতে যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তখনকার দিনে এত বিভেদ ছিল না। আজকের সঙ্গে সেদিনের তুলনা করতে গেলে মানুষে মানুষে এই ভেদাভেদটাই আমার চোখে সবার আগে ধরা পড়ে।

সময় তার নিজের নিয়মে বয়ে চলছে। সবকিছুই বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন, একটু একটু করে। আমি নিজের চলার গতি কমিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বাকি সবকিছুই বড় বেশি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমি যখন ছোট্ট শিশু ছিলাম, আমি শিশুর মতো ভাবতাম। যখন বড় হলাম, আমি সেই শিশুসুলভ ভাবনাগুলোকে সরিয়ে রেখে দিলাম। আমি একটা ব্যাপার কখনোই বুঝতে পারি না, আর তা হলো মানুষ উদ্ধত হয় কেন? কেন মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে? লোকে এমনভাবে কথা বলে, চলাফেরা করে, জীবন কাটায় যেন অনন্তকাল ধরে তারা এভাবেই বেঁচে থাকবে। যেন মৃত্যু তাদের কখনো স্পর্শ করবে না। সবচেয়ে বড় সত্যিটাকেই তারা এভাবে অস্বীকার করে। আর মৃত্যুর পর তারা পৃথিবীতে কী রেখে যায়? ছেড়ে যাওয়া খোলসের মতো একটা শরীর আর কিছুই না।

ব্যর্থতা থেকেই শিখতে হবে - ক্যারল অ্যান বার্টজ

COURTESY: YAHOO

উপস্থিত শিক্ষার্থীরা সবাই বিরক্ত নাকি? তোমাদের সবাইকে বেশ মনমরা লাগছে। আমাকে হ্যালো বলো! সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তোমাদের মা-বাবাকেও আমার তরফ থেকে বিশাল শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়ো।

যখন তোমরা এখান থেকে চলে যাবে, তোমাদের সামনে থাকবে নতুন পৃথিবী। তোমাদের একটা পরামর্শ দিতে চাই। যখনই কোনো কাজ করার সুযোগ পাবে তা লুফে নেবে। চেষ্টা করবে তোমার কাজের ক্ষেত্রে সব সময় সামনের দিকে থাকতে। একটি কোম্পানির কথা চিন্তা করো। আমি যে কোম্পানি থেকে এসেছি, সেখানে সব সময় সামনের দিকে কারা থাকে জানো? তারাই থাকে, যাদের ভবিষ্যতে আরও বড় হওয়ার সুযোগ থাকে। যারা অন্যদের জানাতে পারে, তাদের মধ্যে কিছু আছে, তারাই সামনের দিকে বসে। আমি তোমাদের সব সময় পরামর্শ দেব সামনের দিকে থাকতে। অনেকের সিজিপিএ কম-বেশি হতে পারে; কিন্তু সতর্ক থাকবে সেটা যেন কখনোই তোমার লক্ষ্যকে বিচ্যুত না করে। আমার পরিশ্রমের বিপরীতে আমি তোমাদের সতর্কও করে দিতে চাই। তোমাদের আমি আজ নতুন

কাজের পরামর্শ দিচ্ছি কিন্তু আমি এখন নিজেই ষাটোর্ধ্ব কর্মপদশূন্য নারী। সম্প্রতি আমাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, আমি ছিলাম একটি বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। মাঝেমধ্যে আমি তিক্ত আচরণ করি সবার সঙ্গে। আমার তিক্ত কথাবার্তায় তোমাদের জন্য ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়ার গল্প থাকবে।

তোমরা আজ সৌভাগ্যবান। কারণ, তোমরা দেশের শ্রেষ্ঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমাদের ডিগ্রি অর্জন করতে যাচ্ছো। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন পর্যন্ত যত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী তৈরি হয়েছে, তার সংখ্যা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বেশি। সেসব সৌভাগ্যবান প্রধান নির্বাহীর সংখ্যা পাঁচ শর বেশি। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। এটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী। আমার ছোটবেলায় বেড়ে ওঠা ছিল উইসকনসিনের এক ছোট শহর আলমাতে। আট শ মানুষের বাস ছিল সেখানে। আমার জন্য দুর্ভাগ্যজনক ছিল সেই শহরের সবাই আমাকে চিনত এবং আমিও সবাইকে চিনতাম। এখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য। এই পার্থক্যে আমি একদিক থেকে গর্বিত বলা চলে। আমাদের সময়ের পড়াশোনা আর তোমাদের পড়াশোনায় আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমার মনে পড়ে যায়, ১৯৭১ সালের সেই সময়ের কথা। যখন আমরা পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারতাম, যা ইচ্ছা তাই আমাদের হওয়ার সুযোগ ছিল। আমাদের ইচ্ছামতো আমরা চলতাম। যেই সুযোগগুলো তোমাদের জন্য অনেক কমে এসেছে।

আমি ১৯৭১ সালে যখন স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি, তখনকার চাকরির জগতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির কোনোই অস্তিত্ব ছিল না। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রতিষ্ঠিত বিভাগ থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানের ওপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি। এ ক্ষেত্রে চাকরির বড়ই অভাব ছিল। কিন্তু সেই অভাব আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যদি চাকরিপ্রার্থী একজন নারী হয়। সেই সমস্যা এখনো আছে। কিন্তু ১৯৭১ সাল মার্কিন ইতিহাসে নতুন একটি সময়ের ইঙ্গিত দেয়। এ বছর প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাসডক স্টক মার্কেট। নতুন একটি বিমান সংস্থা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বিমান পরিবহন শুরু করে। এ সময়েই ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কোম্পানি ইন্টেল মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবন করে। তোমরা আজ প্রযুক্তির যা-ই ব্যবহার করো না কেন, সেখানে আমাদের সময়কার উদ্ভাবিত মাইক্রোপ্রসেসরের উপস্থিতি আছেই। সেই উদ্ভাবন ছাড়া আজকের সময় এখানে আসতে পারত না, তোমরা তোমাদের মাকে টুইট করতে পারতে না।

হতাশাপূর্ণ দিনকে তোমরা গুরুত্ব দিয়ো না। এই হতাশা তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ নির্মাণে

কোনো সাহায্য করবে না। আগামী ৫০ বছর তোমরা কাজ করার সুযোগ পাবে। পরিবর্তন করতে পারবে তোমার ভবিষ্যৎকে। তোমার সামনে আসছে অবারিত সুযোগ। এই গ্রীষ্মে যখন তুমি চাকরি খোঁজা শুরু করবে কিংবা নতুন কোনো কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করবে, তখন তোমার সামনে সৃষ্টি হবে নতুন সুযোগ। যদি সৌভাগ্যবান হও এবং মার্জিত হও তাহলে অচিরেই তুমি পৌঁছে যাবে কোম্পানির সামনের কর্তাব্যক্তিদের দলে। এটাই কিন্তু হবে তোমার জন্য আরও হতাশার। কারণ, তখন তোমার সামনে শীর্ষ বলে আর কিছুই থাকবে না। তোমাকে নিজেই তৈরি করতে হবে নতুন কোনো বিকল্প ভাবনা।

সত্তর ও আশির দশকে যখন আমি থ্রিএম ও ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট করপোরেশনে কাজ শুরু করি, তখন আমার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছিল। তখন ছিল না কোনো ইন্টারনেট, ছিল না কোনো অ্যাপস, আইফোনের ধারণা ছিল তখন স্বর্গে! নতুনদের উদ্ভাবনী শক্তিই সৃষ্টি করে নতুন নতুন সুযোগ, নতুন প্রযুক্তি। সিলিকন ভ্যালিতে এ জন্যই আমরা তোমাদের উদ্ভাবনী শক্তির কথা শুনতে চাই, জানতে চাই। তোমাদের আইডিয়ার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। তোমরাই পারো নতুন কোনো উদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু কীভাবে তোমরা এগিয়ে যাবে? কীভাবে বাস্তবায়িত করবে তোমার আইডিয়াকে?

প্রথমেই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তোমার জন্য যোগ্য বন্ধুদের। বর্তমান পৃথিবী আগের মতো একই আকৃতির হলেও সবাই এখন কিন্তু কাছাকাছি। ফেসবুক বা লিংকডইনের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তুমি কিন্তু তোমার আদর্শের বন্ধুকেই খুঁজে নিতে পারো। এটা তোমার জন্য খুবই দরকার। কারণ, তুমি যদি প্রতিভাবান ও শিক্ষিত কারও সঙ্গে মিশতে পারো, তাহলে তুমিও তোমার প্রতিভা ও শিক্ষাকে আরও শাণিত করতে পারবে।

এরপর তোমাদের নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমি কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিলাম। আমি ভালো করে যোগাযোগ করতে পারতাম না, কথা বলতে পারতাম না, অনেক শব্দের বানানই জানতাম না। অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। যেকোনো মূল্যেই সংক্ষেপে তোমার কথা, আইডিয়া প্রকাশ করার গুণাবলি অর্জন করতে হবে। সবশেষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তোমার চারপাশের লোকজনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। সত্যিকারের শ্রোতা হতে হবে। তোমার চারপাশে যারা তোমাকে গুরুত্ব দেয়, যারা তোমার কাজ করে, যারা তোমার সহকর্মী তাদের

কথা কিন্তু সত্যিই কেউ শুনতে চায় না। তোমাকেই শুনতে হবে তাদের কথা।

আমার উপদেশ হবে–চুপ থাকো এবং শুনতে থাকো। চলার পথে তোমার জীবনে বাধা আসবেই। ব্যর্থতাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সামনে এগিয়ে যেতে হলে তোমাকে তোমার ব্যর্থতা থেকেই শিখতে হবে। সবাই কিন্তু তাদের ব্যর্থতা থেকে শিখতে পারে না। ব্যর্থতাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরে নিলেই জীবন সাফল্যে ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়। আমাদের সিলিকন ভ্যালির আজ এত সফলতার পেছনের কারণ একটিই। এখানে যারা প্রতিষ্ঠিত তারা সবাই জীবনের কোনো না-কোনো সময় সত্যিকারের ব্যর্থ মানুষ ছিল। সেখান থেকে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত। সফল হতে হলে তোমাকে প্রথমে ব্যর্থতার স্বাদ নিতে হবে, তারপর সামনে তাকিয়ে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন কিছু শিখতে শিখতে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। আজ তোমাদের আগামীর জন্য আমি শুভকামনা করি। প্রত্যাশা রইল সবাই যেন আলোকিত হও।

ধন্যবাদ সবাইকে।

সূত্র: ওয়েবসাইট
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর: জাহিদ হোসাইন খান

লোকের কথায় কান দিয়ো না - সৌরভ গাঙ্গুলী

আমার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হচ্ছে, আমি সেই কাজগুলোই করি, যা আমি করতে চাই। যা করতে পারলে আমার সত্যি ভালো লাগবে, আমি তেমন কিছু করার চেষ্টা করি। একটা চ্যাম্পিয়নশিপ বা বড় কোনো সাফল্য হঠাৎ এসে ধরা দেয় না। খেলার আগে তুমি কী করছ, খেলার এক মাস আগে তুমি কীভাবে প্র্যাকটিস করেছ, আগের করা সেই কাজগুলোই ঠিক করে দেয় তুমি সফল হবে, কি হবে না। লোকে তোমাকে নিয়ে কী ভাবল আর কী বলল, সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমার নিজের কাছে তুমি কেমন, সেটিই আসল কথা। লোকের সব কথায় কান দিতে গেলে জীবন বিষিয়ে উঠতে পারে।

আমি যখন দল থেকে বাদ পড়েছিলাম, তখন ফিরে আসার একমাত্র উপায় ছিল ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করা। কাজটা মোটেও সহজ ছিল না, অন্তত ১১ বছর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা আর ছয় বছর ধরে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়া কারও জন্য তো নয়ই! কিন্তু সেই কঠিন সময়টাতে আমি নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম, নিজেই নিজেকে সাহস দিতাম।

এর আগের ১১ বছর ধরে কখনো এতটা সময়ের জন্য কলকাতায় থাকতে পারিনি, নিজের জন্য সময় বের করতে পারিনি। একটা সিরিজও মিস করিনি ১১ বছরে, এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়িয়েছি সব সময়। এ যেন এক দীর্ঘ যাত্রা–এক মাঠ থেকে অন্য মাঠ, একের পর এক হোটেল, এয়ারপোর্ট। বাইরে থেকে খেলাকে যত সহজ মনে হয়, আসলে তা নয়। যখন সাত-আট মাসের জন্য দলের বাইরে চলে যেতে হলো, সোজা ঘরে ফিরে এলাম। আমার পরিবারকে সময় দিলাম, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটালাম। নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে শুরু করলাম। একটানা ১১ বছর ধরে একই ভাবে খেলে গেলে ক্লান্তি আসাটা বিচিত্র কিছু নয়। তাই আমি নতুন ভাবে, নতুন রূপে ফিরে আসার চেষ্টা করলাম। সেই কঠিন সময়ে আমি বিশেষ কোনো পরিকল্পনা বা প্রার্থনা কিছুই করিনি। সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তখন। আমার নিজেকে নিজেই টেনে তুলতে হয়েছিল, সব সময় গভীর বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর। আমি জানতাম আমি পারব, পারতে আমাকে হবেই। সেই দুঃসময়ে নিজেকে যেভাবে সামাল দিয়েছিলাম, তাতে নিজেকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। আমি জানতাম যে আমার সামনে পথ খোলা ছিল ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর। সত্যি কথা বলতে কি, হাল ছেড়ে দিয়ে সরে আসাটা সহজ। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকা, চেষ্টা করে যাওয়া, আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা–এসব অসম্ভব কঠিন।

আমি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে ভালোবাসি। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ভালোই খেলছি। আমি জানতাম, আমাকে একবার সুযোগ দেওয়া হলে আমি দেখিয়ে দিতে পারব, আমার গভীর বিশ্বাস ছিল সে সুযোগ আমি পাব। শেষপর্যন্ত আমি তা পেয়েছিলাম। আমি খেলার সময় একটা করে বলের ওপর মনঃসংযোগ করতাম। সেঞ্চুরি, হাফ সেঞ্চুরি, দলে সুযোগ পাওয়া না-পাওয়ার দুশ্চিন্তা–এসব কখন মনের ধারে-কাছেও ভিড়তে দিইনি খেলার সময়। এসব মনে আসাটাই স্বাভাবিক, মানুষের মন তো! কিন্তু যখনই এসব চিন্তা মাথায় ভিড় করবে, তখনই তা খেলায় প্রভাব ফেলবে। ব্যাটিং করার সময় যদি দলে ডাক পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে চিন্তা করা শুরু করো, তাহলে কখনো তুমি রান পাবে না। তাই আমার লক্ষ্য ছিল শুধু বর্তমান নিয়ে ভাবা, একটি বলের ওপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়া।

কাজের সঙ্গে এভাবে মিশে যাওয়াটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। আমি সফল হতে গিয়ে অন্যকে আঘাত করব না, নিজেকেও যথাসম্ভব রক্ষা করে চলব, এটাই আমার জীবনের নীতি। আমি বিশ্বাস করি যে যা করতে চায়, তাকে তা-ই করতে দেওয়া উচিত। আমি অন্যকে তার কাজ

করতে দেব, নিজেও নিজের কাজ করব এবং একে অপরকে শ্রদ্ধা করব–এমনটিই হওয়া উচিত। আমি যেমন কারও পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই না, কেউ আমার পথে বাধা সৃষ্টি করুক সেটাও আমি পছন্দ করি না। সবার নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং সবার অধিকার বজায় রাখার জন্যই পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র: ওয়েবসাইট
অনুরাধা সেনগুপ্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে লিখেছেন অঞ্জলি সরকার।

শাকিরা: ‘গরিব হয়ে জন্ম নিলে গরিব হয়েই মরতে হয়’

পপগায়িকা শাকিরার খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। শুধু সংগীতশিল্পী হিসেবেই নন, গানের সঙ্গে নাচের উপস্থাপন তাঁর খ্যাতি বাড়িয়েছে বহু গুণে। জগদ্বিখ্যাত এই গায়িকা ১৯৭৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কলম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই বক্তব্য দেন।

সবাইকে ধন্যবাদ এই অসাধারণ, উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য। আমি ১৫ বছর বয়সে স্কুলের পড়াশোনা চুকিয়ে ফেলি। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ওপর একটি

কোর্স করা ছাড়া আর কখনো ক্লাসরুমের দিকে পা বাড়ানো হয়নি। তাই আজ হার্ভার্ডের সীমানায় পা রেখেই মাকে ফোন করলাম, ‘আমি হার্ভার্ডে এসেছি মা!’ মাত্র এক দিনের জন্য, তা-ই বা কম কী!

আমার জন্ম হয়েছে উন্নয়নশীল একটি দেশে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, লাখ লাখ শিশু তাদের শৈশব পার হতে না-হতেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকে যায় আর বাকি জীবনটা এভাবেই কাটিয়ে দেয়। আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় বেড়ে উঠছিলাম, তখন এ সবকিছুই আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি ধরে নিয়েছিলাম—যা কি না সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের ধারণা, যদি কেউ গরিব হয়ে জন্ম নেয়, তবে তাকে গরিব হয়েই মরতে হবে।

আমার চোখে স্পষ্ট ভেসে ওঠে কলম্বিয়ার বারানকিইয়ায় বেড়ে ওঠার দিনগুলোর কথা। আমি অসম্ভব মেধাবী ও প্রতিভাবান অনেক শিশু-কিশোরকে দেখেছি। কিন্তু তারা থাকত রাস্তায়, ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের কোনো আশা ছিল না। আসলে, তাদের জীবনে ভবিষ্যৎ বলে আদৌ কিছু ছিল না! ছোটবেলায় এসব দেখে আমার যত না মন খারাপের হতো, তার চেয়েও বেশি হতো রাগ। পরে বুঝতে পেরেছি, এসব সমস্যার সমাধান আছে। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চেষ্টা করলে ভাগ্য বদলানো সম্ভব। পৃথিবীজুড়ে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হবে, বিশেষত রাজনৈতিক নেতাদের প্রভ্াবিত করা ও সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজানো। কিন্তু তা অসম্ভব নয়।

এসো, সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যাই। আমাদের আইডিয়া আছে, বুদ্ধি আছে, জনবল আছে। সরকারের সম্পদ আছে আর তরুণদের উদ্দীপনা আছে। আমরাই পারব। আমরা যদি পৃথিবীকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে চাই, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই হবে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। ২০ কোটির বেশি শিশু আজও শিক্ষার আওতার বাইরে। এর পরিণাম ক্ষুধা, সহিংসতা, বৈষম্য, যুদ্ধ। কেবল শিক্ষাই এসব থেকে মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। বিশ্বজুড়ে শান্তি স্থাপনের জন্য এটিই সবচেয়ে ভালো কৌশল। আমরা তাহলে বসে আছি কেন?

২০ কোটি শিশুকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার অর্থ ২০ কোটি মানুষকে তাদের পূর্ণ প্রতিভায় বিকশিত হওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া। এই শিশুরা আগামী দিনের বিজ্ঞানী হতে পারত, শিক্ষক হতে পারত, শিল্পী হতে পারত, চিকিৎসক হয়ে লাখো মানুষের সেবা করতে পারত। হয়তো পৃথিবীটাকেই বদলে দিত এই শিশুরা। আমি এমন এক পৃথিবীর

স্বপ্ন দেখি, যেখানে আজকের সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যতের পৃথিবীর বড় বড় আবিষ্কার আর উন্নয়নের নেতৃত্ব দেবে, গোটা পৃথিবীটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি মানবতায় বিশ্বাস করি। মানুষের অসীম সামর্থ্যে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সম্ভাবনার খুব সামান্যই আমরা কাজে লাগাই। এখনো অনেক কিছু করার বাকি আছে।

তবে সবকিছু সরকারের ওপর চাপিয়ে দিলে হবে না। প্রতিদিন যেখানে অসংখ্য শিশু ঝরে যাচ্ছে, সেখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় নষ্ট করার মতো এক মুহূর্ত সময়ও আমাদের হাতে নেই। লাখ লাখ শিশু সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তাদের প্রতিভা বিকাশের কোনো সুযোগ নেই। তাই এর প্রতিকারে সমাজের সবাইকে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শিক্ষা নিয়ে আমার এত উৎসাহের কারণ কী? আমি খুব ভালো করে জানি, শিক্ষায় অল্প একটু বিনিয়োগ কীভাবে একজনের জীবনকে আমূল বদলে দিতে পারে। ১৮ বছর বয়সে আমি কলম্বিয়ায় ‘বেয়ারফুট’ নামে একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তুলি। ১৪ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা সেখানে কাজ করছি। অসম্ভব দরিদ্র, সহিংসতায় পরিপূর্ণ কিছু এলাকায় আমরা স্কুল চালু করছি, ভেঙে যাওয়া পরিবারগুলোর সঙ্গে কাজ করছি। আমাদের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ছয়টি স্কুলের মাধ্যমে ৩০ হাজার পরিবারকে সহায়তা দিচ্ছি, তাদের শিশুদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিচ্ছি। আমাদের স্কুলগুলোর মোট ছয় হাজার শিক্ষার্থীকে পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছি। এটি এমন একটি মডেল, যেখানে স্কুল হয়ে উঠেছে একটি এলাকার প্রাণকেন্দ্র।

এই উদ্যোগ থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি দিনে মাত্র দুই ডলার কীভাবে একটি শিশুর জীবন বদলে দিতে পারে। যেসব শিশুর হয়তো এত দিনে জঙ্গি দলে যোগ দিতে হতো, তারা আজ স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমাদের বুক গর্বে ভরে ওঠে যখন শুনি আমাদের স্কুলেরই কোনো শিক্ষার্থী দেশের মধ্যে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পায়। কয়েক বছর আগে এমন কিছু চিন্তাও করা যেত না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জেনেছি, চাইলে পরিবর্তন সম্ভব। এ আমার নিজের চোখে দেখা, আমি জানি এটি সম্ভব। আমরা সরকারের সঙ্গেও কাজ করি। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমি বুঝেছি বেসরকারি উদ্যোগ কত গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি উদ্যোগে যখন স্কুলের কাজ শুরু হয়, তখন সরকারকে বাধ্য হয়েই এগিয়ে

আসতে হয়। তাই সাধারণ নাগরিকেরা যদি এগিয়ে আসে, তাহলেই রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবিত করা সম্ভব।

আমরা যদি নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করি, তাহলে তারা আরও উদ্যমী, উদ্যোগী হয়ে উঠবে।

পৃথিবীটা এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে, এখন আমরা সবাই একই সমাজের সদস্য। বাংলাদেশ কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার কোনো দেশে যদি একটি শিশুও পেটে খিদে নিয়ে ঘুমাতে যায়, যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোনো অভিবাসী বাবা-মায়ের সন্তান স্কুলে যেতে না পারে, তবে সে দায়ভার আমাদের সবার।

বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করাই হলো পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। পরিবর্তন তোমাদের হাত ধরেই আসবে। পৃথিবীর সামনে নিজেদের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করো। সমাজব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলো।

মনে রেখো, সময় এখন তোমাদেরই।

সূত্র: ওয়েবসাইট।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

নেতা হতে চাইলে - মিশেল ব্যাশেলে

জাতিসংঘের নারীবিষয়ক অঙ্গ সংগঠন 'ইউএন উইমেন'-এর নির্বাহী পরিচালক মিশেল ব্যাশেলের জন্ম ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে। তিনি মার্চ ২০০৬ থেকে মার্চ ২০১০ সাল পর্যন্ত চিলির রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের ২৪ মে ফ্রান্সের প্যারিসে এই বক্তব্য দেন।

শুভ সকাল।

শিক্ষাজীবনের সমাবর্তনের এই দিন আমাদের দুটি দিক চিহ্নিত করে দেয়। আজকে তোমরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সর্বশেষ ধাপ অতিক্রম করে ডিগ্রি অর্জন করেত যাচ্ছ। আজকের দিন কিন্তু তোমাদের আগামী দিনের সূচনা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমিও কিন্তু তোমাদের মতোই একদিন এই রকম বিশেষ দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।

এই পৃথিবীতে আমি ও তোমরা এক পরিবর্তিত সময়ের মধ্যে বাস করছি। সময় এখন আগের থেকেও দ্রুত চলে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাড়া দিতে গিয়ে আমরা বেশ হিমশিম

খাই। এখনই সময়, তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার। এখনকার সময়ে অনিশ্চয়তাই হলো নিশ্চয়তা। সময় একই সঙ্গে তোমাকে সুযোগ করে দেয় আবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

আমরা সমস্যার জালে আটকে আছি। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত আমাদের বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অক্ষমতা, দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি এসব সমস্যা আলোচনায়। কিন্তু বিপরীতভাবে বলা যায়, এসব সমস্যার জন্যই কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। সত্যি করে বলতে গেলে, সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেই সমাধান পাওয়া যায়। আমি বাস্তববাদী এবং তোমাদের নিয়ে আশাবাদী। আমি মানুষের সৃজনশীলতা, শক্তি এবং ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করি। তোমাদের বলতে চাই, পৃথিবীতে এখনো অনেক বড় উদ্যোগ বিকাশ লাভ করেনি। তোমরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সমস্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করো না। রাস্তায় নেমে সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু করে দাও।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এখন বিশ্বে চাকরির বাজারে ধাক্কা দিয়েছে। তরুণেরাই কিন্তু এই ধাক্কার শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই সমস্যা সমাধানে আমাদের যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজতে হবে, যে নেতৃত্ব এই সমস্যা সমাধানে মাথা তুলে দাঁড়াবে। স্বল্পপরিসরে সুযোগ সৃষ্টি না করে আগামী দিনের জন্য বৈষম্যহীনতার পথ তৈরি করা একজন নেতার কাজ। এটা বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। কিন্তু মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেয়ে মহৎ কাজ আর একটিও নেই।

এই কাজ বাস্তবায়নে আমি তোমাদের সাতটি পরামর্শ দিতে চাই। সাত সংখ্যাটিকে কিন্তু অনেকেই সৌভাগ্যের সংখ্যা মানে। এক সপ্তাহে দিনের সংখ্যা সাত, আমাদের বাস সাত মহাদেশে সাত মহাসাগরের পাড়ে। গণিতবিদ পিথাগোরাস পারফেক্ট সংখ্যা বলতেন তিন ও চারকে। কারণ, ত্রিভুজের বাহু তিন, চতুর্ভুজের চার।

আমার প্রথম পরামর্শ হলো, তোমাদের সাধারণ মানুষের কথা শুনতে হবে, তাঁদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে। সাধারণ মানুষের কথা শোনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে। তোমাকে ঘরে আটকে থাকলে চলবে না। আমার দ্বিতীয় পরামর্শ হলো, আগের মতো প্রাসাদে না থেকে তোমাকে এখন প্রকাশ্যে আসতে হবে। সবকিছুতে তোমার অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নেতা হতে হলে তোমাকে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমাকে সর্বজনীন গুণাবলি অর্জন করতে হবে। মানুষের কী প্রয়োজন তা জানতে হবে। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিতে হবে। আমার চতুর্থ পরামর্শ হবে, সমাজের নানা শ্রেণীর, নানা বর্ণের,

নানা ভাষার মানুষ সম্পর্কে তোমার জানাশোনা থাকতে হবে। কাদের কী সমস্যা, তা তোমার জানতে হবে।

তোমাকে সত্যিকারের নেতা হতে হলে সামাজিক মূল্যবোধ ও মানুষকে বুঝতে হবে। এ জন্য তোমাকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নীতি হিসেবে মানবিকতা, নিজের ও অন্যের ওপর আস্থা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

আমি আমার জীবনজুড়ে সাধারণ মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমি আমার দেশ চিলিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনে কাজ করতাম। তারপরে কাজ করেছি সমতা ও ন্যায়বিচার নিয়ে। সেই ধারাবাহিকতায় আমি এখন 'ইউএন উইমেন'-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে নারীদের জন্য কাজ করছি।

আমার কাছে নেতৃত্ব হলো এক রোমাঞ্চকর মহাযাত্রা, যেখানে তোমাকে সব সময় সামনের দিকে তাকাতে হবে। তোমরা যেখানেই যাও, সব সময় তুমি তোমার মন যা চায় তা-ই করবে। ক্ষুদ্র জীবনকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাও।

আমি তোমাদের সর্বময় মঙ্গল কামনা করি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

সূত্র: www.unwomen.org, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: জাহিদ হোসাইন খান

শিক্ষা নিতে হয় ভুল থেকে - ব্রায়ান লারা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা জন্মগ্রহণ করেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগোতে, ১৯৬৯ সালের ২ মে। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫০১ রান ও টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪০০ রানের মালিক লারা।

আমার ধারণা, টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের কারণেই খেলায় তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্য। এর মাধ্যমে দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ক্রিকেটের কদর বেড়েছে আগের থেকে অনেকখানি। এখন পৃষ্ঠপোষকরা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেন। এই পৃষ্ঠপোষকরা কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের জন্য এত আগ্রহী না। এত জৌলুশ, এত আলোকচ্ছটার পরেও টেস্ট ক্রিকেটই এখনো সেই আগের মতোই উঁচু শিখরে অসীন। আমি নিজেকে একজন টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে দেখতেই পছন্দ করি।

আমি ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছি টেস্ট ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছায়। অস্ট্রেলিয়ায় যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে যেত তখন আমাদের ওখানে গভীর রাত হয়ে যেত। আমি রাত জেগে জেগে রেডিওতে খেলার ধারাভাষ্য শুনতাম। বাবা যখন দেখতে আসতেন আমি ও আমার ভাই ঘুমিয়েছি কি না, তখন আমি রেডিও লুকিয়ে নাক ডাকার ভান করতাম। টি-২০ খেলার বেশ কিছু ভালো দিক আছে। এর মাধ্যমে ক্রিকেটাররা ছয় সপ্তাহে তিন কোটি ডলারা পর্যন্ত

উপার্জন করতে পারে। ক্রিকেটের মহারথীদের একজন ভিভ রিচার্ডস। তিনি ২০ বছর ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই তিন কোটি ডলার উপার্জন করতে পারেননি। আমি মনে করি, টেস্ট ক্রিকেট ও টি-২০ একসঙ্গে চলতে পারে। আমরা খেলার সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। কিন্তু এখন অনেকে আছে, যারা ক্রিকেট খেলা কী তা জানে না। যারা কখনোই ক্রিকেট খেলা দেখেনি, তাদের জন্য টি-২০ বেশ উপভোগের। যারা আগে টেস্ট ক্রিকেট দেখত, এখনো তারা টেস্ট খেলা উপভোগ করে। টি-২০ নতুন ধরনের দর্শক তৈরি করেছে। আমি যদি আগামীকাল সকালে উঠে দেখি টেস্ট ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে আমি ভীষণ কষ্ট পাব।

আমার ব্যাটিং স্টাইল কখনোই নির্ভুল নয়। আমারও খুঁত আছে। জীবনে অনেকবার আমি টের পেয়েছি আমার ব্যাটিংয়ে খুঁত আছে। কিন্তু আমার বড় একটি সুবিধা আছে। আমি খুব দ্রুতই আমার ভুলগুলো শুধরে নিতে পারি। যে মৌসুমে ক্রিকেট খেলা থাকত না সেই মৌসুমে আমার ভুল শোধরানোর জন্য মাঠে সারাক্ষণ পড়ে থাকতাম। আমি ২২ গজের পিচকে বাড়ি বানিয়ে ফেলতাম। আমি স্পিন বলে বেশ ভালো খেলি। কারণ, ত্রিনিদাদে ছোটবেলা থেকেই আমি স্পিন বল খেলতাম বেশি। আমাদের ওখানে ব্রিটিশ আমলে ভারত থেকে অনেক মানুষ অভিবাসিত হয়, যার কারণে ভারতীয়দের মতো ত্রিনিদাদের লোকজন স্পিন বোলিংয়ে ভালো করে। কিন্তু বারবাডোজ, জ্যামাইকার লোকজন দ্রুতগতির ফাস্ট বোলিং করতে অভ্যস্ত ছিল। আমি ওখানেও মানিয়ে নিয়েছিলাম। আমার দেখা সেরা ফাস্ট বোলার ছিল ওয়াসিম আকরাম আর স্পিনে শেন ওয়ার্ন। মুরালিও বেশ ভালো বোলিং করে। আমাকে শেন ওয়ার্ন ও মুরালির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বললে আমি ওয়ার্নকেই বেছে নেব। মুরালির থেকে ওয়ার্নি বেশ স্থিরভাবে বোলিং করত। ফাস্ট বোলার হিসেবে ওয়াসিম আকরাম ছিল দুর্ধর্ষ। আমার ১৯৯২ সালের কথা মনে আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের খেলার কিছুদিন আগে আমাকে জানানো হয় আমি ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করব। কিন্তু আমি তো সচরাচর ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করি না। আমাকে কেউ কিছুই জানায়নি। আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম। বল নিয়ে সুইং করতে পারাটা যে কত খানি ভয়ংকর হতে পারে তা আকরাম জানত। গর্ডন গ্রিনিজ আমাকে ফাস্ট বোলার মোকাবিলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আকরামের মতো ফাস্ট বোলারকে মোকাবিলা করার জন্য বোলিং প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকাটাই নিরাপদ। সে জন্য আমি প্রথম বলেই এক রান

নিয়ে বোলিং প্রান্তে চলে যাই। কিন্তু ছক পাল্টে যায়, যখন গর্ডন গ্রিনিজ নিজেই এক রান নিয়ে আমাকে পুনরায় ব্যাটিংয়ে পাঠান। সেই ওভার যে কীভাবে শেষ হয়েছিল আমার মনে

নেই। আমি ওভার শেষে গর্ডনকে ধরলাম, কেন আমাকে সে বিপদে ফেলল। গর্ডনের নীরস উত্তর ছিল, ‘আমি যা বলি সেটা আমাকে শুনতেই হবে, এমন কোনো কারণ কি আছে?’ আমি প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম, ‘বেঁচে ফিরতে পারলে আমি আর জীবনেও ওপেনিং করব না।’

আমার আরেকটি ঘটনা সব সময় মনে পড়ে। ক্রিকেটার ম্যালকম মার্শাল ক্রিকেটের অন্যতম সেরাদের একজন। ১৯৯১ সালে স্থানীয় এক ক্রিকেট ম্যাচে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বোধ হয় সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম। তিনি যখন বোলিং করতে আসেন, আমি তাঁর বলে একটি ছক্কা হাঁকাই। ম্যালকম শুধু আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মুখে আমি স্পষ্ট লেখা দেখেছিলাম, আমার শেষ তিনি দেখেই ছাড়বেন। বছর খানেক পরে তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় এক ক্রিকেট ম্যাচে। সে ম্যাচে তিনি আমাকে আমার শেষ একটু হলেও দ্েখিয়ে ছেড়েছিলেন। ভাগ্যিস আমি হেলমেট পরেছিলাম। নইলে তাঁর বল কখন আমার মাথা ছাতু করে দিয়ে চলে যেত। দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষায় আমি কখনোই বসে থাকি না। তার ওপর, আমাদের জীবন কোনো নাট্যমঞ্চ নয় যে এখানে মহড়ার সুযোগ আছে। আমাকেই আমার জীবন নিয়ে বাঁচতে হবে। আমাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে সেই আগের মতো ধার নেই। আমার মতে, এই সমস্যার মূল কারণ হলো আমাদের ক্রিকেট প্রশাসন। আমাদের ক্রিকেটারদের প্রশাসন তেমন সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের তুলনায় আমাদের ক্রিকেটাররা বঞ্চিত। ১৯৯৬ সালে যখন শিবনারায়ণ চন্দরপল ক্রিকেট জগতে পা রাখে, তখন তার আর রিকি পন্টিংয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। দুজনেই ভালো ক্রিকেটার। কিন্তু শিব পন্টিংয়ের মতো উন্নত সুযোগের অভাবে সেরা ক্রিকেটারদের দলে নাম লেখাতে পারেনি। আমার মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজেই বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী ক্রিকেটাররা খেলে। কিন্তু অন্য দেশ যেখানে সাধারণ ক্রিকেটারদের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তোলে, আমরা সেখানে সেরা ক্রিকেটারদের সাধারণ মানে নামিয়ে দিই।

১৯৮৯ সালে আমি যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দলে ক্রিকেট খেলা শুরু করি, তখন আমি ছিলাম ১৯ বছরের তরুণ। আমি আমার চোখে নায়ক ক্রিকেটার ভিভ রিচার্ডস, গ্রিনিজদের সঙ্গে খেলার সুযোগে ছিলাম অভিভূত। আমি চিন্তা করেছিলাম, তাঁরা আমার কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দেবেন। কিন্তু বাস্তবে আমি তাঁদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাইনি। কারণ, এই ক্রিকেটাররা তখন ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ পর্বে ছিলেন। নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছিলেন।

আমাকে সবাই আমার সেরা ইনিংসটির কথা জিজ্ঞেস করে। আমার সেরা ইনিংসটি খেলেছিলাম জ্যামাইকার কিংস্টনে। সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলের অবস্থা তেমন সুবিধার ছিল না। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমরা ২-২-এ টেস্ট সিরিজ ড্র করি। আমিি একটি দ্বিশতক ও তিনটি শতকের মাধ্যমে ৫৪৬ রান করেছিলাম সেবার। কিংস্টনে আমি ২১৩ রান করেছিলাম। আমার সব সময়ের চেষ্টা ছিল ধারাবাহিকভাবে খেলে যাওয়া। আমি সব সময়ই চেষ্টা করতাম আমার দল যেন আমার ওপর ভরসা রাখতে পারে। আমি সবকিছুতে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যাই। আমিও মাঝে মাঝে ভীষণ বড় আকারের ভুল করে থাকি। কিন্তু ভুলগুলোকে অবহেলা করা চলবে না। আমি সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিই।

৭ নভেম্বর ২০১১ সালে থার্ডম্যান ক্রিকেটকে দেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে লিখেছেন জাহিদ হোসাইন খান

নিজের হাতেই সমাধান - জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের জন্ম ১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পররাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। জাপানের কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১ সালের নভেম্বরে তিনি এ বক্তব্য দেন।

উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ। আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি মাত্র পাঁচ বছর হলো রাজা হয়েছি। এই অল্প সময়ের অভিজ্ঞতা আমি তোমাদের বলতে চাই।

প্রথম থেকে আমার একটাই চিন্তা ছিল, কীভাবে ভুটানের মতো দেশে ভালো রাজা হওয়া যায়। আমরা এমন একটি সময়ের অন্তর্জালে আটকানো, যার গতিশীলতা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। একটি দশকের সঙ্গে পূর্ববর্তী দশকের মিল খুঁজে পাওয়াই এখন বেশ কষ্টকর। আজ যা আমরা দেখি, তা গতক্‌াল হয়তো বা জানার বাইরে ছিল। মুঠোফোনের কথাই চিন্তা করে দেখো। জীবনের প্রতি মুহূর্তের নানা ঘটনা স্মৃতি হিসেবে মুঠোফোনে সংরক্ষণ করি আমরা। নানা প্রয়োজনে আমরা বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের খুদে বার্তা প্রেরণ করি। এটি কতই না কাজের। অথচ আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন এ ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি শুধু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেই দেখা যেত। তোমরা মুঠোফোন ছাড়া জীবন কি চিন্তা করতে পারো? কিন্তু কে বলতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অন্য কিছু মুঠোফোনের জায়গা দখল করে নেবে।

আমি সব সময় চিন্তা করি, আমাদের প্রজন্ম কী করছে? আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য কী রেখে যাচ্ছি? বৈচিত্র্য আর পরিবর্তনে ভরা আমাদের এই পৃথিবী। বিশ্বায়নের কারণে এই পৃথিবী এখন বড় আকারের একটি গ্রামের মতো।
আমরা যেখানেই থাকি না কেন, পৃথিবীজুড়ে যেসব সমস্যা দেখা যায়, তার সব কটির বিরুদ্ধে আমাদের সমানভাবে মোকাবিলা করতে হয়। সমস্যা সমাধানে অন্যদের যেন উপকার হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে সমাধান খুঁজতে হবে। এই পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কী ঘটছে, তার প্রতি আমাদের খেয়াল রাখা জরুরি। আমাদের চারপাশের পরিবেশের কথা তোমাদের জানাতে পারি। সমুদ্রের বিভিন্ন হিমবাহ দ্রুতগতিতে গলে যাচ্ছে, বরফের পুরুত্ব কমছে আশঙ্কাজনকভাবে। জলবায়ু পরিবর্তন হুমকির মুখে ফেলছে সমগ্র মানবজাতিকে। প্রতি সেকেন্ড আমরা ধ্বংস করছি ফুটবল মাঠের সমান আকারের বনভূমি। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ আজ পানির কষ্টে আছে। ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশের মধ্যে পার্থক্য বাড়ছে। ২৪ হাজার শিশু মারা যাচ্ছে প্রতিবছর। দরিদ্র দেশগুলো দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় ঘুষের পরিমাণ বছরে চার কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। চিন্তা করে দেখো, এসব বাধা কীভাবে দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করে। ১১ কোটি শিশু প্রতিবছরই অপুষ্টি ও রোগাক্রান্ত হচ্ছে। ৪০ কোটির বেশি লোক মরণব্যাধি এইডসের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত।

এর উল্টো দিকে আমরা কী দেখি? ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলো প্রতিবছরই বাড়াচ্ছে তাদের সামরিক খাতে ব্যয়। দরিদ্র দেশগুলোয় শাসকেরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বৈষম্য ও বিক্ষোভ বাড়ছে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত। বৈশ্বিক সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। শুধু বেড়েই চলছে না, প্রতিনিয়ত প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে একেকটি সমস্যা।

আমি খুব সংক্ষেপে একটি কথা বলতে পারি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা অনেক অভিনব আবিষ্কার, উদ্যোগ ও শিল্পের কারিশমা দেখতে পাই; যার কারণে আমাদের পৃথিবীরই উপকার হচ্ছে। এ জন্য আমরা জীবনমানকে পূর্ব প্রজন্ম থেকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু তার পরও আমরা অনেক বড় বড় বৈশ্বিক সমস্যায় জর্জরিত। সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে আমাদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যা সদা বহমান। যত দিন না আমরা সমস্যা সমাধান করব, তত দিন সমস্যা বাড়তেই থাকবে। তো আমরা যখন এই সমস্যার সন্ধান পাব, তখন কী করব?

সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের শুধু রাজনীতিবিদ বা নেতাদের জন্য বসে থাকা চলবে না; সমাধান আমাদের সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে নিতে হবে। সারা পৃথিবীর নাগরিকেরা একত্র হলে সেটা হবে আমাদের জন্য বড় একটা শক্তি। এই শক্তির ভিত্তি হবে মানবতা।

আমরা আমাদের প্রজন্ম নিয়ে অনেক প্রত্যাশা করি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, নজরকাড়া উন্নয়ন ও অতীতের শিক্ষা নিয়ে এই প্রজন্মই খুঁজে বের করতে পারে সব সমস্যার সমাধান। মানবতানির্ভর সামাজিক বিপ্লব আনার যোগ্যতা আছে এই প্রজন্মের সদস্যদের। এদের মাধ্যমে তৈরি সম্ভব টেকসই উন্নয়ন।

আমি জানি, যতই দিন যাবে, ততই তোমরা সাধারণ মানুষের জন্য অসাধারণ সব কাজ করবে।

তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: জাহিদ হোসাইন খান

পরিশ্রম আনে সাফল্য – পামেলা মরগ্যান

কানাডার বিখ্যাত পপ গায়িকা পামেলা মরগ্যান। জন্ম ২৫ নভেম্বর ১৯৫৭। লোকসংগীতে অবদানের জন্য ২০০৭ সালে কানাডার মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন।

কয়েক মাস আগে যখন আমি মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি চিঠি পাই, তখন চিৎকার করে উঠেছিলাম। চিঠিটা পড়ে আমি এতটাই বিস্মিত হয়েছিলাম যে তার রেশ এখনো আমার মধ্যে রয়ে গেছে। এমন একটি আলোকিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্মান লাভ করে আমি আজ শিহরিত হচ্ছি।

আমি জানি না 'ডক্টর মরগ্যান' বলে আমাকে সম্বোধন করলে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব কি না!

আমি পৃথিবীর উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে খুব কম জানি। তোমা যারা এই মুহূর্তটির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছ, তাদের আমি অভিনন্দন জানাই।

আমার বাবা রে মরগ্যান সব সময় চাইতেন, আমি যেন মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি খুবই সন্তুষ্ট ও সম্মানিত বোধ করছি তাঁর স্মৃতির কথা বলে। আমি আমার পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এখানে আসার জন্য।

আমি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ভ্রমণ করে পার করেছি। কিছু অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। ১৯৭৪ সালে আমি গ্র্যান্ডফল একাডেমি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি। স্নাতকের পর আমি আমার এলাকার আধুনিকায়ন নিয়ে ভাবি। আমরা প্রাকৃতিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করে সবজি জন্মাতাম। প্রয়াত প্রখ্যাত বেহালবাদক এমিল বেনইটের একটি স্মৃতি মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ি নতুন করে সাজাতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাদের পুরোনো আসবাব নিয়ে সেগুলো অন্য কাজের জন্য উপযোগী করেছিলেন।

পরিবেশের দিক থেকে আমরা এখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন দেশগুলোর একটি। আমাদের এখনো আছে বিশুদ্ধ পানি, রসাল ফল, মাছ, পরিষ্কার বাতাস এবং পশুপাখির জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে বনাঞ্চল। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই আমাদের এই স্বর্গকে আবিষ্কার করছেন এবং এখানে সম্পদ কিনছেন।

আমার বাবা এটা বলতে পছন্দ করতেন যে শীতকাল না থাকলে গ্রীষ্মকাল আসবে না। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। আমাদের এলাকার কৌতুকপ্রিয়তা, গান, রসবোধ সর্বজনবিদিত। আমি বিশ্বাস করি, এই রসবোধ আমাদের মধ্যে থাকবে। আমাদের দরকার মুক্তি, যা কেবল আনন্দদায়ক গানই দিতে পারে।

শিল্প ও শিল্পীদের এই সমাজে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলা। আমি প্রায়ই শুনে থাকি যে জনগণ দুর্যোগ থেকে পালাতে যায়। কেননা, তারা কোনো কিছুর বিষয়ে ভাবতে বা মনোযোগ দিতে চায় না, এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমাদের এটার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে যে সমস্যা থেকে পালানো মানে নিজের জন্য নিজের খাঁচা তৈরি করা।

আমাদের নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাবরেডরের অধিবাসীদের রয়েছে গল্প বলার সংস্কৃতি ও দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন। আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সংস্কৃতিকে প্রতিপালন ও সম্মান দেখানো প্রয়োজন। আমাদের কবিতা পাঠ, গান শোনা, নাটক ও চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজন।

সেই সঙ্গে অপরিচিত শিল্পীর চিত্রশিল্প কেনা, একে অপরের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের জীবন, আশা, স্বপ্ন, পরিবার ও আমাদের সংস্কৃতি যেন মার্কিন টেলিভিশনের প্রভাবে জড়তাগ্রস্ত না হয়ে যায়।

যেসব স্নাতক শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে এসেছ, অনুগ্রহ করে আমার এলাকার স্মৃতি বহন করে নিয়ে যেও। তোমাদের সবাইকে আবারও আমার শুভেচ্ছা রইল। তোমরা কাজের জন্য যে ক্ষেত্রই পছন্দ করো না কেন, সেখানেই সফলতা পাও, এই শুভকামনা রইল। আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমই পারে তোম্াকে তোমার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

আর আমি যদি কোনো পরামর্শ দিতে পারি, তা হলো যাও, বিশ্বটাকে দেখো। এটা তোমাকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কিন্তু সব সময় মনে রেখো, এই জায়গায় রয়েছে তোমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের গ্রামকে নতুনভাবে তৈরি করতে এখানে তোমাদের মতো সেরা ও বুদ্্ধিমানদের আরও বেশি প্রয়োজন। আমাদের সেসব তরুণ স্বপ্নচারীর দরকার, যারা তুলনামূলকভাবে কম পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করবে, চিকিৎসাসেবা দেবে। নিজের উদ্যোগে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করবে। সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে হবে তাদের। তারাই তো আগামী দিনের যোদ্ধা।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: লামিয়া ইসলাম

সমালোচক হচ্ছে দরকারি বন্ধু - হিলারি ক্লিনটন

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি রডহাম ক্লিনটনের জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটিতে ১২ জুন ২০১২ তিনি এই বক্তব্য দেন।

শুভ অপরাহ। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে হয়তো আয়ারল্যান্ডে এটাই আমার শেষ সফর।

আজ আমি মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামের চারটি সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে কথা বলব। প্রথমেই আসে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের অধিকারের বিষয়টি। গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী যেখানে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমন অস্থির ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ সময়ে অনেক স্থানেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পুরোনো শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। এতে শুধু নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর জন্যই বিপদ নেমে আসছে তা নয়, বরং গোটা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সামাজিক কাঠামো তখনই শক্তিশালী বলে গণ্য হয়, যখন তা শুধু সবলের অধিকার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট না হয়ে দুর্বলের জন্যও সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

বছর দুয়েক আগে মিশরের কায়রোর রাস্তায় তরুণেরা সত্যিকারের পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের অধিকার আছে স্বচ্ছ, উদারমনা, পক্ষপাতহীন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা পাওয়ার। মিসরের পরিস্থিতি আমাদের কাছে এটাই প্রমাণ করে যে সময় এসেছে আলোচনার মাধ্যমে রক্তপাতহ্ীন, শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজে বের করার।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ইন্টারনেটে তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা। ১০ বছর আগে হলে আমি হয়তো একে প্রথম চারটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতাম না, কিন্তু এই এক দশকে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। চীন, রাশিয়া থেকে শুরু করে ভারত, ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়া–এই দেশগুলোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেমন খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশদূষণ ও দুর্নীতি নিয়ে জনগণের হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অনেক আগে আমি যখন প্রথম রাজনীতিতে জড়িত হই, তখনই শিখেছিলাম যে সমালোচনাকে গ্ুরুত্বের সঙ্গে নিতে হয়, তবে কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নয়। আমাদের জানতে হবে সমালোচনা থেকে কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্যই সব সমালোচনা যৌক্তিক হয় না, সঠিকও হয় না। কিন্তু সমালোচকেরা অনেক সময় আমাদের সবচেয়ে দরকারি বন্ধুর ভূমিকা পালন করে।

আর এ ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহ দরকার, কারণ আজকের দিনে ইন্টারনেটেই অগণিত আলোচনা-সমালোচনা চলছে। ২১ শতকের সর্বজনীন প্ল্যাটফর্ম বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা ইন্টারনেট ছাড়া আর কিছু নয়। মত প্রকাশের অধিকার একটি সর্বজনীন ব্যাপার, তা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আড্ডায় বসে হোক, আর ফেসবুক পেজে হোক। স্বাধীনতা সব ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় ইস্যুটি হলো সুশীল সমাজের ভূমিকা। সমাজের সেই সব মানুষ, যাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং সরকারকে সঠিক দিকে পরিচালিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা প্রতিটি দেশেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেসব দেশে অস্থিরতা বিদ্যমান, জনগণের ভবিষ্যৎ যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে সুশীল সমাজের সক্রিয় কার্যক্রম এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটা সত্যি যে রাষ্ট্রব্যবস্থার বাইরে থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা কিংবা অবকাঠামোগত সংস্কার করার সুযোগ অনেকাংশে সীমিত। অনেকে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েও নাগরিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেন। আন্দোলনকারী ও সাংবাদিকেরা অনেক সময় হুমকির মুখে পড়েন, জেল-জরিমানা সহ্য করেন, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কাও থাকে। তবুও, সুশীল সমাজ সব সময়ই

নিপীড়নকারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। সুশীল সমাজ নাগরিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে জনগণ সরকারের জন্য নয়, সরকার জনগণের জন্য। এটি জনগণকে অধিকার আদায়ে একত্র করে।

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো নারী অধিকার। একে গত শতকের ফেলে রাখা কাজ বললে অত্যুক্তি হবে না। দেশের অর্ধেক জনগণকে অবজ্ঞা করে বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো গণ্য করে সবল অর্থনীতি কিংবা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাটাও বোকামি। কিন্তু অনেক দেশে এটাই বাস্তবতা, এমনটাই ঘটে চলছে নারীদের সঙ্গে।

তাদের রাজনৈতিক অধিকার নেই বললেই চলে, তারা ঘরে-বাইরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা নেই, বেঁচে থাকাই যেন তাদের জন্য বড় পাওয়া। অনেক মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা খেলার পুতুল কিংবা পণ্য, মানুষ নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত যে নারীদের যদি সমান অধিকার ও সম্মান দেওয়া হতো, তাহলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হতো। শুধু নির্যাতনের ঘটনা কমে আসত না, সঙ্গে সঙ্গে সরকারব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতো।

আমি নিজে একজন মেয়ের মা এবং নারী-পুরুষ সম-অধিকার ও সমান সুযোগে বিশ্বাসী একজন মানুষ। আমি অত্যন্ত দুঃখবোধ করি, যখন আমি কোথাও যাই এবং পুরুষ নেতারা আমাকে আলাদা করে দেখে কিংবা আমাকে গুরুত্ব দেয় এই কারণে যে আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। হয়তো সেদিন খুব দূরে নয়, যখন কন্যাসন্তানেরা পুত্রসন্তানের মতো যত্ন পাবে, মেয়েরা ছেলেদের সমান পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে, নারীরা পুরুষদের মতো পরিবার ও সমাজে নিজেদের অবদান রাখতে পারবে।

আমি যেসব অধিকারের কথা তুলে ধরলাম, সেসব আদায় করা সহজ নয়। আমাদের লেগে থাকতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। এ কাজগুলোর জন্য তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। তোমাদের সব আছে– প্রতিবাদী কণ্ঠ, ভোট দেওয়ার অধিকার, শিক্ষা, বুদ্ধি ও বিবেচনা। এ সংগ্রামের নেতৃত্ব তোমাদেরই দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা এক ছোট্ট মেয়ে হিসেবে আমি যে স্বপ্ন দেখতাম, আমি তারচেয়ে অনেক বেশি পথ পাড়ি দিয়েছি, অনেক বেশি দেশ ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি। এসব দেখে আমি বুঝেছি যে পৃথিবীজুড়ে মানুষের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই

বেশি। আমি বিশ্বাস করি, এই চেতনা তোমাদের জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে, সামনের দিনগুলোতে আশার আলো জোগাবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

দিনটা হাসি দিয়ে শুরু হোক - সালমান খান
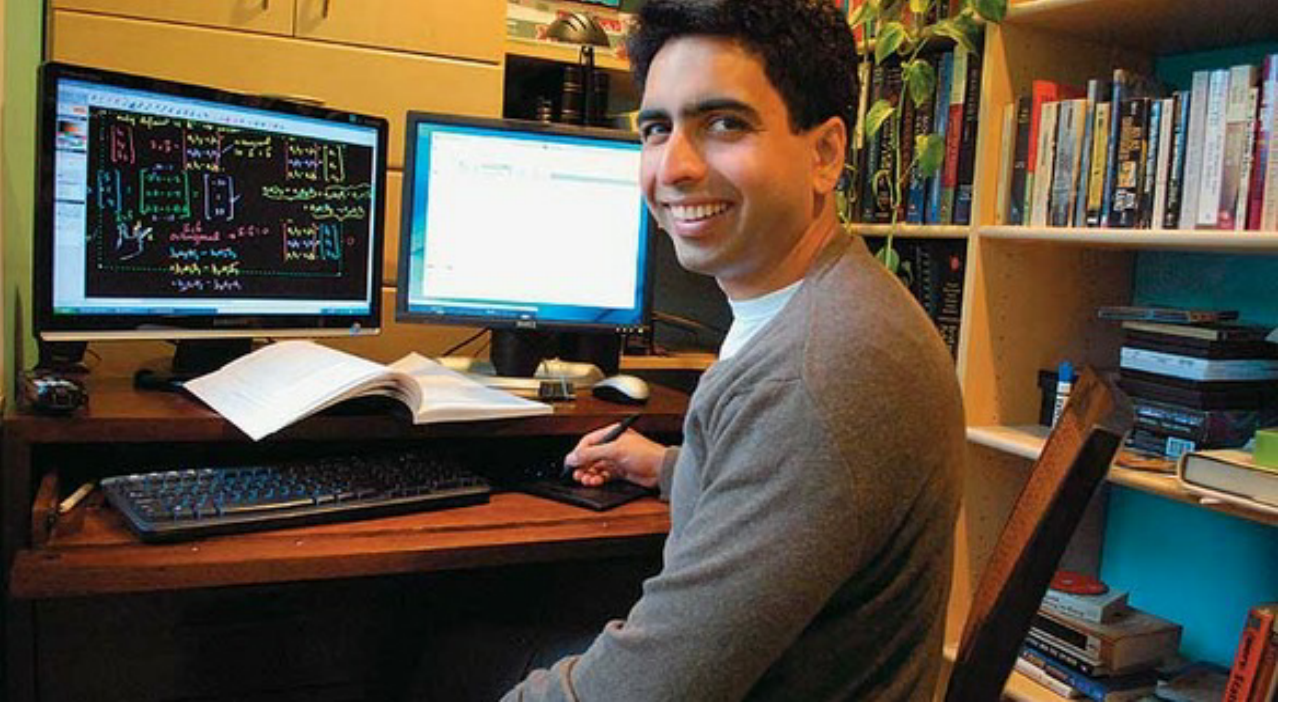
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সালমান খানের জন্ম ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে। শিক্ষামূলক অনলাইন ভিডিওর উদ্ভাবক হিসেবে সালমান বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। ২০১২ সালের ৮ জুন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) ১৪৬তম সমাবর্তনে তিনি এই বক্তব্য দেন।

আজকে এখানে আসতে পেরে আমি অসম্ভব সম্মানিত বোধ করছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে শুধু আমার জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বছর কাটিয়েছি, তাই নয়, বলা যেতে পারে, আমার

জীবনকে গড়ে দিয়েছে এমআইটি। আজকে খান একাডেমি সৃষ্টির পেছনে এমআইটির অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। তবে এমআইটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু অনুপ্রেরণার নয়, আরও বেশি কিছু। আমার অনেক কাছের বন্ধুরাই এখানকার প্রাক্তন শিক্ষার্থী। আমার স্ত্রীও তাদেরই একজন। এখন খান একাডেমির যিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি ছিলেন আমার ফার্স্ট ইয়ারের রুমমেট। তাঁর স্ত্রীও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এমআইটির বন্ধুদের শতকরা ৯০ ভাগই নিজেদের মধ্যে বিয়ে করেছে। আমি সব সময় বলি, এমআইটি হচ্ছে পৃথিবীর বুকে হ্যারি পটারের জাদুর স্কুল হগওয়ার্টস। এখানে যে উদ্ভাবনাগুলো জন্ম নেয়, তা জাদুর চেয়ে কিছু কম অবাক করা নয়। সারা পৃথিবী থেকে সম্ভাবনাময় তরুণেরা এখানে আসে। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষকেই স্বাগতম জানায় এমআইটি। কেউ আসে বিপুল সম্পদশালী পরিবার থেকে, আবার অনেকের জীবনের ইতিহাস চরম দারিদ্র্যের। আমরা বুঝতে পারি এমআইটি হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে এক অন্য উচ্চতায় উঠতে পারব।

নেতিবাচক জিনিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার জন্য, এই পৃথিবীতে তোমার নিজের ও চারপাশের মানুষের জীবনে সুখ বয়ে আনার জন্য আমি তোমাদের কিছু পরামর্শ দিতে পারি। প্রথমত, প্রতিটি দিন হাসি দিয়ে শুরু করো, জোর করে হলেও হাসতে চেষ্টা করো—একসময় সত্যিই তুমি অনেক ঝামেলার মধ্যেও খুশি থাকতে শিখে যাবে। ‘আমাকে করতে হবে’ এমনটা না বলে বলো, ‘আমি করব’, আগ্রহ আর উদ্যোগকে নিজের অন্তরের ভেতর থেকে আনতে চেষ্টা করো। প্রতিদিন যাদের সঙ্গে দেখা হয়, সবার সঙ্গে হাসিখুশি থাকো, শুধু ঠোঁটে নয়, তোমার চোখ, কান, মুখ, সারা শরীরে যেন সেই হাসির ছোঁয়া লেগে থাকে। নিজেকে ইতিবাচক চিন্তা আর শক্তির আধারে পরিণত করো। বিশ্বাস করো, নদীর ওপারের ঘাস নয়, বরং তুমি যে পারে আছ, সেদিকের ঘাসের রংই বেশি সবুজ। এই বিশ্বাসটুকুই তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে।

যখন খুব চাপের মধ্যে থাকবে, সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়বে, তখন মনে করো, এটা একটা গভীর কৌশলের খেলা। এখানে সেই জিতবে, যে নিজের চিন্তাকে সঠিকভাবে কেন্দ্রীভূত করে যেখানে দরকার, ঠিক সেখানেই মনোযোগ দিতে পারে। সংকটের মুহূর্তে আবেগ কিংবা অহংবোধ যাতে তোমার যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে না পারে। যখন দেখবে তোমার কাছের মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেছে, নিজের আত্মমর্যাদাকে ক্ষণিকের জন্য বিসর্জন দিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কটাকেই বড় করে দেখো। যখন সংঘাত চরমে পৌঁছে, তখন তোমার ভেতরের গর্বিত, আত্মাভিমানী সত্তা তোমাকে যা করতে প্ররোচনা দেয়, ঠিক তার উল্টো

কাজটিই করো। যদি পারো, নিজের মনকে একটু সংযত করে, ঝগড়ারত বন্ধুটিকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরো। তাকে বোঝাও, তুমি যে তোমার কাছে কতটা মূল্যবান, কতটা প্রিয়। যখন কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে লাভ কিংবা ক্ষতি হয়, মনে রেখো, এসবই ক্ষণস্থায়ী। তোমার সুস্বাস্থ্য কিংবা প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের তুলনায় এসব কিছুই নয়।

যখন কোনো কিছু অসহ্য লাগবে, রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো। একবার ভাবতে চেষ্টা করো, ওই তারাগুলো কতদূরে, কত অসীম এই মহাকাশ, কতকাল আগে সৃষ্টি হয়েছিল এই মহাবিশ্ব! অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে একবার ভেবে দেখো তোমার মতো আরও কত মানুষ, জানা-অজানা কত প্রাণী ঠিক তোমার মতোই বিস্ময় নিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়তো এখনো আছে। কোনো নির্জন স্থানে চলে যাও, নিজের নাম, চিন্তা, ব্যস্ততা, দায়িত্বের বোঝা সব ভুলে গিয়ে নিজের ভেতরের সত্তার দিকে একবার তাকাও। একবার ভেবে দেখো, এই অনন্ত মহাবিশ্বের শূন্যতায় কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো, এত যে দুশ্চিন্তা তারই বা মূল্য কতটুকু! মনের ভেতর থেকে যখন সুখী হতে পারবে, শান্তি পেতে পারবে, তখন বুঝবে সেটাই প্রকৃত সাফল্য। এসব কখনো অর্থ, বিত্ত, সামাজিক মর্যাদা এমনকি প্রশংসা থেকেও আসে না।

একটা কথা জেনে রেখো, জীবনসঙ্গী হিসেবে কাকে বেছে নিচ্ছো, তা তোমার ক্যারিয়ারের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি এমন কাউকে পাও যে তোমার মন খুশিতে ভরিয়ে দিতে পারে, যার সঙ্গে তোমার মূল্যবোধ মিলে যায়, যে তোমাকে সম্মান করে, তোমার বাইরের সবকিছু, সাফল্য, ব্যর্থতা–সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে শুধু মানুষটি তুমি বলেই তোমাকে ভালোবাসে; তাহলে পৃথিবীর কোনো কিছু তোমাকে অসুখী করতে পারবে না।

আমি বলব, কখনো কোনো কিছুতে উৎসাহ পেলে, সোজা কাজে লেগে যাও। কাউকে উল্টোপাল্টা কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের মতো কাজ শুরু করো, অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখ। অলসতা, অহংকার অথবা ভয়–এসব কিছু যাতে কখনো তোমাকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা থেকে দমিয়ে রাখতে না পারে। নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলো, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের পছন্দের কাজগুলো করতে ভুলে যেয়ো না। শুধু একটি পদমর্যাদা, বা বিশাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মালিকানাই তোমার সবকিছু নয়। তুমি নৃত্যশিল্পী, তুমি কবি, তুমি আবিষ্কারক, তুমি উদ্ভাবক! নিজের শখের জিনিসগুলোকে জীবনে জায়গা করে দিলে সেগুলো তোমাকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাবে।

২০১২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা, আমাদের তরুণ জাদুকরের দল, ভেবে দেখো, এই দ্বিতীয় জীবন নিয়ে তোমরা কী করবে!

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে: চেতন ভগত
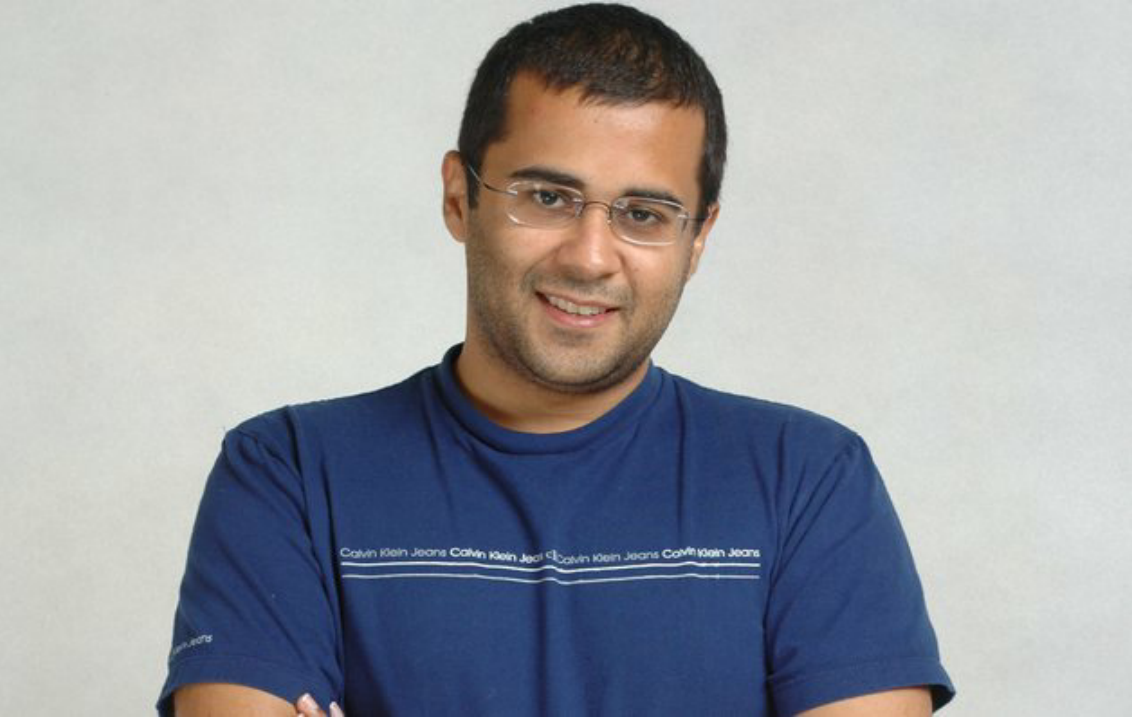
থ্রি ইডিয়টস চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে চেতন ভগতের উপন্যাস অবলম্বনে। চেতন ভগত সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। জন্ম ভারতের নয়াদিল্লিতে, ১৯৭৪ সালের ২২ এপ্রিল। বই লেখার পাশাপাশি তরুণদের জন্য উৎসাহমূলক বক্তৃতা করেন তিনি। চেতন ভগত ২০০৮ সালের ২১ নভেম্বর দিল্লিতে হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে এই বক্তৃতা দেন।

আমি নেতা নই। আমি একজন স্বপ্নচারী মানুষ যে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে জানে। আজ আমি বলতে এসেছি কীভাবে দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা জাতির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আগে আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। ভেবে দেখো, সবাই সুখী, ধনী আর সফল প্রতিবেশীর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে চায়, তাই না? যে পরিবারে সব সময় দ্বন্দ্ব আর ঝগড়া লেগেই থাকে, তাদেরকে সবাই এড়িয়ে চলে। জাতির ক্ষেত্রেও ঠিক একই নীতি প্রযোজ্য। আমাদের মধ্যে অসংখ্য সমস্যা আর বিভেদ। তবে আজ আমাদের প্রশ্ন এটা নয় যে এই সমস্যার দায় কার। আমাদের প্রশ্ন, কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হবে?

এমন দেশ গড়তে হবে যেখানে সবাই নিজের যোগ্যতা, উদ্যম আর পরিশ্রম দিয়ে উন্নতি করতে পারবে। যেখানে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, তুমি কোথা থেকে এসেছ, সবাই জানতে চাইবে, তুমি কোথায় যচ্ছে। আমরা সবাই এমন দেশের স্বপ্ন দেখি।

এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অনেক কিছু করতে হবে এবং রাজনীতিবিদদের দোষ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমি মনে করি, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারা অবশ্যই বদলাতে হবে, শুধু জনগণ নয়, নেতাদেরও একই কাজ করতে হবে। এগুলো হলো, ভেদাভেদের রাজনীতির বদলে ঐকমত্যের রাজনীতির প্রচলন করা, আভিজাত্যের খোলস ছেড়ে জনতার কাতারে মিশে যাওয়া এবং ব্যবহারিক ইংরেজির চর্চা করা।

প্রথমে রাজনীতির কথায় আসি। আমি পাঁচ বছর ধরে ভারতের তরুণদের পর্যবেক্ষণ করছি। শুধু বড় শহরগুলোতে নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে তাদের গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি। আমাদের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশজুড়ে আছেন এই তরুণেরা, এঁরাই প্রকৃত ভোটব্যাংক। কিন্তু রাজনীতিবিদদের ভাষণে তরুণদের স্বপ্ন প্রতিফলিত হয় না। নেতারা এখন পুরোনো আমলের দেশপ্রেমের বুলি কপচান আর ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি সংস্কারের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কিন্তু তরুণেরা আসলে কী চান? তাঁরা চান ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে, ভালো চাকরি করতে, নিজেদের সামনে আদর্শ হিসেবে অনুকরণীয় কাউকে পেতে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্থান করে দেওয়ার মতো এত আসন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই, চাকরির ক্ষেত্রেও তাই। তরুণদের সবচেয়ে বড় একতা এখানেই যে তাঁরা সবাই দেশকে এগিয়ে নিতে চান, উন্নতি করতে চান। তরুণদের এই স্বপ্ন পূরণের জন্য অবকাঠামো প্রয়োজন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন। এসব অর্জন করা মোটেই সহজ নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে একতা গড়ে তোলার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি দৃঢ় কিন্তু নিরপেক্ষ কণ্ঠের খুব প্রয়োজন। কেউ যখন কোনো

ছুতোয় আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইবে, তখন সেই বিভেদ সৃষ্টিকারীর দলের কাউকেই জোর গলায় এর প্রতিবাদ করে তার অপচেষ্টা রুখে দিতে হবে। কেউ যদি বলে যারা মারাঠি নয়, তাদের আক্রমণ করা উচিত, তাহলে মারাঠিদের মধ্য থেকেই এই আগ্রাসী আহ্বানের প্রতিবাদ করতে হবে। জ্যোতির বিবেকরূপী কণ্ঠস্বরই পারে সবাইকে দেশের স্বার্থে একত্র করতে। তরুণ প্রজন্মও তাই চায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ঠুনকো আভিজাত্যের অহংকারে মাটিতে পা না ফেলার অভ্যাসটা একটু বদলাতে হবে। যখনই কেউ একটু সফল, একটু বেশি শিক্ষিত, ধনী, বিখ্যাত, মেধাবী কিংবা সংস্কৃতিমনা হয়ে ওঠে, সে নিজেকে খুব একটা কেউকেটা ভাবা শুরু করে। নিজেকে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আলাদা করে এমন লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করা শুরু করে, যারা সাধারণ মানুষকে মানুষ বলেই মানতে নারাজ। বায়বীয় বুদ্বুদে বুদ্ধিজীবী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালো লাগে মানি, কিন্তু এই বুদ্ধির উপযোগিতা কোথায়?

টিভি খুললে শতকরা ৭০ ভাগ সময় দিল্লি, মুম্বাই কিংবা বেঙ্গালুরুর খবর দেখতে পাই, কিন্তু শুধু এই তিনটি শহর নিয়েই ভারত নয়। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ এসব শহরে থাকে না। তাদের খবর যদি গণমাধ্যমে যথাযথভাবে প্রচার করা না হয়, দেশ কীভাবে এগিয়ে যাবে? আমি মানবিক দিক বিবেচনা করে এসব করতে বলছি না। দেশে ব্যবসা করতে হলেও জনগণকে জানতে হবে, তাদের চাহিদা বুঝতে হবে। এতে মানসম্মান নষ্ট হয় না। আমার বই রেলস্টেশনে, শহরের অলিগলিতে বিক্রি হয়। এতে তো পাঠকের চোখে আমি সস্তা হয়ে যাই না। শুধু মুম্বাইয়ের র‌্যাম্পে হেঁটে চলা মডেলরা কী পরেছে, তা নয়, ইন্দোর আর রায়পুরের রাস্তায় হেঁটে চলা মানুষেরা কী ভাবছে, তা-ও জানতে হবে। মেকি আভিজাত্য না দেখিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। শুধু অপসংস্কৃতির ধুয়ো তুলে গালিগালাজ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

সবশেষে আমি বলতে চাই, ইংরেজি শেখার ব্যাপারে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই আর পরীক্ষার খাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে, ইংরেজি শিক্ষা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি একজন গ্রামের ছেলেকে হিন্দিতে জ্যামিতি বা পদার্থবিদ্যা শেখাতে পারি, কিন্তু সে যখন চাকরি খুঁজতে যাবে, তখন সেটা তার খুব একটা কাজে লাগবে না। কিন্তু ইংরেজি তাকে একটা ভালো চাকরি পেতে সাহায্য করবে। ইংরেজির প্রসার ঘটিয়ে আমরা যদি দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারি, তাহলে আমরা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য অনেক উদ্যোগ নিতে পারব, কিন্তু অসংখ্য মানুষকে বেকার কিংবা ক্ষুধার্ত রেখে আর যা-ই

হোক, সংস্কৃতি রক্ষার কথা ভাবা যায় না।

এসব শুধু বক্তৃতা করার জন্য বলা নয়, আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকেই আমরা কোনো না কোনোভাবে এই কাজগুলো করতে পারি। অন্তত বন্ধুদের আড্ডাতেই না-হয় সবাই কিছুক্ষণ এটা নিয়ে কথা বললেন। যদি আরও কোনো উপায়ে এই ধারণাগুলো দশজনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন, তবে তা-ই করুন। আজ আমরা এখানে বসে চমৎকার বক্তৃতা শুনছি, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের অনেক কিছু আছে, যা এ দেশের কোটি কোটি মানুষের নেই। দেশের কাছ থেকে তো অনেক কিছুই নিলাম, আসুন, এবার ভেবে দেখি, দেশকে আমরা কী দিতে পারি।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

বদল হোক রীতিনীতির - রানিয়া আবদুল্লাহ

জর্ডানের রানি রানিয়া আবদুল্লাহ ১৯৭০ সালের ৩১ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে ডিগ্রি অর্জন করেন রানিয়া আল

আবদুল্লাহ। তিনি জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কাজের জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। অ্যাপল ইনকরপোরেশনে বেশ কয়েক বছর কাজের অভিজ্ঞতা আছে রানির। তিনি ২৩ অক্টোবর ২০১১ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে এই বক্তব্য রাখেন.
আজ সকালে তোমাদের সবাইকে নিয়ে ভিন্নভাবে নতুন কিছু চিন্তা করা শিখতে চাই। আমরা কি প্রচলিত নিয়মকানুন, রীতি-নীতিকে বদলিয়ে ভিন্ন কিছু, নতুন কিছু শুরু করতে পারি না!

আমি কিন্তু আমাদের সরকার বা প্রশাসনের আইনকানুন কিংবা ভাষাবিজ্ঞান বা অর্থনীতির কোনো নিয়ম ভাঙার কথা বলছি না। আমি আমাদের সাধারণ জীবনে প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের কিছু প্রচলিত নীতিকেই বদলে দেওয়ার কথা বলতে চাই।

একটু ব্যাখ্যা করে বলি, আমরা জানি, এখন আরব বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ তরুণই বেকারত্বের ঝুঁকিতে আছে। এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। নারীদের বেকারত্বের হার আরও হতাশাজনক। উল্টোদিকে এই অঞ্চলের জীবনযাত্রার খরচ প্রতিবছর প্রায় ৫০ লাখ কোটি ডলার। এই বিশাল অর্থ ব্যয়ের জন্য আমাদের সমাজের গতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের গতি ধীরে ধীরে শামুকের মতো শ্লথ হয়ে উঠছে। সবচেয়ে হতাশার কথা হলো, আমাদের এ ধরনের সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থার কারণে আমাদের প্রজন্মের সব মানুষ হতাশ ও দিশাহারা।

১০ বছর ধরে বেকারত্বের এই ধারা অসহ্য পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। আমরা যদি সাধারণ মানুষকে তাদের প্রত্যাশিত কাজের সুযোগ করে দিতে চাই, শান্তি ও উন্নয়নের ধারায় আনতে চাই, তাহলে আমাদের এখনই কাজ শুরু করতে হবে। তবে সেই কাজের শুরুটা হতে হবে একটু ভিন্ন। আর আট-দশটা কাজের মতো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, সমাজ পরিবর্তনের জন্য তোমার মতো করে কিছু কিছু নিয়ম ডিঙাতেই পারো। চলো সমাজের উন্নয়ন, প্রগতির জন্য প্রচলিত রীতিনীতি ডিঙিয়ে যাই। আমাদের এই নিয়ম-কানুনকে ডিঙাতে হবেই, কারণ প্রচলিত নিয়মের কঠিন ভার আমাদের কাঁধেই ভর করে।

শুরুতেই নজর দেওয়া যাক তাপগতিবিজ্ঞানের প্রথম নিয়মের দিকে। এই নিয়মমতে, মহাবিশ্বে শক্তি ও পদার্থকে নতুন করে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। ভিন্নভাবে আমরা বলতে পারি, তুমি আসলেই শূন্য থেকে কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। এই নিয়মকেই আমাদের প্রতিনিয়ত ডিঙিয়ে সামনে যেতে হবে। আমাদের তরুণদের বিরাট এক অংশ তাদের পা জুতা থেকে বাইরে আনতে চায় না। তারা মনে করে, সরকারি চাকরিতেই তাদের

সব নিরাপত্তা লুকিয়ে আছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের সদস্যদের চিন্তাচেতনাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাতে আশার আলো দেখাতে হবে। বোঝাতে হবে, আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই, প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই।

এ জন্য আমাদের গুণগত শিক্ষার বিকাশ করতে হবে, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং, টিমওয়ার্ক, দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান, স্ব-উদ্যোগ স্থাপন, পারস্পরিক যোগাযোগ ও নেতৃত্ব বিকাশে উৎসাহ দিতে হবে। প্রায়োগিক শিক্ষা অর্জনের পরই তুমি শুরু করতে পারো তোমার উদ্যোগ। যখন একজন উদ্যোক্তা তৈরি হয়, তখন সে আরও তিন-চারটে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এভাবে একক থেকে দশক, দশক থেকে সহস্র সুযোগ। শূন্য থেকে এভাবেই তো নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়!

এরপর আমাদের ভাঙতে হবে নিউটনের গতির প্রথম সূত্র। এই নিয়ম বলে, বস্তুর ওপর যদি বাইরের কোনো চাপ বা কোনো শক্তি প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে বস্তু যে গতিতে ছিল সেই গতিতেই থাকবে। বাইরের কোনো শক্তি ছাড়া বস্তুর অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

বলা হয়, আমরা নাকি বাইরের শক্তির সাহায্য ছাড়া আমাদের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের হার কমাতে পারব না। কিন্তু এই কথা সত্য নয়। আমরা আমাদের প্রজন্মের সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিলেই আমরা নিউটনের সূত্রকে ডিঙাতে পারব। আমরা যদি নতুন উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করি, কঠিন কঠিন সব সরকারি নিয়মের বাধা কমিয়ে দিই, সব ক্ষেত্রে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমাতে পারি, তাহলেই আমাদের তরুণদের উদ্যোগ আলোর মুখ দেখবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোগ তো নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিতে ডায়নামো হিসেবে কাজ করে!

তারুণ্যের উদ্যোগ ভাবনাকে আমাদের ভুল বুঝলে চলবে না। আমাদের একটাই কাজ করলে হবে, তারুণ্যকে তার মতো চলতে দাও। আমরা শুধু তরুণদের ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ দিতে পারি, সাহস দিতে পারি। আমরা শিশুদের ভবিষ্যতে কীভাবে বড় সুযোগ আয়ত্ত করতে হবে, তা জানাতে পারি। আগামী প্রজন্মকে প্রত্যাশা ও চাহিদা সীমার দেয়ালকে টপকাতে শিক্ষা দিতে পারি।

আজ এখানে যারা আছো, তোমাদের প্রত্যেকেরই আছে ব্যক্তিগত কল্পনা ও নিজস্ব লক্ষ্য।

তোমার উদ্ভাবনী চিন্তা দিয়ে তোমার উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিয়েযাও। বাস্তবে পরিণত কর তোমার স্বপ্নকে, বদলে দাও প্রচলিত রীতিনীতির।

তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সূত্র: রানির নিজস্ব ওয়েবসাইট
ভাষান্তর: জাহিদ হোসাইন খান

চর্চাতেই বাড়ে আত্মবিশ্বাস: ডেভিড বেকহাম

আমি ছোটবেলায় সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সৈনিকদের মতো মার্চ করে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে বেড়াতাম। তাঁদের মতো করে আমি কাদামাটিতে গড়াগড়ি করতাম। ছোটবেলা

থেকেই আমার আকর্ষণ ছিল ফুটবলের দিকে। ঘুম থেকে ওঠার পর ফুটবল সব সময় আমার সঙ্গে থাকত। এমনকি আমি স্কুলে গেলেও ফুটবল হাতে করে নিয়ে যেতাম। আমার মনে আছে, আমি অনেকবার ফুটবল নিয়ে ঘুমিয়েও গেছি।

আশির দশকের শুরুর দিকের একটা স্মৃতি আমাকে বেশ নাড়া দেয়। আমরা থাকতাম দক্ষিণ-পূর্ব লন্ডনের চিংফোর্ড এলাকায়। আমাদের বাড়ির পাশের মাঠের দেয়ালে একটি মাঝারি আকারের ছিদ্র ছিল। আমি ও আমার বন্ধুরা দিনের আলো না নেভা পর্যন্ত সেই দেয়ালের ফুটো লক্ষ্য করে কিকের পর কিক প্র্যাকটিস করতাম। মাঝেমধ্যে আমার বাবা টেড বেকহামও এই কিক-কিক খেলায় এসে যোগ দিতেন।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে খেলতে পারাটা ছিল আমার ক্যারিয়ারে খুবই আনন্দের সময়। আমি সত্যিই ভাগ্যবান। ম্যানইউ ছাড়া অন্য ক্লাবের হয়ে সেরা সব খেলোয়াড়ের সতীর্থ হিসেবে খেলেছি। কিন্তু ম্যানইউ ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। আমি ছোটবেলা থেকে যে ক্লাবের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম, সেই ক্লাবের হয়ে ১৩ বছর খেলেছি।

আমার জীবনের অন্যতম সেরা খেলা ছিল ২০০১ সালে গ্রিসের বিরুদ্ধে। সে ম্যাচে আমি ৯৩ মিনিটে অসাধারণ একটি কাজ করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, সময়টি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আমার দেশের জন্যও বিষয়টি ছিল সম্মানের। যদি ওই খেলায় জয়ী হই, তাহলে আমরা বিশ্বকাপে খেলব। এমনই এক কঠিন সমীকরণের মধ্যে আমাদের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন আটকে ছিল। গ্রিসের বিরুদ্ধে মন-প্রাণ উজাড় করে খেলছিলাম। কিন্তু কিছুতেই যেন স্বপ্নের গোল দেখা দিচ্ছিল না। আমি তো ১১ বার ফ্রি কিক নিয়েছিলাম, কিন্তু সবগুলোই গোলপোস্ট থেকে ফিরে আসে। ৯৩ মিনিটের দিকে সহখেলোয়াড় টেডি শেরিংহ্যাম হঠাৎ করে বল নিয়ে মধ্যমাঠ পেরিয়ে যায়। গোলপোস্টের সামনে গ্রিকদের প্রতিরোধ দেখে আমাকে বলটি পাস দিয়ে দেয়। আমি বল পেয়েই গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে গোলপোস্টে শট নিই। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম খেলা, যেখানে আমি গোল করার পরে মাঠে হাঁটু গেড়ে কেঁদে ফেলি। আমার মা-বাবা স্টেডিয়ামে ছিলেন। তাঁরাও কেঁদেছিলেন। পরে জেনেছি, শুধু আমিই নই, স্টেডিয়ামে থাকা কয়েক হাজার দর্শক, সঙ্গে দেশের কোটি মানুষ সেদিন কেঁদেছিল। তাদের প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণে আমি সহায়তা করি মাত্র।

আমি বিশ্বাস করি, চর্চাতেই আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমি নিয়মিত ফুটবল প্র্যাকটিস করি। আমার প্র্যাকটিস দেখে আমার সন্তানেরা অবাক হয়। তাদের বলি, যেহেতু আমি পেশাদার ফুটবলার, তাই বেশি প্র্যাকটিস করি। সব সময় শুনতে হয়, আমি নাকি পৃথিবী সেরা মিডফিল্ডার। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমার থেকেও সেরা ফুটবলার অনেক দেখেছি। আমি মাঝেমধ্যে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করি। চোখ ফেরালে দেখি, সবকিছুই যেন সব সময় আমার পক্ষে ছিল। টিম, ক্লাব, খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজার, সমর্থক–সবাই। সব ক্রীড়াবিদের স্বপ্ন থাকে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে। ফুটবলার হিসেবে সবারই স্বপ্ন থাকে সেরা হয়ে ট্রফি স্পর্শ করার। সব সময় সেই স্বপ্ন বাস্তবের মুখ দেখে না। কিন্তু কেন জানি আমি সৌভাগ্যবান। আমি বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে খেলে ট্রফি স্পর্শ করার সুযোগ পেয়েছি। ম্যানচেস্্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, গ্যালাক্সি–সব দলের হয়ে আমি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জেতার স্বাদ পাই।

আমার ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে দেখতে পাই, আমি আমার দেশের জন্য ১১৫ বার মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছি। দুবার ফিফা বর্ষসেরা-রানারআপ ফুটবলার হয়েছি, তিনবার বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েছি। দেশের জন্য বিশ্বকাপ জেতার আক্ষেপটা থেকে যাবে আমার। কিন্তু তার পরও আমি নিজেকে নিয়ে খুশি।

আমি সুপারস্টার হতে যুক্তরাষ্ট্রে যাইনি। আমি সেখানে একটি দলের হয়ে ফুটবল খেলতে গিয়েছি। কঠিন পরিশ্রম করে সেই দলের হয়ে খেলায় জয়লাভের চেষ্টা করেছি। আমার সবকিছুই ফুটবলকে ঘিরে। আমি সেখানে গিয়েছি পার্থক্য সৃষ্টির জন্য। আমি দাবি করিনি, আমার আগমনেই যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল জনপ্রিয়তা পাবে। এটা অর্জন করা বেশ কষ্টকর হবে। বেসবল, বাস্কেটবলের ভিড়ে আমেরিকান ফুটবলের জন্য তা সত্যিই কষ্টকর হবে।

আমি সব সময় আমার দেশের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। বিশ্বকাপ হোক আর ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বা সামান্য কোনো প্রীতি ফুটবল ম্যাচ হোক না কেন, সব জায়গায় আমি দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। দেশের জন্য কাজ করতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে অপেক্ষা করি.

ব্রিটিশ ম্যাগাজিন স্কয়ার (সেপ্টেম্বর, ২০১২) ও সিএনএন-এর (৩ এপ্রিল ২০১৩) সাক্ষাৎকার অবলম্বনে লিখেছেন জাহিদ হোসাইন খান

আমরা সবাই 'সাংবাদিক' - অমিতাভ বচ্চন
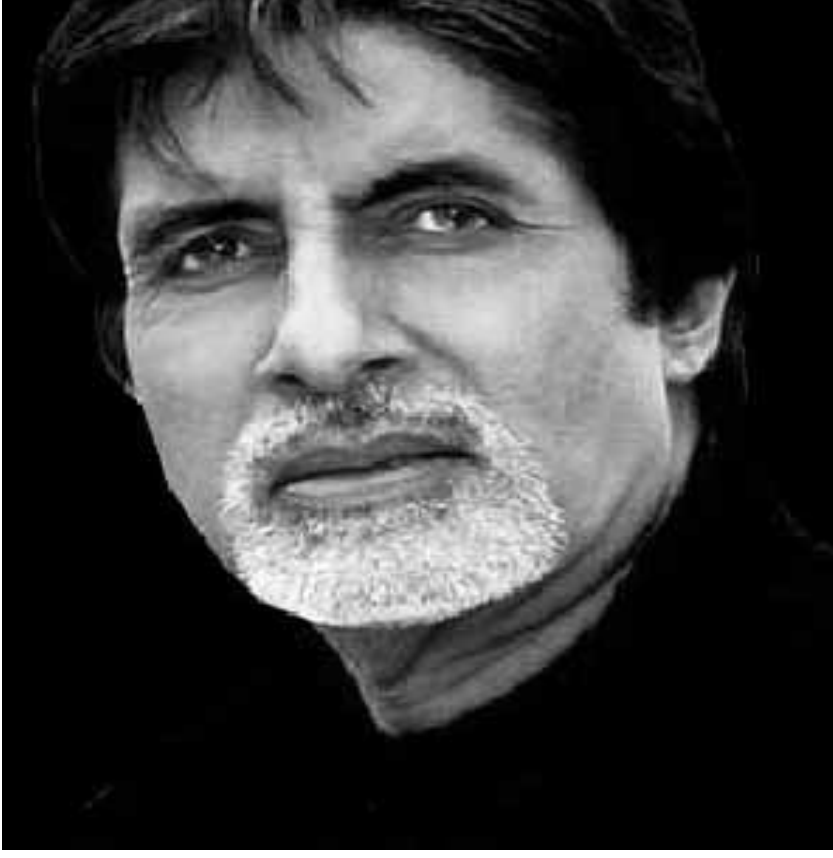
শক্তিমান ভারতীয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের জন্ম এলাহাবাদে, ১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর। তিনবার জাতীয় পুরস্কার, ১৪ বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, পদ্মশ্রী পুরস্কার (১৯৮৪) ও পদ্মভূষণ পুরস্কার (২০০১) লাভ করেন তিনি। ১৯৯৯ সালে বিবিসির জরিপে তিনি 'গ্রেটেস্ট স্টার অব স্ক্রিন অব দ্য মিলেনিয়াম' নির্বাচিত হন। ২০১০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সিএনএন-আইবিএন সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি নিচের বক্তব্যটি দেন।

উপস্থিত সবাইকে শুভসন্ধ্যা। এখন মঞ্চে উঠে আমার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার নাটকের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। সিজারের সিনেট সভায় সেনাপতি মার্ক অ্যান্টনি খুব ছোট একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে অ্যান্টনি বলেন, 'আমাকে আজ যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজ যাঁদের সম্মানিত করা হয়েছে, আমি অন্তর থেকে তাঁদের সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করছি।' আজ এখানে যেসব সাহসী সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন, আমিও তাঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

আমরা যদি আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় দেখতে পাই। আমাদের পূর্বপ্রজন্মের মেধা ও পরিশ্রমের জোরেই আমরা এখন সভ্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করছি। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতার কারণেই আমরা ভারতকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এই বিশাল রাজনৈতিক স্তম্ভের ক্ষুদ্রতম একক হলেন আপনি, আমি–আমরা সবাই। এ দেশের সব নাগরিকই তো এই দেশের শিকড়। নাগরিক হিসেবে আমাদের রয়েছে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি। নাগরিক হিসেবে সংবিধান আমাদের ওপর বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে। একজন নাগরিক যখন আরেকজন নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হন, তখনই সবাই পারস্পরিকভাবে একে অন্যের জন্য কাজ করতে উদ্যোগী হন।

আজ এখানে যেসব সিটিজেন জার্নালিস্ট বা নাগরিক সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছেন, আমরা তাঁদের নিছক কটি শব্দ দিয়ে সম্মানিত করতে পারি না। আমরা তাঁদের এমন শব্দে স্তুতি গাইতে চাই, যার মাধ্যমে তাঁরা আরও উৎসাহিত হবেন। নিজেরাই সমাজবদলের জন্য অনুপ্রাণিত হবেন। গণতান্ত্রিক সমাজে একজন নাগরিকের প্রতিটি কাজ, আচরণ ও নৈতিক ধ্যান-ধারণায় লুকিয়ে থাকে নাগরিক সাংবাদিকতার বীজ। মানসিক অবস্থা ও নিত্যদিনের আচার-আচরণেই কিন্তু সত্যিকারের নাগরিকতার চিত্র ফুটে ওঠে।

আমরা যদি আমাদের দেশকে ভালোবাসি, যদি নাগরিক সাংবাদিকদের শক্তি নিয়ে গর্ববোধ করি, যদি আমাদের শিশু ও আগামী প্রজন্মের জন্য ভালো কিছু করতে চাই, যদি মানবসভ্যতার লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করতে চাই; তাহলে আমাদের সবাইকে নাগরিক সাংবাদিকতা করতে হবে। আমাদের সবাইকে হয়ে উঠতে হবে সাংবাদিক।

তথ্যপ্রযুক্তির জগতে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক উন্নয়ন এসেছে। যার কারণে সাধারণ মানুষও এখন গণমাধ্যমের অংশ। সংবাদমাধ্যমগুলো এখন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে। প্রত্যেকে একে অন্যের পরিপূরক। কেউ কখনো একাকী বড় কাজ করতে পারে না। আমাদের বেশি বেশি দক্ষ সংবাদকর্মী প্রয়োজন।

পেশাগত সাংবাদিকতা নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। সেই নৈতিকতা থেকেই সমাজের জন্য ভালো কিছু করার আকুতি জন্মায়। গণতান্ত্রিক সমাজে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়, কিন্তু এটাই আমাদের বেশি করে প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষকে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকির কাজ। কুসংস্কার, অপবাদ, পক্ষপাতকে পাশ কাটিয়ে তদন্ত করে নির্ভুল তথ্য প্রকাশ করাই সাংবাদিকতার আলোকিত দিক। তথ্য প্রকাশ করাই তো সাংবাদিকতা পেশার মহান স্তম্ভ। সাংবাদিকতা পেশা মানেই সাহসিকতা। সবকিছুর মূলেই থাকে বিশ্বাস।

ফরাসি বিপ্লবের উদ্দীপ্ত নীতি ছিল ‘স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ’। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই শুরু হয় আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। আপনি ইচ্ছে করলেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে কষ্ট হবে না, কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। বিশ্বাসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ। বিশ্বাসই আমাদের পুঁতির মালার মতো একসঙ্গে আটকে রাখে। ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতাই তো বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ভদ্রতা শেখায়। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শিক্ষা তো আমরা বন্ধুত্ব থেকেই লাভ করি। এর মাধ্যমেই সভ্যতার বিনির্মাণ ঘটে।

আমাদের নাগরিকত্ব কোনো শিশুতোষ বিষয় নয়। ভারতের নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার বদলে আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতাই বেশি। দায়িত্ব পালন করাই আমাদের সত্যিকারের ব্রত। ভ্রাতৃত্ববোধই আমাদের সংকল্প। এর মাধ্যমেই আমরা এক হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব। আমরা যদি পারস্পরিক বিশ্বাসকে অবহেলা করি, তাহলে তা আমাদের জন্যই ক্ষতি। নিজেদের ভুলের জন্য মেধাশক্তিকে নষ্ট করে ফেললে আমরা সামাজিক নানা সমস্যার মুখে পড়ব। আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকার পরও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার জন্য আমরা কি পিছিয়ে থাকব? আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আরও সামনের দিকে। যার যার অবস্থান থেকে আমরা নিজেরাই পারি আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

সূত্র: সিএনএন আইবিএন ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর
জাহিদ হোসাইন খান

সফলতার জন্য তিন প্রশ্ন: সাইমন সিনেক

সাইমন সিনেক একজন পেশাদার লেখক ও বক্তা, বর্তমানে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ কৌশল বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন। জন্ম ১৯৭৩ সালের ৯ অক্টোবর ইংল্যান্ডে। এই বক্তৃতা তিনি দেন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, ওয়াশিংটনে।

কেমন লাগে যখন কোনো কাজই মনের মতো হয় না? অথবা, যখন আপনার মতোই কেউ এমন কোনো অসাধ্য সাধন করে ফেলে. যা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না? সব হিসাব-নিকাশ উল্টে দিয়ে এমন কিছু ব্যাপার সব সময়ই ঘটে, যা আমরা সাধারণ নিয়মে মেলাতে পারি না। স্টিভ জবসের অ্যাপলের কথাই ধরা যাক, বছরের পর বছর অ্যাপল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর চেয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অনেক ধাপ এগিয়ে আছে। কী এমন আছে অ্যাপলের, যা তাদের আর সবার চেয়ে আলাদা করে রেখেছে? অথবা রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের অ্যারোপ্লেন আবিষ্কারের কাহিনি। তখনকার দিনে অসংখ্য আবিষ্কারক ছিল, তাদের নিজেদের অতুলনীয় যোগ্যতা আর পৃষ্ঠপোষকের টাকার জোর থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ই মানুষের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরেও কিছু একটা এখানে কাজ করছে। দুনিয়া কাঁপানো সব নেতৃত্ব কিংবা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো, এদের সবার মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। তারা সবাই একইভাবে চিন্তা করে, কাজ করে আর নিজেদের উপস্থাপন করে, যা কি না বাকি সব

মানুষের থেকে শুধু ভিন্নই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত!
কেন? কীভাবে? কী? এই ছোট্ট তিনটি প্রশ্নই বলে দেয় কেন কেউ সফল হয় আর কেউ হয় না। শুরু করা যাক 'কী' থেকে। আমরা সবাই জানি, আমাদের কাজটা কী, আমরা আসলে কী করছি। কেউ কেউ জানি যা করছি, তা কীভাবে করছি, ঠিক কীভাবে এই কাজটা করতে হয়। কিন্তু কজন জানি যে আমরা যা করছি, তার পেছনে মূল উদ্দেশ্যটা কী? কাজটা কেন করছি আমরা? 'কেন', এই প্রশ্নটি যত সরল মনে হয়, আসলে মোটেও তেমন নয়। 'কেন'– এই প্রশ্নের উত্তরই বলে দেয় আমাদের লক্ষ্য কোনটি, আমাদের বিশ্বাস কী, আমাদের অস্তিত্বের কারণ কী। আর লক্ষ্য সম্পর্কে এমন পরিষ্কার ধারণা খুব কম মানুষেরই থাকে। আমরা আগে ভাবি কী করতে হবে, তারপর ভাবি কীভাবে করতে হবে, কিন্তু কেন করতে হবে আর করলে তা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাটিই আমাদের মাথায় আসে না। শুধু ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সময়ও আমরা উল্টোভাবে চলি। যার ফলাফল দাঁড়ায়, আমরা শুধু আমাদের কথাই বলে যাই, আমরা ভেবে দেখি না, আমরা অন্যকে যা করতে বলছি, সে তা কেন করবে।
আমাদের সচরাচর কথাবার্তার সঙ্গে অ্যাপলের বিজ্ঞাপনগুলোর একটু তুলনা করে দেখুন। অ্যাপল যদি আমাদের মতো 'কী' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করত, তাহলে তাদের বলতে হতো, 'আমরা দারুণ সব কম্পিউটার বানাই। এগুলোর ডিজাইন সুন্দর আর ব্যবহারও সহজ।' এমন গৎবাঁধা কথা বললে আদৌ কি কেউ অ্যাপলের কম্পিউটার কিনত? একেবারেই না! অথচ আমরা সবাই এভাবেই কথা বলছি সারা দিন! আমরা বলতে থাকি আমরা কী করি, আমরা অন্যদের চেয়ে কীভাবে আলাদা আর এসব বলেই আমরা আশা করি সবাই আমাদের কথায় ইতিবাচক সাড়া দেবে, আমাদের কথামতো কাজ করবে, বা আমাদের কাছ থেকে কিছু কিনবে। কিন্তু আসলে এভাবে মানুষকে কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করা যায় না।

আমরা কী করি, তার চেয়ে মানুষের মনে অনেক বেশি নাড়া দেয়, আমরা কাজটি কেন করি। অ্যাপল নিজেদের তুলে ধরে উদ্ভাবন আর ভিন্নতার এক অনন্য সমন্বয় হিসেবে। তারা প্রচলিত ধারণার বাইরে ভিন্নতায় বিশ্বাস করে আর এই বিশ্বাসই তাদের আর ১০টি কম্পিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানির চেয়ে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কম্পিউটার প্রয়োজন এমন যে কারও কাছেই নিজেদের পণ্য গছিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাপল কোনো চেষ্টাই করে না। তারা ঠিক তাদের সঙ্গেই ব্যবসা করে, যারা অ্যাপলের ভিন্নতা আর বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠনটাই এ রকম যে ভাষা বুঝতে পারা আর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে মস্তিষ্কের বাইরের অংশে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের অধিকাংশ

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মস্তিষ্কের ভেতরের অংশে, যা কি না সব অনুভূতির উৎপত্তিস্থল। মজার ব্যাপার হলো যে অংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সম্পাদন করা হয়, তার সঙ্গে ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ গালভরা বুলি কিংবা জটিল সব তথ্য-উপাত্ত দিয়ে কাউকে কোনো কিছু প্রমাণ করে দেখালেও সে বলতে পারে, 'ব্যাপারটা কেন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না।' এই 'মনে হওয়া'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দীপক। তাই কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে প্রথমে আপনার নিজের ভেতর যে বিশ্বাস কাজ করে, তাকেও সেই বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হবে। তারপর আসবে যুক্তি আর তথ্য উপস্থাপন করে বোঝানোর পালা। যদি আপনি কোনো কাজে এমন কাউকে নিয়োগ দেন যে কাজটি করার যোগ্যতা রাখে, তবে সে বেতন পাওয়ার জন্যই কাজ করবে। কিন্তু যদি এমন কেউ থাকে যে কাজটি পারে এবং আপনি যে কারণে কাজটি করতে উৎসাহী, সেই উৎসাহ তার ভেতরে আছে, একই বিশ্বাসে সেও বিশ্বাস করে; তাহলে সেই ব্যক্তি তার জীবন দিয়ে আপনার জন্য কাজ করে যাবে, শুধুই বেতনের জন্য নয়। আর কেউ যখন নিজের ভেতরের তাড়নায় কাজ করে, সে কাজে সাফল্য অবধারিত।

১৯৬৩ সালে লুথার কিং যখন ওয়াশিংটনের তাঁর বর্ণবাদবিরোধী অমর বক্তব্য দেন, সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছিল তাঁর কথা শোনার জন্য। তখনকার দিনে এত মানুষ কীভাবে একত্র হতে পেরেছিল? কেউ তাদের কোনো আমন্ত্রণ পাঠায়নি, লুফার কিং কোনো নামকরা বক্তাও ছিলেন না। তিনি শুধু সবার কাছে একটি কথাই প্রচার করেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি...'। তাঁর বিশ্বাস আর চিন্তা যাঁদের গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল, যাঁরা সেই বিশ্বাসকে নিজেদের বিশ্বাসে পরিণত করেছিলেন, তাঁরাই সেই ধারণাকে তাঁদের চারপাশের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। শেষপর্যন্ত প্রায় অখ্যাত, অপরিচিত এক বক্তার কথা শোনার জন্য সমবেত হয় প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। তাঁদের কেউই লুথার কিংয়ের আকর্ষণে সেখানে হাজির হননি। তাঁরা এসেছিলেন তাঁদের নিজেদের জন্য, বর্ণবাদের অসারতায় তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসই তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই জনসভায়। আর এখনকার দিনের রাজনীতিবিদদের বক্তৃতার অবস্থা দেখুন! তাঁদের প্রতিশ্রুতির পাহাড় আর বড় বড় পরিকল্পনার কাহিনি জনগণকে আর এতটুকুও উজ্জীবিত করতে পারে না।
প্রকৃত নেতাকে জনতা অনুসরণ করে কোনো বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে নয়। তারা স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে, বিশ্বাস করেই নেতাকে সমর্থন জানায়। আর যে 'কেন' প্রশ্নের উত্তর জেনে পথ চলা শুরু করে, কেবল সেই পারে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে, অথবা এমন কাউকে খুঁজে নিতে যে তাকে অনুপ্রাণিত করে। সবাইকে ধন্যবাদ।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

বিল গেটসকে বাফেট যা বলেছিলেন

বিশ্বের জনপ্রিয় এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের রয়েছে বর্ণাঢ্য জীবনকাহিনি। সবাই যে খুব ভালো অবস্থান থেকে এসে বিখ্যাত হয়েছেন, এমন নয়। নিজ নিজ যোগ্যতায় বিখ্যাত, প্রভাবশালী হয়ে ওঠার আছে নানা উদাহরণ। তাঁদের জীবনকাহিনি অনুসরণীয়। নিজ গুণে এবং যোগ্যতায় বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হচ্ছেন ওয়ারেন বাফেট। ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার ওমাহা এলাকায় জন্ম নেওয়া বিশ্বের অন্যতম সফল এ বিনিয়োগকারী গত বছর একটি দাতব্য সংস্থায় তিন হাজার ১০০ কোটি ডলার দান করেছেন। বিনিয়োগের নেশাটা শুরু হয় ছোটবেলা থেকেই এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনেন তিনি! শুনতে অবাক লাগলেও মাত্র ১৪ বছর বয়সে সংবাদপত্র বিক্রি করা অর্থ দিয়ে একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন ওয়ারেন বাফেট!

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কনজিউমার নিউজ অ্যান্ড বিজনেস চ্যানেলে (সিএনবিসি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তরুণদের বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এ কথাগুলোই তিনি পরে বলেছেন বিল গেটসকে। নিজের ১১ বছর বয়সে শেয়ার কেনার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যেখানেই কম খরচ দেখবে, সেখানে নিজের সন্তানদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা উচিত।' কম বয়সে কেনা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর মতামত, জমা করা ক্ষুদ্র অর্থ দিয়ে সন্তানদের যেকোনো রকমের ব্যবসা শুরু করার ব্যাপারে আগ্রহী করাটা ভালো।

বিয়ের ৫০ বছর পরও তিনি বাস করছেন নিজ শহরে ছোট তিন বেডরুমের একটি বাড়িতে, বাড়িটি দেয়ালঘেরা নয়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘যা প্রয়োজন শুধু তাই কেনা উচিত, এ ব্যাপারে সন্তানদেরও উৎসাহিত করা জরুরি।’ শুনতে অবাক হলেও বিশ্বের এ দ্বিতীয় ধনকুবের ব্যক্তিটি নিজেই নিজের গাড়ি চালান এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য নেই কোনো নিরাপত্তা কর্মীও! নিজের প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকশেয়ার হ্যাথওয়ে, যার চেয়ারম্যান তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে সারা বিশ্বে রয়েছে ৬৩টি প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি বিমান পরিবহন স্ংস্থাও। কিন্তু কোনো দিনও বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহার করেননি ওয়ারেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সব সময়ই ভাবুন, অর্থনৈতিকভাবে কোন কাজটি সুবিধাজনক। মূল প্রতিষ্ঠানের এতগুলো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রতিবছর তিনি একটিমাত্র চিঠি দেন! এ ছাড়া তেমন কোনো বৈঠক কিংবা নিয়মিত যোগাযোগও করেন না তিনি। এ ব্যাপারে মনেপ্রাণে একটি কথা বিশ্বাস করেন এবং বলেন, সঠিক জায়গায় সঠিক লোক নিয়োগ দেওয়া উচিত, যাতে কাজটা হবে–এমন নিশ্চিন্তে থাকা যায়। অধীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো চিঠিতে দুটি নিয়মের কথা থাকে সব সময়ের জন্য। যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নিজ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিকদের টাকার কোনো ক্ষতি করা যাবে না এবং দ্বিতীয়টি প্রথম নিয়মটি কখনো ভোলা যাবে না! এতে করে শেয়ার মালিকদের বিশ্বাস আর এগিয়ে যাওয়ার পথ সহজ হবে। কাজের সময় বাইরে সমাজের উচ্চপদস্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তেমন অভ্যস্ত নন ওয়ারেন। কাজের সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু ঘরে বসে পপকর্ন খেয়ে আর টিভির সামনে কাটিয়ে দেন তিনি! মজার বিষয় হচ্ছে, নিজে কখনো কোনো মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখেন না এবং নিজের ব্যক্তিগত অফিস টেবিলেও নেই কোনো কম্পিউটার!

বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের বিল গেটস একবারই মাত্র দেখা করেছেন ওয়ারেন বাফেটের সঙ্গে। দেখা করার সময় যে খুব উপভোগ্য হবে না, এমনটাই ভেবেছিলেন বিল গেটস। কেননা, দুজনের সাফল্যের পথ আলাদা, জীবন যাপনেই নেই মিল। তাই বিল গেটস ভেবেছিলেন, আধা ঘণ্টাই যথেষ্ট। আধা ঘণ্টার সেই সাক্ষাতের সময় পরে শেষ হয়েছে ১০ ঘণ্টায়। বিল গেটস তো বটেই, তরুণদেরও নানা বিষয়ে পরামর্শ দেন ওয়ারেন বাফেট। এরপর থেকেই বিল গেটস তাঁর দারুণ ভক্ত। একেবারে ডাই হার্ড ফ্যান।

ওয়ারেন তরুণদের ক্রেডিট কার্ড (ব্যাংক ঋণ) ব্যবহারের চেয়ে বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। যার মধ্যে রয়েছে অর্থ কখনো মানুষ তৈরি করতে পারে না বরং উপার্জন করে নিতে হয়। যতটা

সম্ভব সহজভাবে জীবন যাপন করা উচিত এবং কে কোথায় কী বলে, সেটা শুধু শুনে যাও, তবে নিজের যেটা ভালো লাগে, সেটাই করবে।

শুধু ব্র্যান্ড দেখেই পোশাক পছন্দ করতে হবে, এমন যুক্তির পক্ষে নন তিনি। তাঁর মতে, যা নিজের সঙ্গে মানিয়ে যায় এবং আরাম দেয় তা-ই পরবে। সব মিলিয়ে জীবনটা তোমারই, তাহলে কেনই বা অন্য একজনকে সুযোগ দেবে তোমার জীবনের নিয়ম তৈরিতে।

উদ্যোক্তা হতে চাও? - ক্যামেরন হ্যারল্ড

খ্যাতিমান উদ্যোক্তা ক্যামেরন হ্যারল্ডের জন্ম কানাডায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি প্রথম ব্যবসা শুরু করেন। বিভিন্ন দেশে নতুন উদ্যোক্তাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ২০১০ সালের মার্চ মাসে কানাডার এডমন্টনে টিইডির একটি অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন।

এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমি সবচেয়ে মাথামোটা! কারণ, আমি ভালোভাবে স্কুলই পাস করতে পারিনি। কিন্তু ছোটবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমি ব্যবসা বেশ ভালো বুঝি আর বড় হয়ে আমি উদ্যোক্তা হতে চাই।

ছোটবেলায় আমাদের অজস্র স্বপ্ন থাকে, শখ থাকে, জীবনে অনেক কিছু করার প্রবল ইচ্ছে থাকে। আর যখন আমরা বড় হয়ে যাই, আস্তে আস্তে সেসব স্বপ্ন বিবর্ণ হতে হতে মিলিয়ে যায়। আমাদের শুধু বলা হয়, পড়াশোনা করতে হবে, আরও অনেক পড়তে হবে প্রতিদিন, আরও মনোযোগী হতে হবে, আরও একজন শিক্ষকের কাছ প্রাইভেট পড়তে হবে! আমার মা-বাবা একজন শিক্ষক রেখেছিল আমাকে বাসায় এসে ফরাসি পড়ানোর জন্য; কিন্তু কোনো লাভই হয়নি। দুই বছর আগে এমআইটির (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) ব্যবসায় উদ্যোগ-বিষয়ক মাস্টার্স প্রোগ্রামে আমি সেরা প্রভাষক নির্বাচিত হই। সেখানে আমাকে সারা পৃথিবী থেকে আসা উদ্যোক্তাদের সামনে বক্তব্য দিতে হয়। মজার ব্যাপার হলো, আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখনই শহরের একটা বক্তব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাই। কিন্তু তখন কেউ আমাকে এতটুকু উৎসাহ দিয়ে বলেনি, ‘এই ছেলে তো দারুণ কথা বলতে পারে! হয়তো পড়াশোনায় তেমন মনোযোগী নয়, কিন্তু ও মানুষকে চমৎকারভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।’ কেউ একবারও আমার মা-বাবাকে বলেনি, ‘ওকে বক্তৃতা শেখার জন্য একজন শিক্ষক দাও।’ সবাই বলেছে, ‘যেসব বিষয়ে পরীক্ষায় খারাপ করেছে, সেগুলো পড়তে পাঠাও।’

তাই শিশুদের শুধু চিকিৎসক বা প্রকৌশলী বানানোর চেষ্টা না করে উদ্যোক্তা হওয়ারও সুযোগ দিতে হবে। এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের স্কুল-কলেজগুলো সবাইকে এটাই বোঝায় যে চিকিৎসক হতেই হবে, কিংবা প্রকৌশলী হতেই হবে। এতে আমরা অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাকে নিজেদের অজান্তেই হারিয়ে ফেলছি। এমন অনেকে হয়তো এই কক্ষের মধ্যেই আছেন, যাঁদের কোনো কিছু করার তীব্র ইচ্ছে আছে, দারুণ কোনো পরিকল্পনা আছে। আমরা তাঁদের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করতে পারি।

একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, ‘তুমি যদি কাউকে একটি মাছ দাও, তাহলে তুমি তার এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা করলে। কিন্তু তুমি যদি কাউকে মাছ ধরা শেখাও তাহলে তুমি তার সারা জীবনের খাবারের ব্যবস্থাই নিশ্চিত করে দিলে।’ অভিভাবক ও সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত শিশুদের হাতে মাছ তুলে না দিয়ে তা ধরতে শেখানো। আমরা যদি উদ্যোক্তা হওয়াকে একটি সম্ভাবনাময় জীবিকা হিসেবে মেনে নিয়ে ছেলেমেয়েদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহ আর সহায়তা দিই, তাহলে সরকারকে আর কখনো বেকারসমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

আমরা সারা দিন বসে বসে শিশুদের জ্ঞান দিই, কী কী করা উচিত নয়। কাউকে মেরো না,

কামড় দিয়ো না, তর্ক কোরো না, এমন আরও শত শত বিধি-নিষেধ! আমরা তাদের বলি, সবচেয়ে ভালো চাকরিটাই পেতে হবে। স্কুলের শিক্ষক বলেন, চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হতে না পারলে আর জীবনে হলোটা কী! টেলিভিশন আর পত্রিকা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়, যদি একবার মডেল, গায়ক কিংবা নায়ক হতে পারো, তাহলে তোমাকে আর পায় কে! আমাদের এমবিএ প্রোগ্রামে কখনো উদ্যোক্তা হতে শেখানো হয় না। সেখানে শুধু শেখানো হয়, কীভাবে বড় বড় কোম্পানির হয়ে চাকরি করতে হবে। কিন্তু একবার কি কেউ ভেবে দেখেছে, এসব বড় কোম্পানি তৈরি করছে কারা? তারা সংখ্যায় হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ, তারা উদ্যোক্তা। আর এদিকে আমরা কেবলই তোতাপাখির মতো শিখিয়ে যাচ্ছি, ‘উদ্ভট কিছু করার চেষ্টাও কোরো না। সবাই যা করে, সেটাই করো। ভালো ছাত্র হও।’ কিন্তু দুঃখিত, ক্লাসে প্রথম হলেই যে কেউ সবকিছু পারবে, তেমন নয়। আমি জোর গলায় স্বীকার করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে আমি অন্যদের দিয়ে আমার অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে নিতাম।

এখন সেই একই বিষয়ের বইয়ে আমার উদাহরণ দেওয়া আছে। সারা কানাডার শিক্ষার্থীরা তা পড়ছে। বইটি লেখার সময় তাঁরা যখন আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন, আমি না বলে পারিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে এই কোর্সে আমি কীভাবে পাস করেছিলাম!

উদ্যোক্তা হতে হলে এমবিএ করতেই হবে, স্কুলে ভালো ফল করতেই হবে–এমন কোনো কথা নেই।

আমরা কেন শিশুদের শেখাই না যে টাকাপয়সা যখন খুশি খরচ না করে কীভাবে জমিয়ে পরে ভালো কিছু করা যায়? আমি বড় রাস্তায় একবার একটা পয়সা ফেলে দেওয়ায় আমার বাবা আমাকে একা একা রাস্তার মাঝখানে গিয়ে সেটা তুলে আনার আদেশ করেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি খুব কষ্ট করে টাকা উপার্জন করি। আর তাই একটি পয়সাও নষ্ট হওয়া দেখতে চাই না।’ সেদিনের কথা আমি আজও ভুলিনি। হাতখরচ শিশুদের একটি বাজে ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলে। এটি তাদের ‘বেতন’ আশা করতে শেখায়। একজন উদ্যোক্তা কখনো নির্দিষ্ট অঙ্কের বেতনের পেছনে ছোটেন না। আমার তিন ছেলেমেয়ে। আমি তাদের বলি বাড়িতে কোথাও কিছু ঠিকঠাক করা বা গোছানোর দরকার আছে কি না, তা খুঁজে বের করতে। তারা আমাকে এসে জানায়। তারপর আমরা আলোচনা করে ঠিক করি, কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাদের আমি কত পারিশ্রমিক দিতে পারি! হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে আমরা দর-কষাকষিও করি! কিন্তু এতে তাদেরই উপকার হয়। তারা চারপাশ থেকে সুযোগ খুঁজে নিতে শেখে, নিজের কাজ নিজেই করতে শেখে। এ ছাড়া কীভাবে কাজের যথাযথ দাম

আদায় করতে হয়, তা-ও শিখে নেয়।

আমি বলব, শিশুদের ঘুমানোর সময় প্রতিদিন গল্প না শুনিয়ে সপ্তাহে তিন দিন অন্তত তাদের গল্প বলতে দেওয়া উচিত। তাদের জামাকাপড়, খেলনা কিংবা কম্পিউটার নিয়েই কিছু বলতে দিয়ে দেখুন না, সে কী গল্প বানায়! আমারসন্তানদের আমি এমনটি প্রায়ই করাই, এতে তারা সৃজনশীল হতে শেখে, নিজেদের মতো করে আনন্দও পায়। তাই শিশুদের কথা বলতে দিন, যা কিছু নিয়েই হোক না কেন। উদ্যোক্তা হতে হলে এসব দক্ষতা খুব প্রয়োজন। আমরা নিজেদের জীবনে এগুলো নিয়ে সমস্যায় পড়লেও আমাদের শিশুদের গড়ে তোলার বেলায় এগুলোর কথা ভুলে যাই, আমরা শুধু ক্লাসের পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য প্রাইভেট টিচার দিয়েই মনে করি দায়িত্ব শেষ! কিন্তু না, তাদের নেতৃত্ব দিতে শেখাতে হবে। তাদের মনে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে জানতে হবে।

সূত্র: ওয়েবসাইট
ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়: টিম বার্নাস লি

স্যার টিম বার্নাস লি ১৯৫৫ সালের ৮ জুন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বলা

হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ) জনক। তাঁর কারণেই আজ আমরা ঘরে বসেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দুনিয়া চষে বেড়াতে পারি

১৯৮০ সালের দিকে আমি তখন সুইজারল্যান্ডের ইউওএনআরে কাজ করতাম। ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চে (ইউওএনআর) আমার কাজ ছিল তথ্য বিভাগে। ওখানকার কাজটা যে খুব কঠিন ছিল, তা নয়, কিন্তু তবু আমি মাঝেমধ্যে বিরক্ত হয়ে যেতাম। কারণ, দেখা যেত একই ধরনের সমস্যা নিয়ে একই ধরনের তথ্য জানতে চাইছে সবাই। বারবার একই প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা খুবই একঘেয়েমি ছিল। কিন্তু ওই একঘেয়েমি থেকেই আসলে নতুন এক ইতিহাসের শুরু হয়েছিল। হাজারো বার একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজতাম আমি সব সময়। তখন আমার মাথায় প্রথম আসে, এমনটা যদি হতো যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে না এসে বা আমাদের ফোন না করে, ঘরে বসেই যদি সব তথ্য পাওয়া যায় বা সব প্রশ্নের উত্তর মেলে, তাহলে মন্দ হয় না।

অনেক প্রতিষ্ঠানই লিফলেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করত। সে ক্ষেত্রে বারবার নতুন লিফলেট ছাপতে হতো। যার মানে সময়, অর্থ–দুইয়ের অপচয়। এতে আসলে শেষ পর্যন্ত সমস্যা কমে না বাড়ে, সেটা বোঝাও দায়। এসব চিন্তা করতে করতেই আমার মনে হলো, এমন একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় যে মানুষ তার প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য একটা নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারবে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা, তাহলে তা দারুণ হয়। এভাবেই ১৯৮৯ সালের দিকে আমার প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের নিয়ে আমি তৈরি করে ফেলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা সংক্ষেপে ওয়েব।

অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করার সময় ওখানকার নেটওয়ার্ক প্রিন্টার হ্যাক করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম একবার, তখন আমার শাস্তিও হয়েছিল। কিন্তু সেই শাস্তিও আমাকে যেন আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গেল। আমার মনে ইচ্ছা করতে থাকল, আমার যদি নিজের একটা কম্পিউটার থাকে, তাহলে মন্দ হয় না। তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আমি একটা করাতকলে কাজ করছিলাম। ওখানে ক্যালকুলেটরের মতো একটা বড় অকেজো যন্ত্র খুঁজে পেলাম একদিন। এরপর করাতকলের মালিকের অনুমতি নিয়ে ওই অকেজো যন্ত্রটা নিজের বাসায় নিয়ে এলাম। ওই ক্যালকুলেটরের বোতাম সব তুলে ফেলে কম্পিউটারের মতো বোতাম লাগিয়ে ফেললাম খুব সহজেই। এরপর কম্পিউটারের মনিটরের জন্য একটা পুরোনো টিভির দোকানে গেলাম। গিয়ে মাত্র পাঁচ পাউন্ড দিয়ে একটা টিভি কিনে ফেললাম। এরপর অক্সফোর্ডের এক বন্ধুর কাছ থেকে টিভি কীভাবে কাজ করে, সেটা বুঝে নিয়ে ওই যন্ত্রের

সঙ্গে জুড়ে দিলাম, আর তাতেই আমি পেয়ে গেলাম আমার নিজের একটা কম্পিউটার। তখন সবাই অবাক হতো আমার কাণ্ড দেখে। তবে এসব ব্যাপারে আমি কখনোই আটকাইনি।

আমার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন গণিতবিদ। আমরা ছিলাম চার ভাই। আমি ছিলাম সবার বড়। আমরা সব জায়গায়ই গণিতের মজা খুঁজে ফিরতাম। একটা পুডিং বানাতে গেলেও গণিতের হিসাব-নিকাশ করতাম মজা করার জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়কার কথা। অন্যরা যখন দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াত, আমরা তিন বন্ধু তখন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতাম। চুম্বক নিয়ে মজার কাণ্ড ঘটাতে চাইতাম। সেই ছোট্ট বয়সেই আমরা ঠিক করে ফেলেছিলাম, আমরা বিজ্ঞান নিয়ে একটা বই লিখব। বইটা যেহেতু হবে গবেষণামূলক, তাই বিভিন্ন বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করার জন্য আমাদের বাসার পেছনে মাটির নিচে একটা গবেষণাগার বানানোর চিন্তাও এসেছিল আমাদের মাথায়!

সায়েন্স ফিকশন পড়ার অভ্যাস আমার খুব ছোটকাল থেকেই। আর্থার সি ক্লার্ক, আগাথা ক্রিস্টি, জন উইন্ডহ্যাম ছিলেন আমার প্রিয় লেখক। আমি যখন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম, তখন আমাদের স্কুলটা ছিল দুই রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায়। তখন স্টেশনে ট্রেন থামলেই আমি খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করতাম ট্রেনের ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিগুলো। আমার মনে হয়, ছোটবেলার এসব অভিজ্ঞতাই আজ আমাকে বিজ্ঞানী বানিয়েছে।

অনেকে আমাকে বলে, আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্যবহার করে অনেক বড়লোক হতে পারতাম। আমি নিজেও সেটা জানি। আমি যদি আমার আবিষ্কার সবার জন্য উন্মুক্ত না করে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমি আজ অনেক পয়সা কামাতে পারতাম, রাজকীয় জীবন যাপন করতে পারতাম। কিন্তু তাহলে ওয়েব এভাবে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারতাম না। আমি সব সময় চেয়েছি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যেন দুনিয়ার সব মানুষের কাজে আসে। আর তা আজ সত্যি হয়েছে। ওয়েব এখন আর শুধু কয়েকটি কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক নয়, ওয়েব এখন অসংখ্য মানুষের নেটওয়ার্ক। আমি চাই না মানুষ আমাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উদ্ভাবক হিসেবে মনে রাখুক। আমি চাই, সবাই আমাকে মনে রাখুক একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই। আমি একজন সাদাসিধে কম্পিউটার প্রোগ্রামার ছিলাম, আমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলাম, যেটা মানুষের কাজে লেগেছিল। এবং আমি যদি সেই প্রোগ্রামটা তৈরি না করতাম, তাহলে অন্য কোনো মানুষ করত সেটা।

সূত্র: ইন্টারনেট। ইংরেজি থেকে অনূদিত।

কখনোই থেমে গেলে চলবে না: বিল ক্লিনটন

উইলিয়াম জেফারসন বিল ক্লিনটন। জন্ম ১৯ আগস্ট ১৯৪৬। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৯৩ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত। ২০১১ সালের ১৯ মে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন ।

অভিনন্দন স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী সব শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার, বন্ধু ও অভিভাবকদের। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও, যারা এ সফলতা অর্জনে সহায়তা করেছে। আজ তোমরা জীবনের আরেকটি অসাধারণ অংশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, যা তোমাদের জন্য অনেক আনন্দের। আমার মনে হয়, ৪১ বছর আগে আমিও ঠিক তোমাদের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষে। আমার এখনো সবকিছু মনে আছে, যা সেদিন আমাদের সমাবর্তন বক্তা যা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য শুরু হওয়ার ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আঘাত হানল প্রচণ্ড এক ঝড় এবং বক্তা বললেন, ‘যদি তোমরা আমার বক্তব্যের কপি পেতে চাও, আমি অবশ্য তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া দরকার, নয়তো ঝড় আমাদের ধ্বংস করে দেবে।’ আজ অবশ্য ঈশ্বর পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তোমাদের জন্য এটা সুখকর নয় কি?

আজ আমি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, তাঁদের জন্য, যাঁরা 'স্টার্ন স্কুল অব বিজনেস'-এ কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নিয়ে বা যাঁরা সারা দেশে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠিন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও শুধু চলা নয়, উন্নত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এখানকার শিক্ষার্থী, কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের প্রচেষ্টা, বিশ্বকে বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশুপাচার রোধের চেষ্টা, যা টেকসই ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করবে।

তোমরা বাস করছ ইতিহাসের এক পারস্পরিক নির্ভরতার যুগে। পারস্পরিক এ অধীনতা মানে হলো চারপাশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে তোমরা জানো, যা আগের প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে তোমরা নিজেদের গল্পগুলো বাঁচিয়ে রাখবে। নিজের লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছাবে, নিজের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে ধরে রাখবে এমন একটি পৃথিবীতে, যা উত্তম; মন্দ নয় এবং যেখানে নেতিবাচক শক্তিগুলোর পতন ঘটিয়ে সত্যের জয় হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনে আমি দুটি পরামর্শ দিতে চাই। প্রথমটি হলো জীবনের প্রতিটি দিনে সুখের সন্ধান করতে হবে; সবকিছু শেষ হয়ে গেলে নয়, জীবনের এই যাত্রার শেষেও নয়। সেই শক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তোমরা পেয়েছ। দ্বিতীয়টি হলো কখনো থেমে গেলে চলবে না, জীবনের কঠিন সময়গুলোতে হেরে গেলে চলবে না এবং পরিস্থিতি থেকে সবকিছুর ইতি টেনে চলে যাওয়াও চলবে না। স্বপ্নপূরণের এ যাত্রায় যতটা এগিয়ে গেছ, সেখান থেকে তোমরা বেরিয়ে আসতে পারবে না, তালগোলও পাকিয়ে ফেলবে না, এমনকি জীবনের সবকিছু হারিয়ে গেলেও না। যখন তুমি স্বপ্নপূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন এটা তোমার মন, প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জয় করবেই।

এখন আমি বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বলতে চাই। কীভাবে তুমি একে দেখতে চাও? তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ বিশ্বকে কীভাবে রেখে যেতে চাও? আমি জানতাম, আমি এ পৃথিবীকে কীভাবে দেখতে চাই। আমি চেয়েছিলাম, সুযোগ ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার জায়গা হিসেবে পৃথিবীকে দেখতে, যেখানে সব বিভেদ দূর করে আমরা জাতি গঠন করতে সক্ষম হব।

এমন একটি পৃথিবী আমরা পেয়েছিলাম, যা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারি। সেখানে আমরা আমাদের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য উদ্যাপন করব। কিন্তু আমাদের মানবতাবোধের মূল্য থাকবে সবচেয়ে বেশি। সে রকম একটি পৃথিবী যদি আমরা পেতে চাই, তবে প্রশ্ন হলো কীভাবে সেই পৃথিবী আমরা অর্জন করতে পারি? আমাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো

দূর করে ইতিবাচক গুণাবলির স্ফুরণ ঘটাতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নেতিবাচক দিকগুলো প্রতিহত করা। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তা মোটেও স্থিতিশীল নয়। শুধু যে সংঘাত, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিবাদ দুটি দেশের সীমানা অতিক্রম করছে তা নয়, মহামারির মতো সীমানাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা একটি জায়গা থেকে শুরু হয়ে তা ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আমাদের এমন একটি উপায় বের করতে হবে, যা অস্থিতিশীলতা প্রতিহত করে বিশ্বের শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

আমাদের এ পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি, যা পরিবর্তনশীল। কিছু মানুষ বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে আগ্রহী, কারণ এই আগ্রহ তাদের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের পথ সহজতর করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গ্রিনল্যান্ডের বরফখণ্ড গলতে শুরু করেছে। যদি পুরোটা গলে যায়, তবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে তা গালফ হ্রদকে আটকে দেবে এবং উত্তর ইউরোপ, কানাডাসহ বিশ্বের উত্তরাংশ ৭০০ বছর আগের সেই ‘মিনি আইস-এজ’-এর মতোই শীতল হয়ে উঠবে। আমাদের এমন একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে, যাতে কার্বনসহ ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি আমরা হ্রাস করতে পারি।

আবারও প্রশ্ন হলো, তোমরা কীভাবে সেটা সম্ভব করবে? আজ আমি শুধু এ কথাই বলতে চাই যে দরিদ্র দেশগুলোতে যে ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে ধনী দেশগুলোর প্রতিবন্ধকতার মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে। দরিদ্র দেশগুলোতে যা প্রয়োজন তা হলো ‘সিস্টেম’। আমরা হয়তো সত্যিই মর্মাহত হব, যদি হঠাৎ মাইক্রোফোনটি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা লাইটগুলো নিভে যায়। কিন্তু আমি আমার জীবনের বেশকিছু সময় এমন জায়গায় কাটিয়েছি, যেখানে মানুষ এসব মেনে নেয়। তাদের প্রয়োজন ‘সিস্টেম’। তাদেরও তোমাদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত প্রজন্ম আছে, যারা বিচক্ষণ ও পরিশ্রমী। কিন্তু সুযোগের অভাবে তারা সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। আমাদের এখানে সিস্টেম আছে, যা আমাদের জীবন সহজ করে দিয়েছে। একে বিস্তৃত করতে হবে। অনেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু অর্জনের চেয়ে শুধু বর্তমানের লাভের কথাই ভাবে।

পৃথিবীকে সবার জন্য নির্মাণ করতে হলে একে ভাগ করে নিতে হবে সবার মধ্যে। আর এ পৃথিবীকে ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেওয়ার মতো পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা এখানে সবাই আছি, আমাদের মধ্যে হয়তো এই মিলটি আছে, যা মানবতাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

একটি মানব জিনম প্রজেক্ট প্রকাশ করেছে যে মানুষের বর্ণ, জাতিগত বিভেদের পার্থক্য শতকরা আধা ভাগ। তাই আশা, রইল, এ বিভেদ দূর হবে। পৃথিবীতে উন্নয়ন আসবে, যদি সত্যিকারের সাধারণ একটি সমাজব্যবস্থা এবং পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক প্রচেষ্টার সৃষ্টি হয়।

গুড লাক। ঈশ্বর সহায় হোন।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শিখতী সানী

আমরা সবাই 'জিনিয়াস' -ডেভিড শেংক
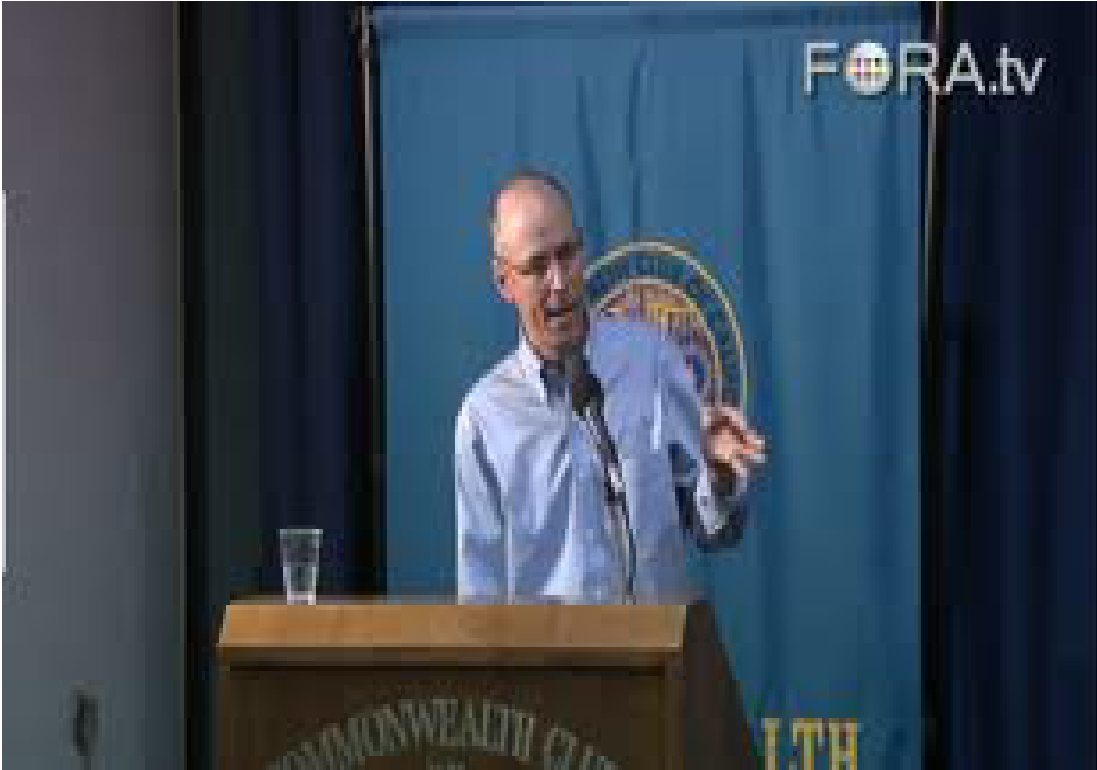
'সবকিছু জিনেই আছে'—জিনবিজ্ঞানের এই বেদবাক্যকে একরকম উড়িয়ে দিয়ে ডেভিড শেংক বলছেন, 'জিন, প্রতিভা আর জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা ভুল!' সমপ্রতি এ নিয়ে তাঁর আলোচিত-সমালোচিত বই 'দ্য জিনিয়াস ইন অল অব আস'। এই বইতে

তিনি বলছেন, 'আকাশ-সমান স্বপ্ন আর স্বপ্নজয়ের অদম্য সাহস থাকলে নিরলস শ্রমসাধনার মাধ্যমে যে কেউ হতে পারে মহাজ্ঞানী আইনস্টাইন-নিউটন বা খ্যাতনামা খেলোয়াড় টেড উইলিয়ামস-মাইকেল জর্ডান অথবা সর্বকালের সেরা সংগীতজ্ঞ বেটোফেন-মোজার্ট।' জিনের কথিত জাদুখেলায় যুক্তির জল ঢেলে ডেভিড শেংক দেখাতে চেয়েছেন যে সবার জিনেই সুপ্ত আছে প্রতিভা। সেই প্রতিভা জাগিয়ে তুলতে চাই তীব্র ইচ্ছা, মনঃসংযোগ আর অবিরত অনুশীলন। এসবই বলেছেন ৪৩ বছর বয়সী ডেভিড শেংক তাঁর 'দ্য জিনিয়াস ইন অল অব আস' বইতে।

'সোনালি জিন' বলে কিছু নেই

কে বলেছে আপনি একজন বিশ্বমানের অ্যাথলেট হতে পারবেন না? বা একজন সুরসম্রাট কিংবা একজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী? হয়তো হাসাহাসি শুরু হবে, যদি বলি, যে কেউ যা কিছু করতে চাই বা যা কিছু হতে চাই, তা সম্ভব। কিন্তু এও কি হাসির ব্যাপার নয় যে, আপনি নিজের ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ না করেই আর সর্বোচ্চ সময় না দিয়েই নিজের ক্ষমতা-দক্ষতা বা প্রতিভার কাল্পনিক একটা সীমারেখা তৈরি করেন? আইনস্টাইন বা বেটোফেনের দিকে তাকিয়ে অনেকেই বলেন, তাঁদের প্রতিভা হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত। আসলে জন্মের সময় স্রষ্টার দেওয়া 'সোনালি জিন' বলে কিছু নেই। প্রকৃতিগত নয়, বরং প্রতিভা হলো অদম্য ইচ্ছা আর প্রশিক্ষণের ফল।

প্রতিভায় কোনো পরিধি নেই

জিন যেমন আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, একইভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই জিনকে প্রভাবিত করে। তাই জিনে মানুষের দক্ষতার কোনো স্থায়ী সীমারেখা থাকতে পারে না। আসলে আমাদের ক্ষমতার খবর আমরা নিজেরাই জানি না। 'জিন' নামের প্রবাদ-পাথরে প্রতিভার কোনো পরিধিই আঁকা নেই। প্রতিভা হলো কোমল কাদামাটির মতো, যা দিয়ে বানানো যায় মনের মতো মূর্তি। বিনয়, স্বপ্ন, অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি আর লক্ষ্য ছোঁয়ার অটুট সংকল্প থাকলে যেকোনো বয়সে আপনিও হতে পারেন বিশ্বখ্যাত প্রতিভার অধিকারী।

জিনিয়াস হওয়ার জিন

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বা প্রতিভা জীবাশ্ম জ্বালানি নয় যে তা একটা সময়ে এসে ফুরিয়ে যায়। কার্যত এটা হলো বায়ুশক্তির মতো। ইচ্ছেমতো কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত হওয়া যায়। জিনিয়াস হওয়ার জিন সবার মধ্যেই আছে। আমরা দরকারি পরিবেশ-প্রতিবেশ আর মানসিকতার অভাবে ভেতরের আলোটা ভালোভাবে বের করে আনতে পারছি না। ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী অ্যান্ডারসন এরিকসন ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর একটা পরীক্ষার কথা বলা যায়। তাঁরা জানার চেষ্টা করেছেন, কী এমন জিনিস বা প্রক্রিয়া যা কিছু মানুষকে বিশেষ বা বিখ্যাত বানিয়ে দেয়? তাঁরা এই প্রতিভা-পরীক্ষার গিনিপিগ হিসেবে এস এফ নামের এক যুবককে বেছে নেন। যুবকটি মাত্র সাত অঙ্কের সংখ্যা স্মরণে রাখতে পারত। গবেষণার শেষে এসে দেখা গেল, আশির চেয়েও বেশি অঙ্কের সংখ্যা সে দিব্যি মনে রাখতে পারে। তার মানে, স্মৃতির কোনো ধরাবাঁধা সীমারেখা নেই! টেড উইলিয়ামস, মাইকেল জর্ডান, মোজার্ট বা বেটোফেনের প্রতিভার কথা সবাই জানি। মনে করার কোনো কারণই নেই যে তাঁদের জিন ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত। ওই ভাবনার আজ সময় ফুরিয়েছে। আসলে তাঁদের সবার মধ্যে একটা মিল আছে—প্রত্যেকেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন নিজের দক্ষতাকে শানানোর জন্য। খালি চোখে দেখলে তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলনই শুধু চোখে পড়ে; কিন্তু আরও গভীরে গেলে ধরা পড়ে, তাঁরা আরও অনেক বেশি এবং জীবন দিয়ে সাধনা করেন। অদম্য আগ্রহ, অবিরত অনুশীলন

যুক্তরাষ্ট্রের বেসবল কিংবদন্তি টেড উইলিয়ামস। বলা হয়, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরপ্রদত্ত খেলোয়াড়। কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, 'নিজেকে যতটুকু উজাড় করে খেলি, আমার অর্জনটাও সে রকম। একমাত্র অনুশীলনই সেই খ্যাতি এনে দিয়েছে আমাকে। শৃঙ্খলা মেনেছি সব সময়। অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কিছু নয়, আমার সফলতার কারণ আমার অদম্য আগ্রহ আর অনুশীলন।' হ্যাঁ, তিনি এমনই অনুশীলন করতেন যে কখনো কখনো আঙুল ফেটে রক্ত ঝরছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই যেন নেই। এ রকম অনুশীলন করেছেন কখনো? হতাশার কিছু নেই। স্বপ্নটা আঁকড়ে ধরুন। সংকল্পে অটল থাকুন। নিয়মিত অনুশীলন করুন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায়ই আপনার প্রতিভার প্রমাণ দেবে।

নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: জাহাঙ্গীর আলম

অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্ভাবনা বাড়ায় : মার্ক জাকারবার্গ

ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৯৮৪ সালের ১৪ মে। তিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে চালু করেন সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ফেসবুক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও তিনি লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। ফোর্বস সাময়িকী ঘোষিত ৩০-এর কম বয়স্ী সফল ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছে (২০১১) জাকারবার্গের নাম।

ফেসবুক নিয়ে আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে আরও উন্মুক্ত, আরও সংযুক্ত করা। ব্যাপারটা এমন, যখন মানুষ তার কাছের সব মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর পুরো প্রক্রিয়াটা এমনভাবে দাঁড় করানো হয় যে তারা নিজেদের মনের সব কথা, নতুন চিন্তাচেতনা তার চোখে প্রিয় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে। ফলে অসংখ্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। মানুষ নতুন জিনিস শিখবে, তার চারপাশে ঘটে যাওয়া নতুন ঘটনা, নতুন প্রযুক্তি, নতুন গান, সিনেমা–সবকিছু নিয়েই ভাববিনিময় হবে। মানুষ যখন একে অন্যের সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করবে, তখন একটা বিশাল সম্ভাবনার সূচনা হবে। তাই আমাদের ফেসবুক মিশনের একটা বড় অংশ ছিল কীভাবে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষকে সংযুক্ত করতে পারি। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে ৮০ কোটির বেশি মানুষ

এখন ফেসবুক ব্যবহার করছে। প্রতি মাসেই এ সংখ্যা বাড়ছে। যদি সাত বছর আগের কথা চিন্তা করেন, যখন আমরা শুরু করেছিলাম–তখন আজকের এই অবস্থান আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

মজার বিষয় হলো, আমি যখন কলেজে ছিলাম, আমরা বন্ধুরা মিলে এসব নিয়েই কথা বলতাম। আমরা প্রতি রাতে পিৎজা খেতে যেতাম আর আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতাম। ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা ভাবতাম, ভবিষ্যতে হয়তো এমন কিছু একটা আসবে, যেটা দিয়ে মানুষ তার কাছের মানুষের সঙ্গে সহজেই ভাববিনিময় করতে পারবে, যেটা একটা সামাজিক নেটওয়ার্কের মতো হবে। আমরা ভাবতাম, এ রকম নেটওয়ার্ক বানানোর জন্য নতুন কোনো প্রযুক্তি আসবে। আশ্চর্যের কথা হলো, আমরা নিজেরাই সেই সামাোজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরিতে বিশাল অবদান রাখতে পেরেছি।

সব মানুষেরই নিজেকে প্রকাশ করার একটা অন্তর্নিহিত ইচ্ছা থাকে। সব সময়ই। এটা মানুষের একটা অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলা চলে। আপনার বন্ধু বা কাছের মানুষদের জীবনে কী ঘটছে বা আপনার প্রিয় মানুষটির চারপাশের বিষয়গুলো আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেন, তাই না? যেসব মানুষ সম্্পর্কে আপনি আগ্রহ দেখান বা যাঁদের নিয়ে দেখান না, সবাই কোনো না কোনোভাবে আপনার সামাজিক বৃত্তে আবদ্ধ। ফেসবুক আসার আগে আপনি তাঁদের সম্পর্কে খুব বেশি একটা কিছু জানতেন না। ভেবে দেখুন, গত পাঁচ বছরে সামাজিক যোগাযোগ কতটা সহজ হয়েছে। এখন আপনি দ্রুত বুঝতে পারছেন কোন জিনিসটা জানা জরুরি। নতুন গান, নতুন ভালো সিনেমা দেখতে পারছেন; আপনার বন্ধুরা কী দেখেন সেটাও জানতে পারছেন। সব মিলিয়ে আপনার নিজের জীবনযাপনের ধরনই পাল্টে যাচ্ছে। এই সেবাগুলো সামনের দিনগুলোতে আরও পাল্টে যাবে, পাঁচ বছর পরে এই সেবার কতটা উন্নতি হবে, সেটা ভাবতেই আমি শিহরিত হই।

আমি মনে করি, মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতর। এখানে কোনো নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা বলা যায় না। আমরা আমাদের ফিচারগুলো এমনভাবে তৈরি করছি, যাতে আপনি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সেই ছোট ছোট গ্রুপের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ রাখতে পারেন। ৩০ থেকে ৪০ কোটি মানুষ তাদের কিছু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একবারের জন্য হলেও ফেসবুক ব্যবহার করে। আর পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সবার সঙ্গে শেয়ার করার মতো উপায়ও এখন আমরা

দিচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি সব ধরনের প্রয়োজন মেটাতে। আমার অনেক বন্ধুর ছোট ভাইবোন এখন হাইস্কুল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। তাদের জন্য আমার প্রথম পরামর্শ হলো, প্রোগ্রামিং শেখার চেষ্টা করো। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে শুধু প্রকৌশলীদেরই নয়, প্রায় সব পেশাতেই কিছু না কিছু প্রোগ্রামিংয়ের জ্ঞান দরকার হবে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন একজন কম্পিউটার প্রকৌশলীর বেতন যা ছিল, তা এখন ৫০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণও হয়েছে। অর্থনীতির ধরন বদলে যাচ্ছে আর প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যারভিত্তিক কোম্পানিগুলোই সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

ফেসবুক শুরুর গল্পের দুটো ব্যাপার উল্লেখ করার মতো। এটা নিয়ে আমার বড়সড় কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমার টাকা-পয়সাও তেমন ছিল না। আমি আক্ষরিক অর্থেই আমার ডরমিটরির রুমে বসে ফেসবুকের কোড লিখেছিলাম। ওখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল ফেসবুক। মাত্র ৮৫ ডলারে আমি সার্ভার ভাড়া নিয়েছিলাম আর সে ভাড়াও দিতাম একটা বিজ্ঞাপন থেকে। পুরো ব্যাপারটারই শুরু খুব ছোট্ট একটা চিন্তা থেকে। তারপর আস্তে আস্তে সেটা বড় হয়ে উঠেছে। তাই আমি বলব, দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করা, যাঁরা নিজেদের ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন। আর দ্বিতীয়ত, সেই চিন্তাগুলোকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া। ঐতিহ্যগতভাবেই যুক্তরাষ্ট্র এ দুটো দিকেই খুব ভালো। এ দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং নতুন কিছু করার ঝুঁকি নিতে উৎসাহ ও স্বাধীনতা দিয়েছে।

আপনি কি এভাবে চিন্তা করেছেন, আপনি প্রতিদিন যা যা করেন, সব কাজের মধ্যে কোন কোন কাজ আরও আনন্দ নিয়ে, ভালোভাবে করা যায়, যখন আপনি সেগুলো অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে করেন? নিশ্চয় সব নয়, কিন্তু অনেকগুলোই করেন। আমরা মনে করি, ঠিক এই জায়গাটাতেই ফেসবুক ভূমিকা রাখতে পারে। এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে আপনি আপনার চারপাশের বন্ধুরা কে কী করছে তা দেখতে পারেন। আমরা ফেসবুককে এভাবেই গড়ে তুলছি।

ফেসবুকের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, আমরা গ্রাহকদের ব্যাপারে সেই তথ্যগুলোই জানি, যা তাঁরা জানাতে চান। বেশির ভাগ মানুষই নিজের সবকিছু শেয়ার করতে চান না, কিন্তু তাঁদের হাতে যদি সেই নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় যে তাঁরা শুধু তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে, অথবা পরিবারের সঙ্গে, অথবা খুব সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন, তবে তাঁরা সেটাই করেন।

মানুষের শেখার একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। যখন সামাজিক যোগাযোগ প্রথম শুরু হলো, কিছু মানুষ খুব অল্প তথ্য অনেক বিস্তৃত আকারে প্রচার করত। আমি মনে করি, ফেসবুকের জনপ্রিয়তার এটাও একটা কারণ। ফেসবুকের 'প্রাইভেসি অপশন' এখন সবাই ব্যবহার করছে এবং ফেসবুকই প্রথম কোম্পানি, যারা এ ধরনের প্রাইভেসি চালু করেছে, যাতে কিছু বিষয় আপনি শুধু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন অথবা আপনার ছুটির ছবিগুলো শুধু আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন।

ফেসবুক ব্যবহারকারীদের আচরণও কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে। আমরা হার্ভার্ডে ছোট পরিসরে যেটা শুরু করেছিলাম, সেটাই এখন ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ ব্যবহার করছে। এর মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কম্পিউটারে শুধুই ফেসবুক ব্যবহার করেন, কম্পিউটার চালনায় তাঁরা খুব দক্ষ নন। এ ধরনের মানুষের পক্ষে ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রাইভেসি কন্ট্রোলের পদ্ধতি বোঝাটা বেশ কঠিন। তাই আমরা কয়েক বছর ধরে এটাকে এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে আপনি যা-ই শেয়ার করুন তার প্রাইভেসি সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই ঠিক করে দেওয়া যায়। আপনি যদি এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে সেখানে একটি গ্লোব আসে, যাতে 'পাবলিক' কথাটি লেখা থাকে এবং আপনি যদি অল্প কয়েকজনের সঙ্গে শেয়ার করেন, তাহলে সেটিতে 'ফ্রেন্ডস' কথাটি লেখা থাকে। এবং মাত্র একটি ক্লিকেই আপনি এই অপশনটি যেকোনো পোস্টের জন্য যেকোনো সময় পরিবর্তন করতে পারেন।

আমি মনে করি, কাজ করা এবং শেখার বেলায় আপনি যত বেশি মানুষের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন, আপনার শেখার মাত্রাও তত বাড়বে। আমার মনে হয়, এটাই সব সময় সত্যি। আমি ফেসবুককে সচল রাখার জন্য সবকিছুই করি আর নিজের জীবনযাপনকে যতটা সম্ভব সাধারণ রাখি। ৭ নভেম্বর ২০১১ চার্লি রোজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

সফল হওয়ার ইচ্ছাটা থাকা চাই -জে কে রাউলিং
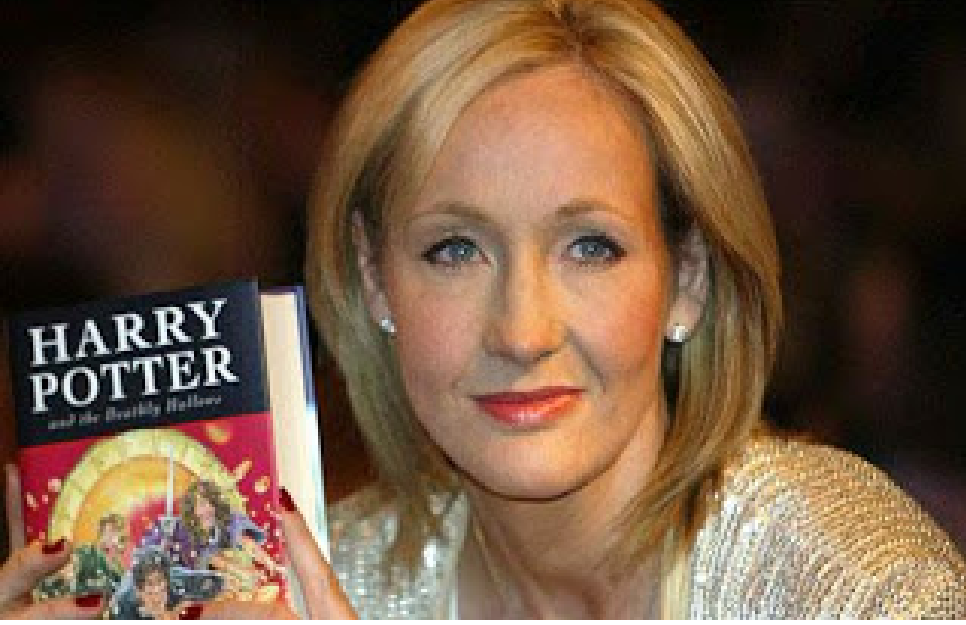
ব্রিটিশ লেখক জে কে রাউলিংয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হ্যারি পটার সিরিজের জন্য। ছোটবেলা থেকেই মজার মজার গল্প লিখতেন তিনি, আর সেই গল্পগুলো লেখা শুরু করেছিলেন তাঁর বোনকে পড়ে শোনানোর জন্য। জে কে রাউলিং এখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক এবং ব্রিটেনের শীর্ষ ধনী নারীদের মধ্যে ১২তম। ২০০৮ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন উপলক্ষে তিনি এই বক্তব্যটি দেন।

সমাবর্তন উপলক্ষে বক্তব্য দেওয়া বিশাল একটি দায়িত্ব। আমি আমার সমাবর্তনকে মনে করছি। তখন সমাবর্তন স্পিকার ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ব্যারোনেস মেরি ভারনক। তাঁর বক্তব্যের প্রতিফলন আমাকে সাহায্য করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আমার লেখায়।

আসলে আমি আমার মন ও হৃদয়কে একটি ছকে বেঁধেছিলাম এবং কী শপথ করেছিলাম, তা-ই আজ বলব। আমি আমাকেই জিজ্ঞেস করতাম, কী চাই? ২১ বছরে স্নাতক পাস করেছি, ডিগ্রি অর্জন করেছি, কিন্তু আমি কী শিখেছি আমার শিক্ষাজীবন থেকে? এখান থেকে আমি দুটো উত্তর পেয়েছি। আমাদের একাডেমিক সাফল্য উপলক্ষে যেদিন সবাই একত্র হয়েছিলাম, সেদিন আমি আলোচনা করেছিলাম, আমার সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার মধ্যে আমার লাভ কী? আমার জীবন আর তোমাদের জীবনের মাঝের যে সময়টুকু সেটাই 'বাস্তব জীবন'।

আমি চাই, আমার মতো তোমাদেরও কল্পনার শিখা যেন অনেক উজ্জ্বল হয়। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার ২১ বছর বয়সী জীবনে, যখন সবে গ্র্যাজুয়েশন করেছি। তখন আমি নিজেই আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। আমি চাইতাম লিখতে, উপন্যাস লিখতে। আমার মা-বাবা দুজনের কেউই কলেজে যাননি। তাঁরা খেয়াল করতেন, আমার উচ্চকল্পনাশক্তি আছে। কিন্তু তাঁরা আশা করতেন, আমি যেন একটি কারিগরি ডিগ্রি অর্জন করি। আর আমি চেয়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তে। আমি তখন একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলাম যে কেউই তার অবস্থানে খুশি নয়। তারপর আমি আধ্ুনিক ভাষা নিয়ে পড়া শুরু করলাম।

আমি মনে করতে পারি না যে আমার মা-বাবা কখনো বলেছেন, আমি ভালো পড়াশোনা করি। আমি যেদিন গ্র্যাজুয়েশন পূর্ণ করি, সেদিনই হয়তো তাঁরা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, আমি পড়াশোনা করি। আমি আমার মা-বাবার দৃষ্টিকোণকে দোষ দিই না। যদি তোমার হাতে স্টিয়ারিং থাকে এবং তুমি ভুল পথে যাও, তখন তোমার মা-বাবাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। কারণ স্টিয়ারিং তো তোমার হাতেই ছিল। আমার মা-বাবা গরিব ছিলেন, ফলে আমিও। তাঁদের সঙ্গে আমি একমত, দারিদ্র্য খারাপ কোনো অভিজ্ঞতা নয়। দরিদ্রতার মধ্যে আছে ভয়-ভীতি, কষ্ট আর হতাশা। এই দরিদ্রতাকে জয় করতে হয় নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। এটা যখন প্রয়োজন ঠিক তখনই হতে হবে। মনে রাখা উচিত, বোকাদের কাছে দরিদ্রতা রোমাঞ্চকর হতে পারে, তোমার কাছে নয়।

আমি তোমাদের বয়সে ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক দূরে একটা কফিশপে বসতাম আমার গল্প লেখার জন্য। ক্লাসেও মনোযোগ দিতাম লেকচারের প্রতি। পরীক্ষায় পাস করার পর প্রতিবছরই আমি আমার সাফল্যের কথা হিসাব করতাম।

আমি জানি, তোমরা এখন প্রাপ্তবয়স্ক, এখন উচ্চশিক্ষিত। তো সেই তোমরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারবে না, তা আমি মানি না। বুদ্ধিমত্তা কখনোই ভাগ্যের কারণে ব্যর্থ হতে পারে না এবং আমি এক মুহূর্তের জন্যও তা মনে করিনি। তোমরা হার্ভার্ড থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছ, তোমরা ব্যর্থতার সঙ্গে ততটা পরিচিত নও। সফল হওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে ব্যর্থতা সম্পর্কেও তোমাদের একটু হলেও ধারণা থাকা ভালো। প্রকৃত পক্ষে, ব্যর্থতা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আর একজন মানুষের সফলতা সম্পর্কে ধারণা খুব বেশি দূরের নয়।

একসময় আমার জীবনটা অন্ধকারে ছিল। আমার কোনো ধারণা ছিল না, কী হচ্ছে বা কী হতে যাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল না, এই অন্ধকারের খালটি কত বিস্তৃত হবে। তবে কেন

জানি মনে হতো, একটি দিক থেকে হয়তো আলো আসবে।

আমি নিজের ওপর বিশ্বাসের জোরটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি আমাকে বোঝাতে চাইতাম, আমি কী। তার পর থেকে আমি সরাসরি আমার শক্তি বা সামর্থ্যকে ব্যবহার করেছি কোনো কাজের ভালো একটা ইতি টানতে। আমি বিশ্বাস করতাম, আমি যেকোনোভাবেই সফল হব। আমার সাফল্য কখনোই কোনো নির্দিষ্ট একটা পথ বেয়ে আসেনি। আমি বিশ্বাস করতাম, আমি সত্যিকার অর্থেই আমার সঙ্গে আছি। আমি নিজেকে মুক্ত করেছিলাম। কারণ আমার ছিল নিজেকে চেনার বিশাল এক ক্ষমতা। আমি বিশ্বাস করতাম আমাকে। আমি আমার নিম্নবিত্ত মা-বাবার মেয়ে ছিলাম। আমার একটি পুরোনো টাইপ রাইটার ছিল এবং এর সঙ্গে ছিল বড় একটা স্বপ্ন। এ বাস্তবতাই আমাকে নতুন করে, সক্ষম করে গড়ে তুলেছে।

আর আমার ছিল কল্পনা করার ক্ষমতা। এটার একটা অংশই আমাকে পুনরায় গড়তে সহায়তা করেছে, কিন্তু পুরোটা নয়। আমি শিখেছি, বিশাল এক অনুভূতির মধ্যে কল্পনার বা কল্পনাশক্তির কী মূল্য। কল্পনাশক্তিই আবিষ্কার আর অনাবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। কল্পনাশক্তি যদি প্রবল হয়, তবে সফল হওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, করতে হবে এর যথাযথ ব্যবহার। সবাই পারে না। যারা পারে তারাই সফল। সুতরাং তুমি নিজেই ঠিক করো, তুমি কোন দলে থাকবে।

আমার সফলতম অভিজ্ঞতা হলো হ্যারি পটার। আমি একনাগাড়ে, পর্যায়ক্রমে লিখে গেছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি শুরু হয়েছিল আমার চাকরির শুরুর দিকে। আমি তখন চাকরি করতাম লন্ডনের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তরে আফ্রিকান গবেষণা বিভাগে। অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আসত, যেখানে থাকত কী ঘটছে সেখানে, আর ঘটনাগুলো যেন সারা বিশ্ব জানতে পারে। আমি তাদের ভয়ানক ছবি দেখেছিলাম। আমি সেসব মানুষের অত্যাচারের ছবি দেখেছি।

প্রায় প্রতিদিনই আমি মানুষের ওপর মানুষের নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ হয়ে তারই স্বজাতি মানুষের ওপর আঘাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এবং এখন পর্যন্ত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনেক কিছু শিখছি, যা এর আগে কখনো শুনিনি, শিখিনি।

যা-ই হোক, আমার সর্বশেষ আশার কথাটি বলছি। আমি যখন ২১ বছরে ছিলাম, তখনকারই

কথা। যাদের সঙ্গে আমি গ্র্যাজুয়েশনের দিন একসঙ্গে বসেছিলাম, তাদের অনেকেই আজ তাদের নিজ গুণে মানবসেবা এবং মানুষের জন্য কাজ করছে। অনেকেই শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। তারা অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের জন্য মৃত্যুভয়কেও হটিয়ে দিয়েছে। আমাদের গ্র্যাজুয়েশনে আমরা প্রচুর আশার মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, যা আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে হয়েছিল। এ রকম কখনোই আর আসবে না।

সুতরাং আজকের দিনে তোমাদের মধ্যে সে রকম বন্ধুত্ব ছাড়া বেশি কিছু থাকার কথা নয় এবং আগামীকাল আমি আশা করি, যদি তুমি আমার একটি শব্দও মনে রাখো, তবে একটু হলেও সাহস পাবে সামনে চলার। যদি এটা গল্পের মতো হয়, তবে এটাই জীবন। সেটা কত দীর্ঘ, তা নয়, কত ভালো এটাই হচ্ছে বিষয়।

(ইন্টারনেট থেকে নেওয়া, সংক্ষেপিত ভাষান্তর: মোহাম্মাদ আলী)

পরিশ্রম করলেই কেবল ভাগ্য সহায় হয় -জেমস ক্যামেরন

জেমস ক্যামেরন। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রই নির্মাণশৈলী ও

ব্যবসা-সফলতার ক্ষেত্রে ইতিহাস গড়েছে। টারমিনেটর-২ (১৯৯১), টাইটানিক (১৯৯৭) কিংবা অ্যাভাটার (২০০৯)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ক্যামেরন ১৯৫৪ সালের ১৬ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

আমার ছোটবেলা কেটেছে কানাডার ছোট্ট একটা শহরে। শহরের তীরঘেঁষে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী, যেখানে আমরা রোজ খেলতাম। নায়াগ্রা জলপ্রপাত ছিল মাত্র চার বা পাঁচ মাইল দূরে। পানির সঙ্গে তাই একটা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, যা আমার কাজেও বারবার উঠে এসেছে। মা ছিলেন গৃহিণী, খ্ুব ভালো ছবি আঁকতেন। আর বাবা ছিলেন প্রকৌশলী। মায়ের সঙ্গে জাদুঘর দেখতে যেতাম; তাই যখন থেকে আঁকতে শিখেছি, তখন থেকেই জাদুঘরের বিভিন্ন স্মারকের অবয়ব আঁকতে চাইতাম, সেটা হোক না পুরোনো কোনো যোদ্ধার হেলমেট কিংবা মিসরীয় কোনো মমি। এসব কিছু আমাকে আবিষ্ট করে রাখত। আবার প্রকৌশল চর্চাতেও আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড। হতে পারে বাবার সম্মান ও পছন্দকে ধরে রাখার জন্য এটা একটা চেষ্টা ছিল। কিংবা হতে পারে তা প্রযুক্তির প্রতি একটা ভালোবাসা, যা আমি রক্তের টান থেকে অনুভব করেছি।

শিশু বয়সেই আমি সব সময় কিছু একটা নির্মাণ করতে চাইতাম। ‘চলো বানিয়ে ফেলি একখানা ঠেলাগাড়ি, চাকাগুলো নিয়ে আসো, তুমি সেটা ঠিক করো...।’ যখন পেছনের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমি আজকের এই আমিকেই সেখানে খুঁজে পাই। মনে পড়ে সেই ছোট্টকালে একটা উড়োজাহাজ বানাতে উঠেপড়ে লেগেছিলাম, আজও তো তেমনটিই করছি, পার্থক্য এই যে এটি বানাতে এখন ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ পড়ে যায়। শিক্ষাজীবনে খারাপ নই, ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিলাম। কারণ পুরোটাই ছিল জানার প্রতি আমার সহজাত তীব্র আকর্ষণ। আমি কাউকেই খুশি করার জন্য পড়িনি। কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পড়াশোনাও হয়নি যে কাউকে টপকে ভালো করতে হবে। আমি জানতে চাইতাম, শিখতে চাইতাম–বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত সবকিছু। অবসর সময়ে শহরের পাঠাগারগুলোয় সময় কেটে যেত আমার। অনেক সায়েন্স ফিকশন পড়েছি, যা বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝের রেখাকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট করে তুলেছে। বই আর লেখকদের অভিনব জগৎ আমাকে অদ্ভুতভাবে টানত। আর্থার ক্লার্ক, জন ভগ্ট, হার্লান এলিসন, ল্যারি নিভেন সবাই আমাকে প্রভাবিত করেছেন।

একাদশ গ্রেডের সময় আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জীববিজ্ঞানের শিক্ষক ম্যাকেঞ্জি ঠিক করলেন আমাদের স্কুলে একটা থিয়েটার বানাবেন। স্কুলে রেসলিং, ফুটবল, বাস্কেটবলের

আয়োজন থাকলেও থিয়েটার ছিল না। আমরা নেই থেকেই কাজ শুরু করেছি। দৃশ্য, পেছনের পর্দা, পোশাক সব উপকরণের জোগাড় করতে হয়েছে। তারপর নাটক প্রযোজনা করেছি। পুরোটাই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। এবং আমরা সফল হয়েছি। নিয়ম মেনে ঠিকঠাকভাবেই এগিয়েছিলাম। আমাদের পুরো প্রকল্পটাই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। সেটা সম্ভব করেছিলেন ম্যাকেঞ্জি। এটাই তাঁর অভিনব একটি বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই আমি মনে করি, জীবনের সঠিক সময় এমন কিছু ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য, যাঁরা তোমাকে বদলে দেবে, তোমার ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের উপহার মনে করি না। নিজেকে অন্য শিশুদের চেয়ে আলাদা করে দেখারও কিছু নেই। নিজেকে সবার থেকে আলাদা বানিয়ে দেয় চারপাশের পরিবেশ এবং তোমার অভিনব ক্ষমতা। আমি জীবনের ১০টি বছর এমনভাবে কাটিয়েছি, যেখানে আমাকে শুনতে হয়েছে আমি ইডিয়ট কিংবা একটা জোক ছাড়া কিচ্ছু নই। তার পরের ২৫ বছর আমার চেষ্টাটা ছিল শুধু নিজেকে একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে তৈরি করা। সফলতা সেখানে সামান্যই এসেছে। সফল হওয়ার জন্যই কি আমার নিয়তিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল? ঠিক বলতে পারব না। তবে আমি মনে করি, যত পরিশ্রম করবে ততই ভাগ্য তোমার সহায় হবে। দীর্ঘ পথের অর্জনে ‘সুযোগ’ বড় কোনো কিছু নয়। কিন্তু একটি মাত্র সুযোগ সবকিছু বদলে দিতে পারে। তবে সেখানেও ওই সুযোগকে চেনার একটা ব্যাপার আছে, সুযোগ কাজে লাগাতে পারার একটি ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই সফল হতে পারেননি, কারণ তাঁরা অনেক বেশিই ভেবেছেন এবং খুব সতর্ক ছিলেন, কিন্তু আত্মবিশ্বাসী হয়ে পা ফেলার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। যদি তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে সুযোগও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

জীবনের অনেকটা সময় ধরেই বুঝতে পারিনি যে ছবি বানাব, ছবির নির্মাতা হব, বিজ্ঞানকে নিয়েই গভীরভাবে মগ্ন ছিলাম। ছোটবেলার অনেকটা সময় পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে মাইক্রোস্কোপের পর্দায় খুঁজতাম প্রোটোজোয়া। কখনো টেলিস্কোপে চোখ মেলে নক্ষত্ররাজিতে হারিয়ে যেতাম। আমার চিন্তাভাবনার পরিসরটা ছিল বিজ্ঞানের বিচিত্র দিককে ঘিরেই। আঁকার প্রতি টান সব সময়ই ছিল। পদার্থবিজ্ঞান আর গণিত নিয়ে পড়াশোনার পাঠ শেষ হলো। তারপর এক অসহনশীল শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে ক্যালকুলাসের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে। আমি ইংরেজি বিষয়ে মনোনিবেশ করি, কারণ আমি লিখতেও চাইতাম খুব। এ দুই দিকে উদ্ভ্রান্ত পথ চলতে চলতে ২৫-২৬ বছরে আমি ঠিক করি, ছবি বানানো নিয়ে অগ্রসর হব। নিজেকে ভেবেছিলাম ছবি বানানোর কারিগর হিসেবে, পরিচালক হিসেবে নয়। তবুও...

যে ছবিগুলোর তেমন কোনো বাঁধাধরা প্যাটার্ন নেই, সেগুলোই এসে আমার পছন্দের তালিকায় হাজির হয়। আমি দেখেছি, নিয়মকানুন আমার জন্য ঠিক কাজ করে না। ভালো লাগে যেখানে অনেক হাঙ্গামা থাকবে, শব্দ থাকবে, অস্থিতিশীলতা থাকবে–পরিপূর্ণ কিছু নয়। সেখানেই তো নিজেকে উপস্থাপনের সুযোগ মেলে। যদি সবকিছু তোমার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত কিংবা টিপটপ হয়ে থাকে, তবে জাদুকরি কোনো কিছু উপহার দেওয়ার জন্য দরজাটা তো খোলা যায় না। পরিচালকের মন থেকে তো আর মোহনীয় জাদুর স্পর্শটা প্রতিফলিত হয় না, এটা আসে অভিনয় কুশলীর আত্মার মধ্য থেকে। আন্দোলিত হয়েছি উডস্টক, দ্য গ্র্যাজুয়েট, বান এন্ড ক্লাইড, দ্য গডফাদার, স্টার ওয়ারস প্রভৃতি ছবি থেকে।

ছবি বানানোর কথা শুনে পরিবার কখনোই তেমন সন্তুষ্ট হয়নি। বাবা নারাজ ছিলেন, তিনি আসলে আমার ব্যর্থ হওয়ায় অপেক্ষায় ছিলেন, যেই মুহূর্তে তিনি জানাবেন যে আমার আসলে একজন প্রকৌশলী হওয়াই উচিত ছিল। তাঁর পক্ষ থেকে সহয়তা ছিল একেবারে শূন্য। মা অবশ্য অনেক আগে থেকে এ ধরনের সৃষ্টিশীল শিল্পের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাই আশ্চার্য এক গতি ছিল সেখানে, যা আমাকে দীর্ঘ সময়েও এ পথ চলতে সাহায্য করেছিল, যদিও তা দেখতে পাওয়া ছিল দুষ্কর।

যখন ছবি বানানো শুরু করলাম তখন মনে মনে কী অর্জন করতে চেয়েছি সেটা নিয়ে বলা কঠিন। আমার মনের মধ্যে তখন অসংখ্য ছবি, ফ্রেম, দৃশ্যের আনাগোনা করছিল। অনেক বেশি বিজ্ঞান কল্পকাহিনির রাজত্ব ছিল সেখানে। ভিন্ন পৃথিবী আর ভিন্ন পরিবেশের জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার জন্য এটা ছিল কল্পনা কিন্তু পুরোদস্তুর কল্পনাই কি ছিল তা? পুরোটা জীবন আমাকে অনেক অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে। অনেক শিখেছি সেখান থেকে। আজও শিখছি। তবে শেখাগুলোকে নিয়েই আরও মহৎ কিছু তৈরি করার বড় শিক্ষাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া। টাইটানিক ছবিটি আমার সব শেখাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অসংখ্য শিল্পীর কাজ ছিল সেখানে। সবার কাছে এত প্রভাবিত হয়েছি যে মনে হয়, তাঁদের ছাড়া এতটা সম্ভব হতো না।

যখন তুমি কোনো বৃহৎ ক্ষেত্রে কাজ করবে ও অনেককে নিয়ে তোমার কাজ করতে হবে তখন আত্ম সন্দেহের প্রয়োজন নেই। যদি তোমার কাজ খারাপ হয় তবে তুমি তাঁদের কাছ থেকে সেখানকার ভুলগুলো সম্পর্কে সমালোচনা শুনবে, যদি ভালো হয় তবে তুমি ভালোই শুনবে। অনেকেই তোমার সঙ্গে থাকবেন, যাঁরা তোমাকে পথ এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাই সন্দেহের কোনো স্থান এখানে নেই। এমন আবহাওয়াতেই আমরা কাজ করি।

ছবি বানানোর যে বিশাল ক্ষেত্র সেখানে কিছু পদ্ধতি কখনোই পরিবর্তিত হয় না। প্রযুক্তি আর নির্মাণকৌশলের সব ধারাটাই বদলাতে থাকে। এগুলোর বদল দিয়েই ছবির ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে। দৃশ্যপট বদলে যায়। সেখানে সংযোজন ও বিয়োজন ছবির চাওয়াকে সবার সামনে তুলে ধরে। জীবনের ছকটা তো সে রকমই।

অ্যাকাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট থেকে পাওয়া।

১৯৯৯ সালের ১৮ জুন দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: শিখিত সানী

তুমিই জয়ী হবে -মাইকেল জ্যাকসন

আট বছর বয়স থেকেই মঞ্চ মাতানো শুরু। জ্যাকসন ফাইভ ব্যান্ডদলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যটি এ সময় পরিচিতি পান নিজের নামেই। শুধু গান নয়, নাচ, ফ্যাশন–সবকিছুতেই মাইকেল জ্যাকসন (১৯৫৮–২০০৯) ছিলেন অনবদ্য। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাঁকে দিয়েছে সর্বকালের সেরা এন্টারটেইনারের খেতাব। পেয়েছেন কিং অব পপ উপাধিও। পাশাপাশি

কাজ করে গেছেন সারা বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য। 'হিল দ্য ওয়ার্ল্ড' ফাউন্ডেশন গড়েছেন এ কাজের জন্য। ২০০১ সালের ৬ মার্চ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে 'হিল দ্য কিডস' উদ্যোগটি পরিচিত করার জন্য এ বক্তব্য দেন তিনি।

এখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমার কী কী যোগ্যতা আছে–সে কথা বলেই বোধহয় শুরু করা উচিত। বন্ধুরা, আমার আগে এখানে যাঁরা বলে গেছেন, তাঁদের মতো পড়াশোনা আমার নেই। ঠিক তেমনই আমার মতো 'মুনওয়াক' করার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। তবে একটা দাবি আমি করতেই পারি, বেশির ভাগ মানুষের তুলনায় দুনিয়াটা আমার অনেক বেশি দেখা হয়েছে। শুধু কাগজ আর কালিতে তো ধরা যায় না মানুষের জ্ঞান। হৃদয়ে যে কথা লেখা হয়ে থাকে, আত্মায় যা গেঁথে যায়, শরীরে যা খোদাই হয়ে যায়, সেসব মিলিয়েই তৈরি হয় মানুষের জ্ঞান। আর এই জীবনে আমি যত কিছুর মুখোমুখি হয়েছি, তাতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমার বয়স মাত্র ৪২! অনেক সময় আমার মনে হয় বয়স বোধ হয় ৮০ ছাড়িয়ে গেছে।

আমার অর্জনগুলো দিয়ে কিন্তু আমার ভেতরের মানুষটাকে চেনা যাবে না। ভক্তদের সামনে রকিন, রবিন বা বেন গাইতে থাকা পাঁচ বছরের শিশুটি আর তার হাসির আড়ালে থাকা শিশুটি এক নয়। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকেই গান গাইছি, নাচছি। কাজটা আমার জন্য খুব আনন্দেরও। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম গাছ-বাড়ি বানিয়ে, লুকোচুরি খেলে আমার শৈশবটা কাটাতে। আমার আশপাশের শিশুদের এমন জীবন দেখে হিংসা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার। আমার কোনো শৈশব নেই– এই বোধটাই আমাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল।

আমি এসব তোমাদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বলছি না। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বোঝানোর জন্যই বলছি। আজ শুধু হলিউডের শিশুরাই নয়, সারা বিশ্বেই শিশুরা ভুগছে এই বেদনায়, শৈশব না থাকার কষ্টে। এখন শিশুদের ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠার জন্য। যেন শৈশব খুব কষ্টের সময়। এটাকে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে হবে। আর এর ফলে শিশুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মা-বাবা ও পরিবারের কাছ থেকে।

এই বিচ্ছিন্নতা থেকেই যেন জন্ম নিয়েছে এক নতুন প্রজন্মের। আমি সেই প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি। আমাদের বাইরেটা ঝাঁ চকচকে–টাকা-পয়সা, দামি কাপড়চোপড়, বিলাসবহুল গাড়ি। কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। এটা শুধু আমাদেরই যন্ত্রণা নয়, আমাদের মা-বাবারও।

আজ আমি শিশুদের অধিকারের কথা বলতে চাই। প্রতিটি বাড়িতে প্রতিটি শিশুর এই অধিকার থাকবে:

১. ভালোবাসা পাওয়া।

২. সুরক্ষা পাওয়া।

৩. মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হওয়া। হয়তো সে কিছুই করতে পারেনি, তবুও সে মূল্যবান।

৪. শিশুর সব কথা মন দিয়ে শোনা—তা খুব উপভোগ্য না হলেও।

৫. ঘুমোতে যাওয়ার আগে অন্তত একটা গল্প শুনতে পাওয়া—সন্ধ্যার খবর বা টিভি সিরিয়ালের সময়টা যাতে এ জন্য বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

৬. স্নেহ পাওয়া—হয়তো মা ছাড়া আর কারও কাছেই শিশুটি সুন্দর নয়, তবুও।

বন্ধুরা, আমাদের সব জ্ঞানের, বোধের শুরুটা হোক এভাবে—আমরা জানি আমাদের কেউ না কেউ ভালোবাসে।

প্রায় ১২ বছর আগের কথা। আমার ব্যাড ট্যুরের আগে ছোট্ট একটি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে আমাকে, আমার গান কত ভালোবাসে, সেসব বলল। ছেলেটি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিল। তার মা-বাবার কাছ থেকে জানলাম, যেকোনো দিন সে মারা যেতে পারে। আমি ছেলেটিকে বললাম, 'তিন মাসের মধ্যে আমি তোমার শহরে গান গাইতে আসব। তোমাকে আমার এই জ্যাকেটটা দিলাম। এটা পরেই কিন্তু তুমি আমার গান শুনতে আসবে।' তাকে আমার পাথর বসানো দস্তানাও দিয়েছিলাম। সাধারণত আমি কাউকে দস্তানা দিই না। পরে শিশুটির শহরে গিয়ে শুনি সে মারা গেছে। তার সমাধিতে দেওয়া হয়েছে আমার সেই জ্যাকেট আর দস্তানা। তার বয়স ছিল মাত্র ১০। কিন্তু একটাই সান্ত্বনা, সে জেনে গিয়েছিল তাকে কেউ ভালোবাসে। তার মা-বাবা শুধু নন, আমার মতো একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষও তাকে ভালোবাসে। সে জেনে গিয়েছিল, এই পৃথিবী থেকে সে একা বিদায় নিচ্ছে না।

পৃথিবীতে আসার আগে আর পৃথিবী ছাড়ার সময় তুমি যদি জানতে পার, কেউ তোমাকে ভালোবাসে, তাহলে যেকোনো পরিস্থিতিই খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকেরা তোমাকে তিরস্কার করতে পারেন, তোমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা চাপ দিতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিই জয়ী হবে। কীভাবে কেউ তোমাকে আটকাবে! তোমার তো ভালোবাসার শক্তি আছে।

কিন্তু যদি এই শক্তিটা তোমার না থাকে, গোটা জীবন চলে যাবে তার খোঁজে। যত বিখ্যাতই হও, যত ধনীই হও, ভেতরটা তোমার ফাঁকাই রয়ে যাবে। কোথা থেকে আমাদের মধ্যে এত ক্রোধ, বেদনা আর সহিংসতা আসে! উত্তরটা আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

কাজ শেষে মা-বাবারা বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু অনেকেই মাথাটা রেখে আসেন অফিসে। আর তাঁদের শিশুরা পায় মা-বাবার ছিটেফোঁটা মনোযোগ। তাদের মধ্যে ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছাটাই মরে যায়। নিজের মতো করে বেড়ে ওঠে তারা। পেছনে ফেলে যায় মা-বাবাকে।

আমি তোমাদের অনুরোধ করব, এমন ভুল তোমরা কেউ কোরো না। যদি ভাবো, মা-বাবা তোমাদের অবহেলা করেছেন, তাঁদের ক্ষমা করে দাও। তাঁদের শেখাও, কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

আমার বাবা ছিলেন বেশ দক্ষ একজন ব্যবস্থাপক। আমি ও আমার ভাইয়েরা সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে ঋণী। তিনি কোনোদিন আমার সঙ্গে খেলেননি। আমার চোখে চোখ রেখে বলেননি আমাকে তিনি কত ভালোবাসেন। আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতাম। কিছুদিন পরপরই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম রান্নাঘরে আমার জন্য এক ব্যাগ ডোনাট রাখা আছে। আমার বাবা কোনোদিন আমাকে সেটা বলেননি। কত দিন ভেবেছি, রাতে জেগে থাকব আর তাঁকে ডোনাট রাখার সময় ধরে ফেলব। কিন্তু আমি এই মজার খেলাটা নষ্ট করতে পারিনি এই ভয়ে, তিনি হয়তো আর কোনোদিন আমার জন্য ডোনাট আনবেন না।

তিনি আমার জন্য কী করেননি, সেসব নিয়ে আমি আর ভাবি না। তিনি কতটা করেছেন, সেটাই ভাবি।

বাবা খুব দরিদ্র পরিবারে বড় হয়েছেন। আমাদের বড় পরিবার চালাতে হতো তাঁকে। ইস্পাত কারখানায় কাজ করতেন তিনি। এমন কাজ, যা আস্তে আস্তে অনুভূতিগুলো ভোঁতা করে দেয়। তিনি যে আমাদের সফল হওয়ার জন্য এত চাপ দিতেন, এটা কি খুব আশ্চর্যের? তাঁর

শাসনটাকে আমি আজ ভালোবাসা হিসেবেই দেখি। সেই ভালোবাসা নিখুঁত নয়, কিন্তু ভালোবাসা তো! তিনি চাইতেন কেউ যেন তাঁর সন্তানদের ছোট করতে না পারে। আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আমার শুরুর দিকের রাগের অনুভূতিটা এখন ক্ষমায় পরিণত হয়েছে।

এক দশক আগে গড়ে তুলেছিলাম দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিল দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি এর সাফল্যে বিশ্বাস করি? আমি কি বিশ্বাস করি, এই পৃথিবীটার ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারব? নিশ্চয়ই করি। না করলে আজ আমি এখানে আসতাম না। কিন্তু এর শুরুটা হতে হবে ক্ষমা দিয়ে। কারণ পৃথিবীর ক্ষত সারিয়ে তোলার আগে নিজের ক্ষত শুকাতে হবে। আজ আমি বুঝি, আমি কখনোই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারব না, যদি না আমার শৈশবের ক্ষতগুলোর কথা ভুলে যাই। তাই তোমাদের বলছি, মা-বাবাকে সম্মান করো। তাঁদের কাজের বিচার করতে যেয়ো না। তাঁদের সুযোগ দাও।

ক্রোধ, হতাশা আর অবিশ্বস্ত এই পৃথিবীতেই আমাদের বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে ভালোবাসা, স্বপ্ন আর বিশ্বাস নিয়ে। যারা মনে করো তোমাদের মা-বাবা তোমাদের যথেষ্ট ভালোবাসেন না, তোমরা তাঁদের দিকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দাও। শর্তহীন ভালোবাসা দাও তাঁদের, যাতে তাঁরা নিজের সন্তানের কাছ থেকেই শিখতে পারেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, দুর্বল কখনো ক্ষমা করতে পারে না। আজ তাই তোমরা শক্ত হও। শৈশবের ক্ষতের যা প্রভাব আজকের জীবনে পড়ছে, তা কাটিয়ে ওঠো।

আজ থেকে শোনা যাক এক নতুন সংগীত। সে সংগীত শিশুদের হাসির। চলো সবাই মিলে সারিয়ে তুলি এই পৃথিবীর যত ক্ষত, বেদনা। সবাই সুখী হও।

ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ.

আপন ইচ্ছার অনুসারী হও -কফি আনান
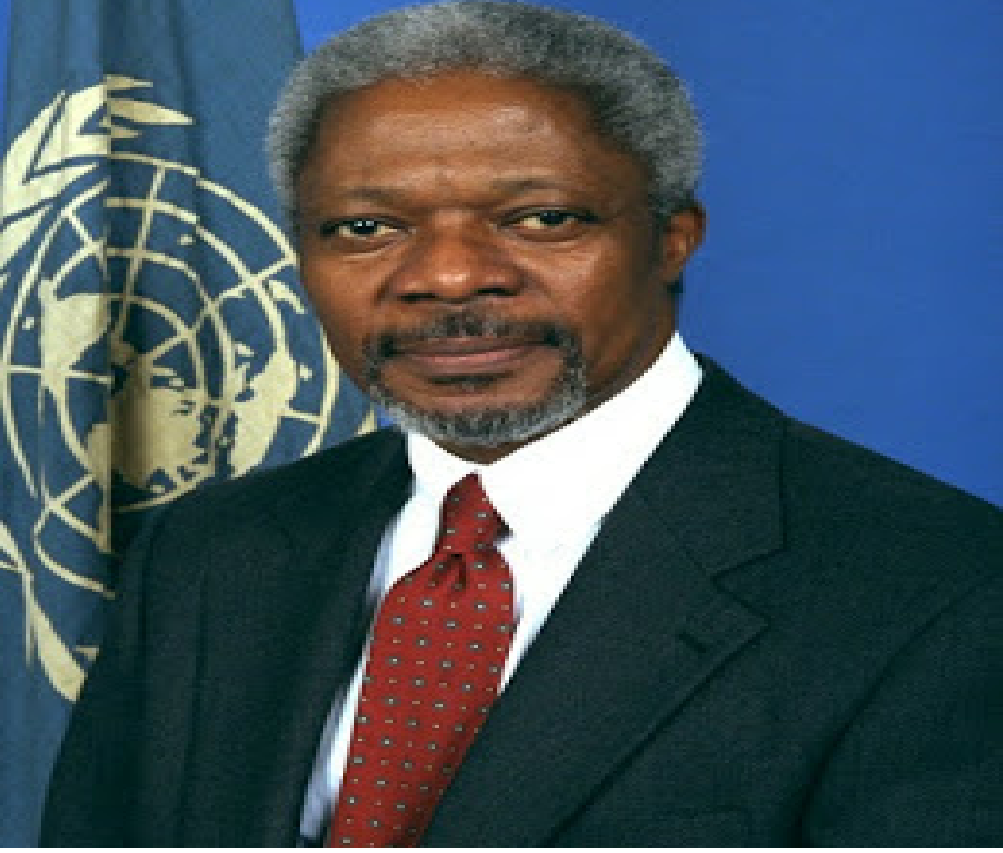
কফি আনান। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ৮ এপ্রিল ঘানায়। তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ২০০১ সালে, যৌথভাবে জাতিসংঘের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে এমআইটি স্লোন স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব থাকাকালীন ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) সমাবর্তনে তিনি এই বক্তব্য দেন।

পরিচিত পরিবেশে জমকালো এই উৎসবে তোমাদের অভিনন্দন জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। উচ্চশিক্ষার জন্য বোস্টনে বেশ ভালো কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কোনোটাই এমআইটির মতো নয়।

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, ট্রাস্টিজ ও সুধী, আসুন, এমআইটির সবচেয়ে মেধাবী ও উজ্জ্বল, নিবেদিতপ্রাণ ও স্বাপ্নিক শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভিনন্দনে সিক্ত করি। কিন্তু হে গ্র্যাজুয়েটরা, শোনো, তোমরা নিশ্চয় খুব ভালো করেই জানো যে এটা তোমরা একলাই করোনি। তাই

এসো, যারা সব সময় তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তোমাদের মা-বাবা ও প্রিয় বন্ধুদের করতালির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাই।

তোমরা এখন মুক্ত, পরীক্ষার চাপ থেকে মুক্ত। তোমাদের সামনে এখন অবারিত জীবনের নতুন যাত্রাপথ। শিক্ষাজীবনের যত ঋণ, যত দায়, সেসব শোধার সময় এখন।

আজ যেখানে তোমরা বসা, একদিন আমিও সেখানটায় বসেছিলাম। কিলান কোর্টে আজ তোমাদের এই আনন্দমাখা মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ২৫ বছর আগের কথা। তখন আমি এই এমআইটিতে পড়তাম। এখানে স্লোন ফেলো (এমআইটিতে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স) হিসেবে আমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলাম। শিখেছিলাম আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই।

শুরুতে সহপাঠীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ ছিল। আমি বলব, সবার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। সফল হওয়ার জন্য এবং নিজ নিজ নেতৃত্বগুণ প্রমাণের জন্য প্রত্যেকেই সমান সংকল্পবদ্ধ ছিল। আমাদের মধ্যে কোনো মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল না। আমি অসম্ভব রকম খুশি যে সেটা আজ বদলেছে।

প্রথম পর্বের মাঝামাঝি সময়ের কোনো একদিন চার্লস নদীর তীরে হাঁটছিলাম। হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম আমার উদ্বেগ আর সংশয় নিয়ে। এত মেধাবীর ভিড়ে কীভাবে টিকে থাকব, কীভাবে সফল হব? জবাবটা যেন ভেতর থেকেই পেলাম, 'অন্যকে অনুকরণ কোরো না, আপন ইচ্ছার অনুচারী হও। হৃদয়ের কথা শোনো।' বাঁচতে হলে বাছতে হবে। কিন্তু বাছবিচারের আগে তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে, তুমি কে? তোমার স্বপ্ন কী? তোমার গন্তব্য কোথায়? কেন সেথায় যেতে চাও তুমি? দেখলাম, ধীরে ধীরে আমার উদ্বেগ উবে গেল।

এমআইটি থেকে ফল হিসেবে আমি শুধু যে একধরনের বিশ্লেষণী শক্তি অর্জন করেছিলাম তা-ই নয়, নতুন যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া কিংবা যেকোনো চ্যালেঞ্জকে সম্পূর্ণ নতুন কিছু সৃষ্টির সম্ভাব্য সুযোগ হিসেবে দেখা এবং কাজের বেলায় সহকর্মীর মতামত নিলেও শেষে নিজের কাজটা নিজের মতো করেই করা ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আস্থা বা আত্মবিশ্বাসটাও অর্জন করেছিলাম এমআইটি থেকে।

এমআইটির অ্যালামনাইদের কথা যখন কেউ ভাবে, দেখে এঁদের মধ্যে কেউ পদার্থবিজ্ঞানে, কেউ রসায়নে, কেউ বা অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আবার কেউ হয়েছেন সফল

ব্যবসায়ী, কেউ বা প্রকৌশলী, যাঁরা নানা উপায়ে আমাদের জীবনমান আরও উন্নত করে চলেছেন। কিন্তু কেউ কী ভেবেছে, জাতিসংঘের একজন মহাসচিব হবে এমআইটি থেকে? কোনো টিভি কুইজে চটপট এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া একটু কঠিনই ছিল বটে।

যা হোক, আমরা এমন এক জাতিসংঘের স্বপ্ন দেখি, যেটি আরও বেশি বন্ধুপ্রতিম হবে। এই পরিবর্তন তার নিজের জন্য নয়, যেন ভালো কিছু করার জন্য সবাই সুযোগ পায় সে জন্য। আরও স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ আরও বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আরও বেশি দায়িত্বশীল জাতিসংঘের স্বপ্ন দেখি আমর্া। আমরা সেই জাতিসংঘ চাই, যা শুধু তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের জন্য নয়, বরং গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করবে গোটা বিশ্বের সব মানুষের জন্য।

আমরা নিজ নিজ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করি। জীবনে সংগ্রাম করাটাই তো চিরসত্য। দরিদ্র দেশের ছোট্ট কোনো গাঁয়ে নাকি বেকন হিলে–কোথায় একটি শিশু জন্ম নিল সেটি মুখ্য বিষয় নয়। আমি বিশ্বাস করি সব মানুষের আত্মমর্যাদা ও মৌলিক সাম্যতায়। আমি বিশ্বাস করি, সব মানুষ শান্তি চায়। আমরা অসাধারণ সুন্দর এক পৃথিবীর বাসিন্দা। যদিও তা বিভক্ত বিভিন্ন দলে, তবু আমরা এক মানবসম্প্রদায়ের অংশ।

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তোমাদের সহযোগিতা দরকার। ১৯৯৭ সালের এই ব্যাচের তোমরা যে যেখানেই যাও, ভবিষ্যতে যে যা-ই করো না কেন, তোমরা সেই পৃথিবীতে যোগ দিতে যাচ্ছো, উত্তরোত্তর যার বিশ্বায়ন ঘটছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেখানে তোমরা সবাই এক হয়ে কাজ করবে। সবার কল্যাণ হ্োক।

এমআইটির ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: জাহাঙ্গীর সুর

বিশ্বাস করতে হবে যে সবই সম্ভব: বন জোভি

সংগীতশিল্পী জন বন জোভির জন্ম ২ মার্চ ১৯৬২ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে। বন জোভি ২০০১ সালে ১৬ মে মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ভাষণ দেন।

সব গ্র্যাজুয়েটকে অভিনন্দন। এখন পর্যন্ত তোমাদের সবচেয়ে বিশেষ দিনটিতে কিছু বলতে পেরে নিজেকে আসলেই অনেক গর্বিত মনে হচ্ছে। এখানে আসার আগে গত কয়েক সপ্তাহ শুধু এটা নিয়েই ভেবেছি যে আজ কী বললে তোমাদের জীবনের সামনের দিনগুলোর জন্য তা সহায়ক হবে।

এখন আমার মনের মধ্যে অনেক ধরনের আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক আনন্দ ও প্রতীক্ষা যেমন ভয় ও উদ্বেগে রূপ নেয়– প্রথম দিন কিন্ডারগার্টেনে যাওয়া অথবা স্কুল থেকে কলেজে যাওয়ার দিন, ঠিক তেমন। এখন তোমরা সবাই হয়তো উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে

অথবা পেশাগত জীবন শুরু করবে। কিন্তু তোমাদের শিক্ষাগ্রহণ এখানেই শেষ নয়। মনে করো, তোমার কর্মক্ষেত্রে আরেকটি স্কুল। তাই এ স্কুল থেকে যত পারো শিক্ষা গ্রহণ করো। কোনো পেশাই ছোট নয়, যদি তুমি সেখান থেকে কিছু শিখতে পারো।

হয়তো সংগীতশিল্পে আমি অনেক সার্থক, কিন্তু যখন আমি অভিনয় শুরু করি, তখন অন্য সবার মতো আমারও কাজ খুঁজতে হতো। সংগীতশিল্পী হয়েও আমাকে অনেক দিন অভিনয়ের জন্য অডিশন দিতে হয়েছিল। সত্যি বলতে, অনেক সময় মনে হয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু এ ভয় থেকে অতিক্রম করে কিছু করার ইচ্ছাটা ছিল বেশ। তিন বছর অভিনয় শিখেছিলাম। আর এসবের জন্যই তখন পেয়েছিলাম এক নতুন জীবন। তোমরা অনেকেই হয়তো ঠিক করে ফেলেছ তোমরা কী করবে, কোন কোম্পানিতে কাজ করবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা তা করেনি। লজ্জার কিছু নেই, তাদের জন্যই বলছি, মনে রেখো, জীবনটা হলো একটি ম্যারাথন; জীবনের এই পথ তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, তুমি যেকোনো সময়ই তোমার সে পথ পরিবর্তন করতে পারবে। তাই জীবনের মানচিত্র তৈরি করবে, কিন্তু তা করবে পেনসিল দিয়ে।

আর হ্যাঁ, ব্যর্থতা নিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, ব্যর্থতা হলো একজন মানুষের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। কিন্তু তাই বলে কারও উচিত নয় এটাকে ভয় পাওয়া। বরং এটাই তোমাকে শিক্ষা দেবে, শেখাবে নিজের ও অন্যের অনেক কিছু। আমরা সবাই জীবনের অনেক কাজে বিকল হই। কিন্তু তা হতে পরিত্রাণ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে প্রতিবছরই অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েশন করে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই ভালো জায়গা থেকে আসে না। এর মধ্যেও তাদের সফল হওয়ার কারণ হলো সাফল্যের প্রতি তীব্র উদ্দীপনা, প্যাশন। আর তা না হলে আমি আজ সফল হতাম না।

আমি নিউইয়র্ক বা লস অ্যাঞ্জেলেসের অধিবাসী ছিলাম না, ছিলাম না কোনো ‘রক এন রোল’ বংশের অধিকারী। তবু হয়েছি সফল। হয়তো ছিলাম অনেক প্যাশনেট। অবশ্য তার সম্ভাবনাই বেশি। কোনো কিছু করার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা কাজের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি সমীকরণ আছে তিনটি ‘পি’-এর: ‘প্যাশন + পারসিসটেনস = পসিবিলিটিস’ অর্থাৎ কোনো সাফল্যের সম্ভাবনা হলো সে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনার যোগসূত্রের সমন্বয়। মনে হতেই পারে, কীভাবে বিটলসের মতো এত সুন্দর গানের কথা লিখব, অথবা বিল গেটসের মতো এত মেধাবী অথবা আব্রাহাম লিংকনের মতো এত সাহসী হব? কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হলো বিশ্বাস। আর বিশ্বাস করতে হবে যে সবই সম্ভব। বিশ্বাস

করতে হবে ভালোবাসায়, ম্যাজিকে, ধর্মে। বিশ্বাস করতে হবে অন্যের ওপর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের ওপর। কারণ, তোমাদের মধ্যে অনেকের কাছেই এমন কিছু আছে, যা অন্যের কাছে নেই। তাই গড়ে তোলো নিজকে স্বতন্ত্র, অনন্য করে। জেগে ওঠো, আওয়াজ দাও, অন্যদের তা বোঝাও। আর এটাকেই তোমার শক্তি হিসেবে গড়ে তোলো। সময় নষ্ট কোরো না। সময় নাও, সময়কে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করো। মন দিয়ে সব লক্ষ করো, সব নিয়ে চিন্তা করো। আর এরপর যা করতে ইচ্ছা করবে, তা-ই হবে। কারণ, এখন তোমার মন তাতেই সাড়া দেবে, যা তোমার জন্য ভালো। আর কয়েকটা কথা সংক্ষেপে একসঙ্গে বললে যা হয়: বড় হও, কিন্তু বৃদ্ধ হোয়ো না।

অলৌকিক ঘটনা প্রতিদিন অনেক হয়। এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করো। দেখবে অলৌকিকতা এরপর তোমার আশপাশেই থাকবে।

যতক্ষণ তুমি জীবিত ততক্ষণ জীবনকে উপভোগ করো। এবং তোমার মা-বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ো।

সবার সামনে আমি আজ তাঁদের ধন্যবাদ জানাব। তাঁদের সাহায্য ও আরও অনেক কিছুর জন্য আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে। তোমরা চেষ্টা কোরো এবং পৃথিবীকে জানিয়ে দাও তোমার মূল্য। আজ এটা তোমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা, তোমরা আজ স্বাধীন। বিজয়ের এ দিন শুভ হোক। এটাই তোমাদের প্রাপ্য আর তাই এটাই তোমরা অর্জন করেছ। ভালো থেকো, গুড লাক।

সূত্র: ওয়েবসাইট

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: নাজমুস সাকিব

নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ১০ পরামর্শ : রজার হ্যারোপ

পেশাদার বক্তা ও লেখক রজার হ্যারোপের জন্ম যুক্তরাজ্যে। হ্যারোপ বিভিন্ন কোম্পানির ঊর্ধ্বতন পদে চাকরি করেছেন। এখন তিনি ব্যবসাবিষয়ক পেশাদার বক্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

আমি একসময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের দ্বিতীয় ক্যারিয়ার শুরু করেছি। এখানে আমি কারও হয়ে চাকরি করি না। আমার এই দ্বিতীয় ক্যারিয়ারে আমি একজন পেশাদার বক্তা। এর অংশ হিসেবে দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করে বেড়াই আমি। আমি ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করি। বিভিন্ন বিপদাপন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিপদ বা লোকসান থেকে উদ্ধারের জন্য পরামর্শ দিই আমি। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, আমি আসলে সব প্রতিষ্ঠানের সব সমস্যাকে একটু অন্যভাবে পর্যবেক্ষণ করে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি। আর এটা আমি করতে পারি; কারণ, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে ব্যবসা-বাণিজ্য আসলে তেমন কঠিন কিছু নয়। যা হোক, আজ আমি নতুন উদ্যোক্তাদের (entrepreneur) জন্য ১০টি পরামর্শ দেব।

১ আমার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, সবার আগে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানো। নিজের ভালো দিকটা সবাই জানে, কিন্তু মন্দ দিকটা খুঁজে বের করা আসলে বেশ কঠিন। নিজের সঙ্গে এমন দ্বিতীয় কাউকে রাখো, যে কিনা নির্দ্বিধায় তোমার ভালো-মন্দ দুটো দিকই ধরিয়ে দিতে পারবে। তুমি যদি ভালো করে চিন্তা করো, তাহলে দেখবে দুনিয়াজুড়ে যাঁরাই সফল হয়েছেন, উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁদের সবার সঙ্গেই দ্বিতীয় কেউ ছিলেন, যে কিনা তাঁকে লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সহায়তা করেছেন।

২নিজে কী পেতে চাও, কেন করছ কাজটা, তা থেকে তুমি কী পাবে, কীভাবে কাজে আসবে তোমার উদ্যোগ–সেসব সম্পর্কে একেবারে স্পষ্ট ধারণা থাকাটা খুব বেশি দরকার। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে প্রথমেই।

৩ নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, নিজের কাজের ওপর আস্থা রাখতে হবে। নিজে যা করছ সেটার ওপর যদি নিজেরই আস্থা না থাকে, তাহলে অন্যরা কীভাবে তোমার ওপর আস্থা রাখবে। নিজের ওপর আস্থা না থাকলে তোমার সহকর্মীরাও তোমার ওপর থেকে তাদের আস্থা তুলে নেবে।

৪ নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। যদি তা না থাকে, তবে তুমি কখনোই তোমার কাজে সফল হতে পারবে না। আত্মবিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎ সাহস–এই তিনটি জিনিসই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন উদ্যোক্তার জন্য।

৫ সাহস ছাড়া বড় কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়। ভালো কিছুর জন্য যদি ঝুঁকি নেওয়া দরকার হয়, তবে তা-ই নিতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে সহজ কাজ হলো ঝুঁকি না নেওয়া–এটা সবাই জানে। কিন্তু ঝুঁকি না নিলে নিরাপদে থাকা যায়, তাও কিন্তু সব সময় সত্য নয়। আমি এমন অনেক উদাহরণ দিতে পারব, যেখানে কিনা বংশপরম্পরায় চলে আসা ব্যবসা ধরে রাখতে গিয়ে অনেকেই পুরো ব্যবসাই হারিয়ে ফেলে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এর কারণ একটাই–নতুনেরা তাদের বংশপরম্পরায় চলে আসা ব্যবসাকে নতুন দিনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। কারণ, তারা সব সময় ঝঁুকিমুক্ত থাকতে চেয়েছে, আর এভাবেই যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে তারা সব হারিয়েছে।

৬ আমি আমার জীবনে এমন কোনো উদ্যোক্তাকে দেখিনি, যে কিনা তার আশপাশের মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, কোনো

অবস্থায়ই কারও সঙ্গে বাজে ব্যবহার করা যাবে না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কাজ করতে নামলে অনেকের অনেক কথাই তোমার পছন্দ হবে না, অনেকের অনেক প্রস্তাবেই না বলতে হবে। কিন্তু যা-ই করো না কেন, আশপাশের সবার সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার করতে হবে, কাউকে না বললেও তা সুন্দরভাবে বলতে হবে।

৭ বিকল্প কোনো পরিকল্পনা ছাড়া কখনোই কোনো কাজে নামা যাবে না। মারফির তত্ত্ব কখনো ভুলে যেয়ো না, 'যদি কোনো কাজে কোনো ভুল ধরা পড়ে, তাহলে বিকল্প রাস্তা অনুসরণ করো'।

৮ সব সময় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো। নিজের চিন্তাভাবনাকে জটিল করে তুলো না কখনোই। আমি আগেই বলেছি, ব্যবসা আসলে খুব সহজ। আর এই সহজ কাজটা করতে গিয়ে নিজের আশপাশে অজস্র লোককে ঘেঁষতে দিয়ো না। কারণ, এরা হয়তো অযথা বিভিন্ন ধরনের যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে তোমাকে তোমার মূল লক্ষ্য থেকেই সরিয়ে ফেলবে।

৯ মাথা খাটিয়ে কাজ করো, বল খাটিয়ে নয়। এর মানে হলো, শুধু কাজপাগল হলেই হবে না, অযথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনে ১৮-২০ ঘণ্টা খেটে নিজের ক্ষতি করো না বরং সবচেয়ে কম খাটুনি দিয়ে কোন কাজ কীভাবে করা যায় সেটা খুঁজে বের করো। বুদ্ধিমান মানুষ শক্তি দিয়ে নয়, বুদ্ধির জোরে কাজ করে। সব সময় কেতাদুরস্ত হয়ে অফিসে বসে মিটিং করতে হবে তা নয়, যারা কাজ জানে তারা খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও নিজের কাজটা বের করে নেয়।

১০ সবশেষ এবং সবচেয়ে মূল্যবান পরামর্শটা হলো, জীবনে যা-ই করো না কেন, যেভাবেই করো; জীবনটাকে উপভোগ করো, প্রতিটা দিন থেকে, প্রতিটা মুহূর্ত থেকে আনন্দ খুঁজে নিয়ো। এটা নিশ্চিত যে জীবনের শতভাগ সময়েই আনন্দ করতে পারবে না, তাই বলে কখনোই আশা ছেড়ে দিয়ো না, আনন্দ খুঁজে নিতে না পারো, চেষ্টাটা তো অন্তত করো।

মনে রেখো, নতুন উদ্যোক্তাদের ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন সফল হয়, তুমি যদি তার একজন হতে পারো, তবে মন্দ কী! তোমাকে আগাম অভিনন্দন।

সূত্র: ওয়েবসাইট।
ইংরেজি থেকে অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

স্বপ্ন দেখো আকাশ ছোঁয়ার : বান কি মুন

প্রথমেই সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আমার সামনে বসে থাকা ভবিষ্যতের তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য।

আমার মনে হচ্ছে, আমি ঠিক জায়গায়ই এসেছি কথা বলার জন্য। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৫০ বছরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়; এর কারণ হলো আজকের এই তরুণেরাই সামনের দিনগুলোতে আমাদের নেতৃত্ব দেবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আমার নিজের দেশ কোরিয়ায় গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে আমি আমার ছোটবেলার স্কুলে গিয়েছিলাম। স্কুলে গিয়ে আমার মনে পড়ে গেল আমার অতি প্রিয় এক শিক্ষকের কথা। সে সময় তিনি আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সব সময় একটা কথা বলতেন, ‘নিজের মাথা উঁচু করে ধরো মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে সুদূর আকাশে, কিন্তু নিজের পা যেন মাটিতেই থাকে।’ এ কথাটা আমিও বলতে চাই তোমাদের। তোমরা তরুণ প্রজন্ম অবশ্যই অনেক স্বপ্ন দেখবে, নতুন কিছু করার, বিশ্বকে নতুন কিছু দেওয়ার, কিন্তু যাই-ই চিন্তা করো না কেন, সেটো সফল করার পদ্ধতিটা যেন অবশ্যই বাস্তবসম্মত হয়। সব সময় বড় চিন্তা করো, প্রথাগত স্বপ্নের বাইরে সীমানা ছড়ানো স্বপ্ন দেখো। আমি

তোমাদের বলব, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থীদের সব সময় স্পষ্টবাদী, সাহসী ও নির্ভীক হতে। বড় কিছু করার চিন্তা করো, তোমার ভবিষ্যৎ কিন্তু একেবারে শুধুই তোমার হাতে। নিজের স্বাধীন চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগাও নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য—নিজের চেয়ে বড় কিছু হওয়ার জন্য এবং এটা সম্ভব।

আজ আমি তোমাদের আমার নিজের জীবনের গল্প শোনাব। আমি তোমাদের জানাব আমি কোথা থেকে এসেছি আজকের এ পর্যায়ে। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কোরিয়ায়। দারিদ্র্য আর যুদ্ধ-ঝঞ্ঝার মধ্যেই বেড়ে উঠেছি আমি। জাতিসংঘ আমার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ এবং আমার দেশের অসহায় মানুষকে বাঁচিয়ে ছিল। সে সময় জাতিসংঘের মাধ্যমে অনেক অস্ট্রেলিয়ানও আমার দেশকে সহযোগিতা করেছিল। তাদের জানাই কৃতজ্ঞতা। সেদিন যদি এমনটা না হতো, তাহলে আজ আমি হয়তো এখানে এভাবে আসতে পারতাম না।

আজ যে ‘প্রত্যাশার বিপ্লব’ শুরু হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্ববাসীকে এসব সাহসী জাতির সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। এসব মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে যে নিজের নেতাদের কাছ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে সব মানুষের এবং এটাও জনগণের একটা মৌলিক অধিকার। কোরিয়ায় একটা প্রবাদ আছে, ‘তোমার হাতে যতগুলোই সুন্দর মুক্তা থাকুক না কেন, এগুলো যদি একসঙ্গে একই সুতোয় না গাঁথো, তাহলে কখনোই একটা সুন্দর গলার হার বানাতে পারবে না।’ এই একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা একাকী কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য সব দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যারা একসঙ্গে কাজ করবে, সেসব জাতির সামনেই রয়েছে সুন্দর ভবিষ্যৎ। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, জ্বালানিস্বল্পতা, বিশ্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, খাবারের অভাব দূর করতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যেসব চ্যালেঞ্জের কথা বললাম, সেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে হয়তো আলাদা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জ কিন্তু আসলে একে অপরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এগুলোর যেকোনো একটির সমাধান বের করতে গেলে একসঙ্গে অনেকগুলোর সমাধান করে ফেলা সম্ভব। এসব চ্যালেঞ্জকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে এবং সব জাতিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

কখনোই স্বার্থপরদের সুযোগ দিয়ো না তোমাকে পেছনে ধরে রাখতে; পুরো দুনিয়ায় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা এবং শক্তি তোমার নিজের মধ্যেই আছে। ভবিষ্যতের সুন্দর একটা বিশ্ব গড়তে পারো তুমিই। এ বিশ্বাসটা তোমার থাকতে হবে। নিজের ওপর আস্থা থাকতে

হবে। সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমাদেরই নিতে হবে। তোমরাই গড়ে তুলবে সুন্দর এক পৃথিবী। অনেক শুভ কামনা রইল তোমাদের প্রতি। আশা করি, তোমরা সবাই সামনের দিনগুলোর জন্য নিজের একটা সুন্দর লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মনের জোর

স্যার অ্যাডমন্ড হিলারি
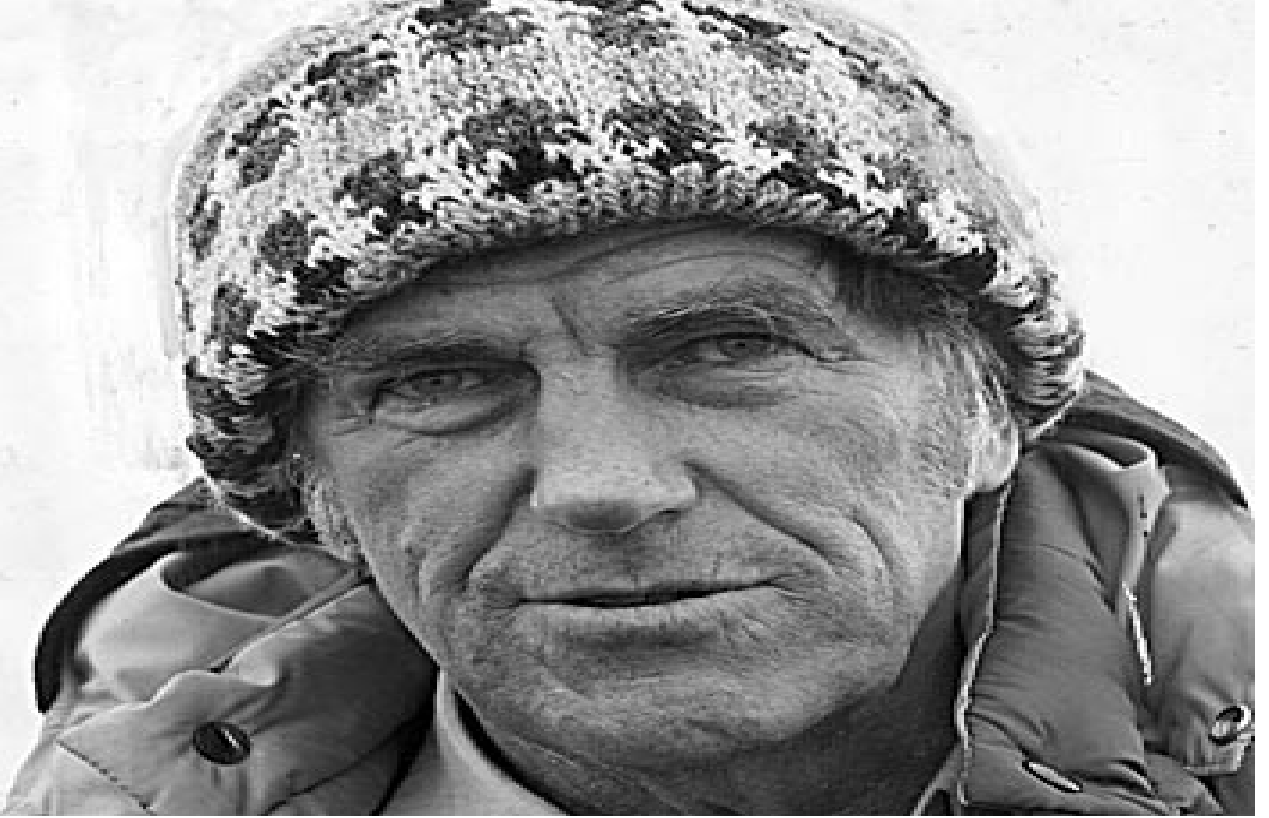
প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী স্যার অ্যাডমন্ড পার্সিভ্যাল হিলারি ২০ জুলাই ১৯১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে তিনি ও শেরপা গাইড তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয় করেন। এর আগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ এই পর্বতশৃঙ্গকে জয় করা মানুষের সাধ্যের বাইরে মনে করা হতো। ২০০৮ সালের ১১ জানুয়ারি স্যার এডমন্ড হিলারির মৃত্যু হয়।

সে সময় নিউজিল্যান্ডে ছেলেমেয়েরা হাইস্কুলে ভর্তি হতো মোটামুটি ১৩ বছর বয়সে। কিন্তু আমি প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সেই হাইস্কুলে ঢুকে পড়ি। আর এমনটা হবেই বা না কেন? আমার মা ছিলেন আমাদের ছোট্ট অকল্যান্ডের একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তিনি আমার লেখাপড়ার বিশেষ যত্ন নিতেন সব সময়। তাই ওই অল্প বয়সেই আমি বেশ ভালো ছাত্র হয়ে উঠি আর ক্লাসে অটো প্রমোশন পেয়ে ১১ বছর বয়সেই হাইস্কুলে ঢুকে পড়ি। তাও আবার নিউজিল্যান্ডের সেই সময়ের সবচেয়ে সেরা স্কুলগুলোর একটায়। যাই হোক, সেখানে গিয়ে দেখি ক্‌্লাসের সবাই আমার থেকে বেশ বড়। আমাকে ওদের মাঝে বেশ ছোট ছোট মনে হতো। তবে বছর খানেকের মধ্যে আমিও ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে উঠলাম। শক্তিশালীও হলাম। নিজের হারানো আত্মবিশ্বাস এভাবেই ফিরে পেলাম। ফলাফল ভালো হতে শুরু করলো ঠিক আগের মতো।

আমি যে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলাম, তা কিন্তু নয়। আমি আসলে এমন ছাত্র ছিলাম, যে কিনা সব সময় নিজের প্রয়োজনীয় লেখাপড়াটা ঠিকভাবে, ঠিক সময়ে করে রাখত। বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমি এই স্বভাবটা পেয়েছি। তাদের দুজনেই নীতির দিক থেকে ছিলেন আপসহীন। বাবা একটা ছোট্ট পত্রিকা সম্‌্পাদনা করতেন। শুধু সম্পাদনা বললে অবশ্য ভুল হবে; তিনি একাধারে ওই পত্রিকার মালিক, প্রকাশক, সম্পাদক, প্রতিবেদক, আলোকচিত্রী—সব ছিলেন। শুধু ঘরে ঘরে পত্রিকা বিলি করার কাজটাই করতে হতো না বাবাকে।

সে সময় দুর্ভিক্ষ শুরু হল। অসৎ কিছু ব্যবসায়ী খাদ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মুনাফা লোটার চেষ্টা করছিল। বাবা এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছিলেন নিজের পত্রিকায়। আমি যদি কোনো দিন খেতে বসে খাবার নষ্ট করার চেষ্টা করতাম, তাহলে মা আমাকে মনে করিয়ে দিতেন এশিয়া মহাদেশের এমন অনেক হতদরিদ্র মানুষের কথা, যারা কিনা খাবারের অভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। তখন ছোট্ট আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে আমি খাবার নষ্ট করলে ওই সব দুর্ভাগা মানুষের কী সমস্যা। অবশ্য বড় হয়ে যখন বুঝতে পেরেছি আসল সমস্যাটা, তখন চেষ্টা করেছি ওই সব হতভাগা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর।

আজ আমাকে বিশ্ববাসী চেনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের জন্য। কিন্তু সত্যি বলতে কি, মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পরে যে বিশ্ববাসীর এত ভালবাসা, সন্মান পাব, তা আমি কখনোই ভাবিনি। আর তার চাইতেও বড় কথা, আমি যে কোনো দিন এভারেস্ট জয় করব, সেটাই কখনো চিন্ত্া করিনি। এমনকি যখন আমি মাউন্ট এভারেস্টের পাদদেশ থেকে যাত্রা শুরু করি, তখনো আমি সংশয়ে ছিলাম এ ব্যাপারে। আমি জানতাম না, আসলে কোনো

মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা।

কৃত্রিম অক্সিজেন ব্যবহার করেও বরফে ঢাকা বিপৎসংকুল ২৯ হাজার ৩৫ ফুট উঁচু কোনো পর্বত পাড়ি দেওয়াটা কোনো সহজ কাজ ছিল না কখনোই। আর শুধু ওপরে উঠলেই তো হয়ে গেল না! ওপরে উঠে আবার নিচেও নেমে আসতে হবে ওই বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে। পৌঁছানোর মাত্র ৩০ ফুট আগেও জানতাম না চূড়ায় পা রাখতে পারব কিনা আদৌ! এমনো হতে পারত, হয়তো চূড়ায় পা রেখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছি বা নেমে আসার সময় বরফের কোনো গুপ্ত ফাটলের নিচে সমাধি হতে পারত। পুরো অভিযান শেষে নিচে নেমে আসার আগ পর্যন্ত জানতাম না এটা কোনো ম‌‌ানুষের পক্ষে সম্ভব কি না। কিন্তু একটা কথা সত্য, আমি এক মুহূর্তের জন্যও মনোবল হারাইনি অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমি তো মনে করি, যেকোনো কাজ সফলভাবে করার জন্য যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো মনোবল। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে শারীরিক সামর্থ্য, কারিগরি দক্ষতা, এমনিকি টাকা-পয়সারও প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজনটা হলো মনের জোর। কঠোর মনোবল, দৃঢ় সংকল্প, প্রবল উৎসাহ ছাড়া কোনো কাজই ঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। এটাই আসলে মূল পার্থক্য গড়ে দেয় একজন সাধারণ মানুষ আর একজন বিখ্যাত মানুষের মধ্যে।

ছোটবেলায় পড়া হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, জর্জ হায়ারের বই পড়ে আমার সময় কাটত। আমি এসব বই পড়ে শক্তি পেতাম। আমার মনোবল শক্ত হয়েছে এভাবেই। আমি মনে করি, খুব বেশি মেধাবী হওয়ার দরকার নেই বিশেষ কিছু হওয়ার জন্য, বা বিখ্যাত হওয়ার জন্য। তরুণদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তোমরা সব সময় বড় কিছু চিন্তা কোরো। বড় কিছু পাওয়ার চেষ্টা কোরো। হয়তো একবারে পারবে না, দুবারেও পারবে না, কিন্তু একসময় বিজয় আসবেই। কোনো কাজ বারবার চেষ্টা করলে সেই কাজের ওপর আরও বেশি দখল আসে। সেই কাজ করা আরও বেশি সহজ হয়ে যায়। যেকোনো কিছু জয় করার সামর্থ্য রয়েছে তোমার। বিশেষ কিছু করতে হলে বিশেষ কোনো মানুষ হতে হবে, তা নয় মোটেও। আমি মনে করি, যে কারও পক্ষে সম্ভব যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা।

সূত্র: একাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

সবার জন্য ইন্টারনেট : ভিন্ট কার্ফ
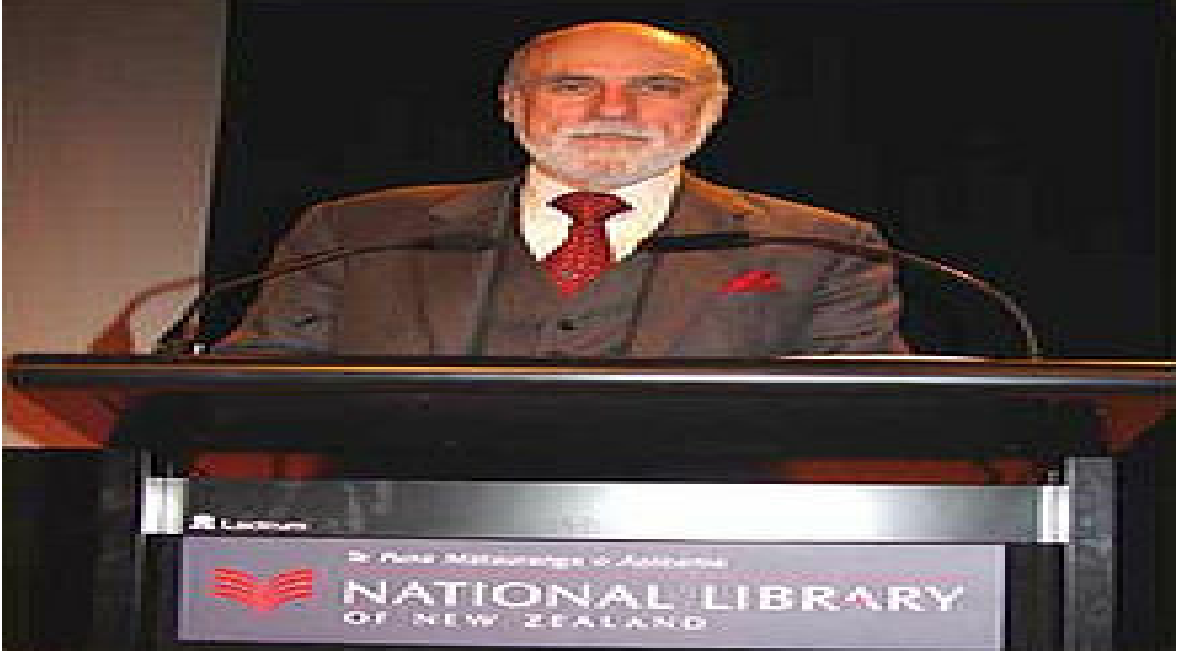
ভিন্ট কার্ফকে বলা হয়ে থাকে ইন্টারনেটের উদ্ভাবক। কম্পিউটার বিজ্ঞানী ভিন্ট কার্ফ ১৯৪৩ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের কানিক্টিকাটে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালের ৭ এপ্রিল, ইন্টারনেট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে ‘স্পিচ টু কম্পিউটারস, ফ্রিডম অ্যান্ড প্রাইভেসি কনফারেন্স’-এ তিনি এই বক্তব্য দেন।

ইন্টারনেট সবার জন্য। কথাটা বলা আসলে যতটা সহজ, কিন্তু এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ঠিক ততটা সহজ নয়। সবার আগে বুঝতে হবে এই লক্ষ্যে আমরা কত দূর এগিয়েছি। সামনের দিনগুলোতে হয়তো ইন্টারনেটের অনেক চাহিদা তৈরি হবে টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও, সংবাদপত্র থেকে শুরু করে সব গণমাধ্যমে। তখন তথ্য আর শুধু কিছু মানুষের হাতের নাগালে থাকবে না, সবার কাছে সব তথ্য পৌঁছে যাবে নিমেষেই। ইন্টারনেট কোনো তথ্য বা সাধারণ কোনো বার্তাকে যেভাবে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে আর কোনো মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। ইন্টারনেট আসলে কাজ করে মেগা ফোনের মতো, প্রয়োজনমতো সামান্য শব্দও ছড়িয়ে দিতে পারে ব্যাপক আকারে।

গণতন্ত্র চর্চাকে আরও বেশি বিকশিত করছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোটও দেওয়া সম্ভব এখন। সামাজিকতাকেও নতুন মাত্রা দিয়েছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ

নিজের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারছে সারা বিশ্বে, গবেষণার জন্য যা খুব বেশি জরুরি। ইন্টারনেট আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে পাড়ি জমিয়েছে অন্তরিক্ষে। নাসা ল্যাবরেটরিতে মঙ্গল অভিযানের বাহন নিয়ে কাজ চলছে। এই কাজ ইন্টারনেট ছাড়া সম্ভব নয়।

সবার জন্য ইন্টারনেট- তত দিন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যত দিন না আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমাতে পারব। কারণ ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খরচ একটা অনেক বড় বাধা। সে জন্য আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে ইন্টারনেটের খরচ কমিয়ে আনার জন্য।

সবার জন্য ইন্টারনেট- এটা শুধু তখনই সম্ভব যখন সব দেশের সরকার এই ইন্টারনেটের ব্যবহারের ওপর থেকে সব ধরনের আইনি বাধা তুলে নেবে। ইন্টারনেট হবে নিরবচ্ছিন্ন ও বাধামুক্ত। মানুষ হিসেবে আমাদের সবার কথা বলার ও কথা শোনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে।

সবার জন্য ইন্টারনেট- সম্ভব হবে না যদি আমরা এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না উঠতে পারি। এ জন্য ইন্টারনেট সেবাদাতাদের আরও সচেতন হতে হবে দ্রুত কারিগরি উন্নয়নের জন্য। এ জন্য ইন্টারনেট আর্কিটেকচার বোর্ড, ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিয়ারিং গ্রুপ, ইন্্টারনেট রিসার্চ টাস্কফোর্স এবং ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্কফোর্সকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে সবাইকে।

সবার জন্য ইন্টারনেট- বাস্তব রূপ পাবে না যতক্ষণ না সারা বিশ্বের মানুষের ঘরে ঘরে, সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছবে। আমি স্বপ্ন দেখি, এমন একটা দিন আসবে যেদিন কোনো বাধা ছাড়াই যেকোনো সময়, যে কেউ, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে, যেকোনো ভাষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। সবার জন্য ইন্টারনেট- এই প্রয়াস ব্যর্থ হবে যদি না ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না হয়। ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টা সবাইকে জানতে হবে। নিরাপদ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। প্রযুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যেন প্রযুক্তির মাধ্যমেই ইন্টারনেটের ব্যবহার নিরাপদ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত করা যায়। ইন্টারনেটকে এই স্থানে নিয়ে যেতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সবার জন্য ইন্টারনেট- তখন পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিভাবক ও শিক্ষকেরা নিজেরা

যথেষ্ট সচেতন হচ্ছেন এর যাবতীয় ব্যবহার সম্পর্কে। অভিভাবক ও শিক্ষকদের জানতে হবে ইন্টারনেটের সীমাহীন বিশাল জগতের সব কিছুই কিন্তু শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। এমন অনেক কিছুই থাকতে পারে ইন্টারনেটে যা কিনা শিশুর জন্য মোটেই উপযোগী নয়। শিশুদের অনুপযোগী বিষয়গুলো যেন শিশুরা ব্যবহার না করে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। শিশুদের জন্য যেকোনো ধরনের শঙ্কামুক্ত, নিরাপদ ইন্টারনেট জগৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

সবার জন্য ইন্টারনেট- বাস্তব করতে হলে আমাদের আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। ইন্টারনেটকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের মতো করে চিন্তা করতে হবে। আমরা যেমন নিজের সম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট থাকি, ঠিক তেমনটিই করতে হবে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও। এমন কিছু মানুষ আছে যারা ইন্‌টারনেটের অপব্যবহার করতে চেষ্টা করে সব সময়। তারা ইন্টারনেট অপব্যবহার করে আমাদের বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হতে হবে। আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা সে সব দুষ্কৃতকারীদের সহজেই শাস্‌তির আওতায় আনতে পারি।

আমি আশা করি সারা দুনিয়ার সব ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেওয়ার মিশনে ইন্টারনেট সোসাইটি এবং এ ধরনের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগ দেবেন। নতুন দিনের আমাদের সব কাজের বাহন হবে ইন্টারনেট। এর চেয়ে দারুণ আর কী হতে পারে বলুন!

তবে মনে রাখবেন, সবার জন্য ইন্টারনেট– তত দিন পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যত দিন না আমরা নিজেরা এটাকে সম্ভব করব।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত

অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

তরুণেরাই পারে সব সম্ভব করতে -ডেম জেন গুডঅল

প্রাণী সংরক্ষণবিদ ও গবেষক। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি প্রাণী নিয়ে গবেষণা করতে আফ্রিকা মহাদেশে পাড়ি জমান এবং অদ্যাবধি প্রাণী অধিকার রক্ষায় কাজ করে চলেছেন।

দিগন্তজোড়া সবুজ ঘাস, মাটির সোঁদা গন্ধ আর পশুপাখি–এসবের মধ্যেই আমি খুঁজে পাই জীবনীশক্তি। আমার যখন বয়স সবে চার কি পাঁচ, তখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে আমার এমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লন্ডন শহর ছেড়ে তখন প্রথমবারের মতো গ্রামে গিয়েছিলাম আমি। গ্রাম দেখে তো আমার পাগল হওয়ার অবস্থা। চারদিকে খোলা প্রান্তর, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ মাঠ। গ্রামে গিয়েই আমি প্রথম দেখেছিলাম হাঁস, মুরগি, ছাগলছানা, গরু–এসব; একেবারে কাছ থেকে। আমি সারা দিন এসব 'জীবন্ত খেলনা' নিয়ে মেতে থাকতাম। এদের সঙ্গে মিশতে মিশতেই যেন আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, এগুলো আসলে খেলনা নয়। এগুলো আমাদেরই মতো। এদেরও আছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনুভূতি। আমার কাছে তখন মনে হলো, আসলে মানুষ আর এদের মধ্যে একটাই পার্থক্য, আর তা

হলো এগুলো আমাদের মতো কথা বলতে পারে না। পশুপাখির জন্য আমার ভালোবাসার শুরুটা হয়তো সেখান থেকেই।

পশুপাখির প্রতি আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন আমি আমার দাদাবাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলাম। দাদাবাড়ির প্রতিটি ঘরের বুকসেলফে ছিল থরে থরে বই সাজানো। আমি যে ঘরটায় থাকতাম, সেখানেও একটা বইয়ের সেলফ ছিল। রোজ সকালে আমি ঘুম থেকে উঠেই হারিয়ে যেতাম বইয়ের রাজ্যে। এ সময় আমি পশুপাখির ওপর লেখা অজস্র বই পড়েছি। সেই যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠল, তা এখনো আছে। আমরা যে সে সময় খুব একটা সচ্ছল ছিলাম, তা কিন্তু নয়। আমার বাবার একটা মোটরসাইকেল কেনা দরকার ছিল, তা আমরা কিনতে পারিনি। আমার নিজের একটা বাইসাইকেল দরকার ছিল স্কুলে যাওয়ার জন্য, তা কেনার পয়সাও আমাদের ছিল না। কিন্তু বই পড়তে ভালোবাসতাম খুব। সে কারণেই আমাদের বই কেনা থেমে থাকেনি কখনো। আমি সব সময় পুরোনো বই কিনতাম। কারণ তাহলে একটা নত্ুন বইয়ের দামে তিনটা পুরোনো বই পাওয়া যেত। এর পরও সব বই তো আর কিনতে পারতাম না! যা-ই হোক, বই পড়ার এই অভ্যাসটা কখনো মরে যায়নি আমার। যখনই সময় পেতাম, বিনা মূল্যে বই পড়ার জন্য লাইব্রেরিতে ছুটতাম। আফ্রিকার গহিন জঙ্গলে হারিয়ে যেতাম সব ভ্রমণকাহিনি পড়ে। সে সময়ই নিজে নিজে সংকল্প করে ফেলেছিলাম, রহস্যময় আফ্রিকায় যাব, পশুপাখি নিয়ে কাজ করব, ওদের কাছ থেকে দেখে ওদের চিনব, ভালোবাসব।

যা হওয়ার তা-ই হলো। আমার এসব ইচ্ছার কথা যে-ই শুনত, সে-ই হাসত। তারা শুধু আমার ব্যাপারেই হাসত। আমার কোনো ছেলেবন্ধু এসব কথা বললে সবাই খুব উৎ সাহ দিত। কিন্তু আমি মেয়ে, সে জন্যই বোধ হয় সবাই আমার কথা নিয়ে তামাশা করত। আমাকে নিয়ে হাসত সবাই। সেদিন আমি হাসিনি একটুও। আমি হেসেছিলাম অনেক দিন পর, যেদিন আমি রহস্যময় আফ্রিকার গহিন অরণ্যে পা রেখেছিলাম। একটা অল্পবয়সী মেয়ে শ্বাপদসংকুল আফ্রিকার বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারে–এটা দেখে যখন সেই মানুষগুলো বোকা বনে গিয়েছিল, তখন আমি হেসেছিলাম ওদের অবাক হয়ে ঝুলে পড়া চোয়াল দেখে। কিন্তু আমি নিজেও জানতাম, কাজটা কত কঠিন।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বনেজঙ্গলে কাটানো খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ২৬ বছরের একটা মেয়ের জন্য তো নয়ই। আমাকে অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আদিবাসীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কাজ করেছি। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করতাম সব সময়।

আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জি নিয়ে গবেষণা করেই আমার জীবনের একটা বড় অংশ পার করেছি। খুব ছোটবেলায় আমার একটা পুতুল ছিল শিম্পাঞ্জির। আমি জানি না এ জন্যই আমার শিম্পাঞ্জিদের ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহ কি না! আমিই সর্বপ্রথম সভ্য দুনিয়ার মানুষকে জানাই, শিম্পাঞ্জিরাও আমাদের মতো সামাজিক জীবন যাপন করে। ওদেরও রয়েছে আমাদের মতো অনুভূতিশক্তি। মানুষের মতোই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করে পাথর থেকে, গাছের ডাল থেকে। আবার অসুখ করলে ঔষধি গাছের বাকল, পাতা, শিকড় দিয়ে ওষুধ বানায় নিজেদের জন্য!

আমার গবেষণালব্ধ এসব কথা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি প্রথমে। অনেকে এমন কথাও বলেছে, একটা মেয়ের পক্ষে এত কিছু গবেষণা করে বের করা সম্ভব নয় মোটেও। কিন্তু আমার গবেষণার যাবতীয় কাগজপত্র, শিম্পাঞ্জিদের দুর্লভ সব ছবি কথা বলেছে আমার হয়ে, আমার গবেষণার হয়ে। এর ফলে সবাই জেনেছে যে শিম্পাঞ্জিরাও মানুষের মতো সামাজিক জীবন যাপন করে।

আমি আজও পশুপাখি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তবে শুধু শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে নয়, এখন আমি কাজ করছি পৃথিবীর সব পশুপাখি নিয়ে। আমি সারা পৃথিবীর তরুণদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি, পশুপাখিরও অধিকার আছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার। তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, ব্যাপক গবেষণা করতে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে। কোনো প্রজাতিই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া যাবে না। আর এটা সম্ভব করতে পারে শুধু তরুণেরাই।

সূত্র: একাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

শূন্য থেকেও শুরু করা যায় : ফিলিপ কটলার

বিশ্বব্যাপী বিপণণ-গুরু নামে খ্যাত ফিলিপ কটলারের জন্ম ১৯৩১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ক্যামব্রিজ মার্কেটিং কলেজের মার্কেটিং-বিষয়ক এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে ১৯৯৭ সালের ৭ আগস্ট ফিলিপ কটলার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এই বক্তৃতা দেন

সবাইকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই। যুক্তরাজ্যের মার্কেটিং শেখার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিজের একঝাঁক মেধাবী বিতার্কিক, শিক্ষার্থী এবং সেই সঙ্গে সম্মানিত শিক্ষকেরা আজ আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আমার সামনে অপেক্ষা করছেন, ভাবতেই ভালো লাগছে। এত বেশি মানুষের সামনে কথা বলতে পারার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই অতুলনীয়।

ভালো যেমন লাগছে, সেই সঙ্গে আরেকটা কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। সে অনেক দিন আগের কথা। আমি আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম আমেরিকান একটি বিপণন-প্রতিষ্ঠানে। ওখানে গিয়ে আমি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, আমার সামনে দর্শকসারিতে মাত্র একজন বসে বসে আমার কথা শুনছিলেন। হাস্যকর হলেও সত্যি যে সেই অবস্থায়ও মাইকে কথা বলে যাচ্ছিলাম আমি। হাজার হলেও আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলে কথা! তা যা-ই হোক, আমার জন্য তখনো আসলে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আমি আমার বক্তৃতা শেষ করে যেই না হল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করেছি, অমনি আমার সামনে বসে থাকা সেই দর্শক আমাকে থামালেন। 'আপনি এখন যেতে পারবেন না!' আমি তো আশ্চর্য। জানতে চাইলাম, কেন যেতে পারব না? তখন তিনি আমাকে যা বললেন, তা শুনে আমি হাসব না কাঁদব, ভুলে গেলাম। আপনারা কি জানেন, তিনি আমাকে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যেতে পারবেন না, কারণ, আপনার পরে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা। আপনি চলে গেলে আমার বক্তৃতা শুনবে কে?'

যা-ই হোক, আজ যে সে রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো না, তা ভেবে বেশ ভালোই লাগছে। ক্যামব্রিজ মার্কেটিং কলেজের মতো জায়গায় মার্কেটিং-সম্পর্কিত আমার নিজের কিছু ধ্যান-ধারণা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে আমার খুব ভালো লাগবে।

প্রথমেই বলব চলমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মার্কেটিংকেও এগিয়ে যেতে হবে। কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এখন আর অঢেল সম্পত্তির দরকার হয় না। একেবারে শূন্য থেকেও তা শুরু করা যায় নিজের মধ্যে মার্কেটিংয়ের কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকলে। এ ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং কাজ করে ম্যাজিকের মতো। আমি এখন নিউইয়র্কের একজন ভদ্রলোকের কথা শোনাব তোমাদের। তিনি একদিন নিউইয়র্কের এক বড় ফ্যাশন হাউসে একটা সুন্দর সোয়েটার নিয়ে গেলেন। ওখানে গিয়ে তিনি মালিকপক্ষকে জানালেন, তিনি এ রকম ভালো মানের আরও অনেক সোয়েটার তাদের দিতে পারবেন মাত্র ১০ ডলার দরে। আর ফ্যাশন হাউসগুলো তাদের ক্রেতাদের কাছে তা ২৫ থেকে ৩০ ডলারে বিক্রি করতে পারবে। সেই ফ্যাশন হাউস ভদ্রলোকের এই শর্তে রাজি হয়ে গেল। এবার লোকটি সোয়েটারের নির্মাতা হংকংভিত্তিক একটি গার্মেন্টসে যোগাযোগ করে মাত্র সাত ডলার মূল্যে অনেকগুলো সোয়েটারের অর্ডার দিলেন। তারপর একটি জাহাজ কোম্পানিতে সোয়েটারগুলো নিউইয়র্কে সরাসরি ফ্যাশন হাউসে চালান দেওয়ার অর্ডার দিলেন। এভাবেই সেসব মালামাল পৌঁছে গেল জায়গামতো। মাঝখান থেকে ভদ্রলোক কিছু অর্থ উপার্জন করলেন। এমনকি ওই সব মালামাল রাখতে কোনো গুদাম ভাড়া করার খরচও দরকার হলো না ওই ভদ্রলোকের।

তোমরা সবাই কমবেশি 'নাইকি'র নাম শুনেছ। 'নাইকি' কী করে জানতে চাইলে তোমরা হয়তো সবাই বলবে, নাইকি বিশ্বমানের উন্নত জুতা তৈরি করে। কিন্তু আমি যদি বলি, না। নাইকি কোনো জুতা তৈরি করে না। সত্যিই নাইকি কোনো জুতা তৈরি করে না। নাইকির জুতা তৈরির কোনো কারখানা নেই বিশ্বের কোথাও। তারা শুধু উন্নত মানের জুতার নকশা বানায় তাদের ল্যাবে। এরপর সেগুলো সঠিকভাবে বিপণন করে বিশ্বব্যাপী। কী! আশ্চর্য হচ্ছো তো? এটাই তো আসলে আউটসোর্সিংয়ের নিয়ম। তুমি একটা কিছু তৈরি করতে পারো যে খরচে, তার চেয়ে অনেক কম খরচে আরেকটি কোম্পানি যদি সেই একই জিনিস তৈরি করতে পারে, তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, কেন তুমি বেশি খরচ করে সেই জিনিসটা বানাবে? তুমি তো তাদের কাছ থেকে সেই জিনিসটা কিনে নিয়ে বিপণন করলেই পারো। অর্থাৎ তোমার কোনো বড় কারখানা লাগবে না, অনেক বেশ ি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হবে না। শুধু সুন্দর সময়োপযোগী বিপণনব্যবস্থা জানলেই চলবে।

তবে মনে রেখো, মার্কেটিং মানে শুধু ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন নয়, ক্রেতারা কী চায়, কীভাবে চায়, কেন চায়, ক্রেতারা তাদের পয়সা ঠিকভাবে উসুল করতে পারছে কি না, তা নিশ্চিত করাও তোমাদের দায়িত্ব। ইউরোপের একটা এয়ারলাইনসের কথা বলি। সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইনসের স্লোগান হলো, 'লেস ফর মাচ লেস!' (কম সেবা আরও অনেক কম দামে!)। বিষয়টা খুলেই বলি। আমরা বিমানে ভ্রমণের সময় প্রকৃত ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া গুনতে হয় বিমানে পরিবেশিত খাবারের জন্য, এয়ার হোস্টেসের সহযোগিতার জন্য, মালপত্র রাখতে কেবিন ক্রুদের সাহায্যের জন্য, টিভি দেখার জন্য বা গান শোনার জন্য। এখন তুমি যদি ভ্রমণের সময় খাবার খেতে না চাও, টিভি দেখতে না চাও, নিজের মালামাল নিজের কাছেই গুছিয়ে রাখতে চাও নিজ দায়িত্বে, আর এর বিনিময়ে ওসব বাবদ বিবিধ চার্জ বাদ দিয়ে কম ভাড়ায় যেতে চাও, তাহলে তা কি সম্ভব? অন্য কোথাও সম্ভব না হলেও সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইনসের বিমানে তা সম্ভব। এই বিমানে তুমি শুধু ভ্রমণ করতে পারবে। কোনো খাবার পরিবেশিত হবে না, গান শোনা, টিভি দেখা যাবে না, নিজের ব্যাগ নিজেকেই রাখতে হবে, এয়ার হোস্টেস থাকবে না। কিন্তু ভাড়া অন্য যেকোনো এয়ারলাইনসের তুলনায় অর্ধেক! এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পারি যে গ্রাহককে কোনো কিছু যেকোনোভাবে গছিয়ে দেওয়াটা মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্য নয়। সঠিক নীতি বজায় রেখে সুষ্ঠু বিপণন করেও সফল হওয়া যায়।

আর বেশি কথা বাড়াতে চাই না। আমরা কেউ আসলে সঠিকভাবে জানি না যে আমরা আসলে বিপণনকর্মীরাই (মার্কেটিয়াররা) কি বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে

গেছি, নাকি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং চরম প্রতিযোগিতামূলক বাজার এই কৃতিত্বের দাবিদার? কারণটা যা-ই হোক না কেন, তোমাদের মানে ভবিষ্যৎ বিপণনকর্মীদের বড় দায়িত্ব হলো, মার্কেটিংয়ের নৈতিকতা সঠিকভাবে অনুসরণ করে বিশ্বব্যাপী আরও নতুন বিপণনক্ষেত্র (বাজার) সৃষ্টি করা। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

মন একটা প্যারাস্যুটের মতো : অমিত চাকমা

অমিত চাকমার জন্ম রাঙামাটিতে, ১৯৫৯ সালে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করে আলজেরীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি পাড়ি জমান ভিনদেশে। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া থেকে রসায়ন প্রকৌশল বিষয়ে এমএসসি এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর উপাচার্য ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তনের বক্তা ছিলেন তিনি।

যদিও রাঙামাটির পাহাড়ে আমার জন্ম এবং চাকমা আমার মাতৃভাষা, ছোটবেলা থেকে বাংলা শিখেছি আর বাংলায় পড়াশোনা করেছি।

আজ ৪০ বছর ধরে বিদেশে থাকার কারণে আমার বাংলার দক্ষতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তবুও বাংলা ভাষা আর স্বাধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলায় বক্তব্য দেওয়ার আবেগাপ্লুত ইচ্ছা।
তাই আমি যতটা সম্ভব আমার বক্তব্য বাংলায় দেওয়ার চেষ্টা করব। আজ আপনারা বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উঁচু মানের প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি অর্জন করতে আপনাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। যদিও আমাকে আপনাদের মতো কোনো কাজই করতে হয়নি, তবুও আমি সম্মানসূচক ডিগ্রি অর্জন করে আপনাদের সহপাঠী হতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার অন্তরে একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক পারিবারিক। আমার প্রয়াত ছোট বোন নমিতা চাকমা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর স্বামী ড. প্রদানেন্দু চাকমা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁদের ছেলে অনিক চাকমা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার অ্যাকাডেমিক সম্পর্ক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। সর্বোপরি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার আবেগমাখা সম্পর্ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

আমার মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। আমার বড় ভগ্নিপতি আর আমার ছোট দিদি দুজনেই শিক্ষক। আমার ছোট বোনের স্বামী প্রফেসর প্রদানেন্দু চাকমা আর আমি আজ উপাচার্যের দায়িত্ব পালনে নিবেদিত।
এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ এই আবেগের সম্পর্ক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নীতিবাক্য'—শিক্ষাই আলো। শিক্ষার জন্য আলোর চেয়ে কোনো ভালো রূপক আর হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনক এবং আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রধান রচয়িতা টমাস জেফারসন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টমাস জেফারসন বলেছিলেন, 'কেউ যদি আমার মোমবাতির দীপশিখা থেকে নিজের মোমবাতির দীপ জ্বালায়, তাতে যেমন আমার বাতির আলো কমে না, তেমনি যে আমার কাছ থেকে ধারণা বা জ্ঞান পায়, সে তা গ্রহণ করলে আমার নিজের জ্ঞান ম্লান হয় না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের মোমবাতির সমতুল্য। এটির গুণী শিক্ষকমণ্ডলী যুগ যুগ ধরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে অতীতের এবং বর্তমানের সব শিক্ষকের প্রতি ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই।
আমার লেখাপড়ার পেছনে আমার মা-বাবার অবদান অতুলনীয়। তাঁদের নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহায়তা ছাড়া আমার আজ কানাডার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার সৌভাগ্য হতো না।
আমার মা আলো চাকমা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকায় আমি খুবই আনন্দিত।
আমি কেবলই আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কিছু শিক্ষার বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব।

আমার কর্মজীবনের সফলতার কারণ জানতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন । আমি আপনাদের মতো মেধাবান না হলেও মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করেছি, উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছি। আমার অনেক মেধাবী ও কর্মঠ সহপাঠীও তা-ই করেছে। কিন্তু সবার কর্মজীবনের সফলতা একই হয়নি। কী কারণে এই ব্যবধান তার কোনো নির্দিষ্ট উত্তর নেই। তবুও আমার নিজের অভিজ্ঞতা আর সফল ব্যক্তিদের নিয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইভি স্কুল অব বিজনেসের গবেষণা থেকে পাওয়া কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।
সর্বস্তরের সফল নেতাদের তিন ধরনের উপাদান থাকে: ১. যোগ্যতা, ২. কর্মনিষ্ঠা ও ৩. স্বকীয়তা। যাঁরা নেতৃত্বের পদ অর্জন করেন, যোগ্যতা আর কর্মনিষ্ঠা তাঁদের কমবেশি সবারই থাকে এবং লোকবিশেষে এ দুটোর ব্যবধান খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম। স্বকীয়তা হলো এমন একটা গুণ, যা ব্যক্তিভেদে অনেক ব্যবধান হয়। তাই আমি আমার মূল উপদেশ স্বকীয়তার ওপর রাখব।

আপনারা সবাই মেধাবী বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে পেরেছেন। এই ডিগ্রি আর মেধাকে কীভাবে কাজে লাগাবেন, তার ওপর নির্ভর করবে আপনাদের সফলতা। আপনাদের মেধাকে ভালো কাজে লাগাতে হবে। আপনাদের মতো মেধাবান যুবক-যুবতীর প্রয়োজন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা বিশ্বের।

যুগ যুগ ধরে মানবজাতি একদিকে যেমন অনেক উন্নতি সাধন করেছে, অন্যদিকে একই সময়ে অনেক বড় আকারের সমস্যারও উৎপত্তি হয়েছে। আপনাদের বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধান খুঁজতে নিবেদিত হতে হবে। এর জন্য জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। মনে রাখবেন, এই ডিগ্রি প্রাপ্তি আপনাদের শিক্ষাযাত্রার সমাপ্তি নয়, এটা একটা বিশেষ মাইলফলক মাত্র। শিক্ষা একটি আজীবন প্রক্রিয়া।

আপনারা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং এসব বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। শিক্ষার মানে শুধু শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মনের জানালা খুলে দেওয়া, মনকে বিকশিত আর উন্মুক্ত করা।

ইংরেজিতে একটা বচন আছে, 'মন একটা প্যারাস্যুটের মতো, এটা খোলা থাকলেই সবচেয়ে ভালো কাজ করে।' গ্রিক দার্শনিক এবং মহান শিক্ষক সক্রেটিসের শিক্ষকতার মূল বিষয় ছিল ভালো আর মন্দের বিশ্লেষণ। তিনি বলেছিলেন, ভালো জিনিস একটাই, তা হলো জ্ঞান। আর মন্দ একটাই, অজ্ঞানতা। সক্রেটিসের সমসাময়িক এই অঞ্চলেরই আরেক দার্শনিক গৌতম বুদ্ধ এক দেশনায় একই বিষয়ে বলেছিলেন, 'মূর্খকে সেবা কোরো না, পণ্ডিত ব্যক্তিকে সেবা করো।'

সক্রেটিসের শিক্ষা আর বুদ্ধের দেশনার আড়াই হাজার বছর পরে আমাদের শিক্ষার পরিধি অনেক বেড়েছে। এরই কারণে আমাদের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবে কি তা প্রতিফলিত হয়েছে?

ভালো আর মন্দের বিবেচনা শুরু করতে হবে সর্বপ্রথম নিজেকে নিয়ে। সক্রেটিস আরও বলেছিলেন, অপরীক্ষিত জীবন অর্থহীন। যতই বেশি জ্ঞান অর্জন করবেন, ভালো আর মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা ততই বেশি বাড়বে। সেই অর্জিত জ্ঞানকে যদি সৎ কাজে লাগান, তাহলে আপনাদের স্বকীয়তা আরও বিকশিত হবে। আপনারা তত বেশি নীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ়বিশ্বাস বিকশিত স্বকীয়তা এবং নীতির ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বা কর্মজীবন যত বেশি পরিচালিত করবেন, তত বেশি সফলতা অর্জন করবেন।

স্বকীয়তার বিষয়ে আমার সীমিত সময়ে দেওয়া বক্তব্য আপনাদের কাছে বিমূর্ত মনে হতে পারে। তাই ছোটবেলার শেখা কিছু সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি।
সর্বদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা মহা পাপ–এই দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ কিন্তু অনেক গভীর। এই দুটি নীতি মেনে চলা নিয়ে যদি শুরু করেন, সেটা হবে স্বকীয়তা গড়ে তোলার এক ভালো সূচনা।

জীবনযাত্রায় আপনারা অনেক অন্যায়ের সম্মুখীন হবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রী যুগ যুগ ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা তাঁদের উত্তরসূরি। তাঁদেরকে আদর্শ বিবেচনা করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনাদের সাধ্যমতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন।
আবার ফিরে যাই সেই ছোটবেলার শেখা নীতিবাক্যে: অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।
নিজেও কোনো অন্যায় করবেন না, আর অন্যায়কে সহ্যও করবেন না।দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না।সাধারণ মানুষের আর সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে দেবেন না।একদিন আপনারা নেতৃত্বের অবস্থানে যাবেন।মনে রাখবেন, কবিগুরুর অমর বাণী: যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।
মনে রাখবেন, আপনারা সবাই সম্মিলিতভাবে জগৎটাকে বদলে দিতে পারেন। আপনারা মেধাবী। আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মেধা, স্বকীয়তা আর নীতির বলে আপনারা মানব জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবেন। নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনাগুলো অর্জনের চেষ্টা করুন। নিজেকে আবিষ্কার করুন। নিজেকে ছাড়িয়ে যান। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ়তা আর পরিশ্রম হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। বড় বড় স্বপ্ন দেখুন। ছোট থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান।

‘সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু’

আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। (সংক্ষেপিত)

মানবসেবা করতে হলে বিত্তবান হতে হয় না - রিয়ানা
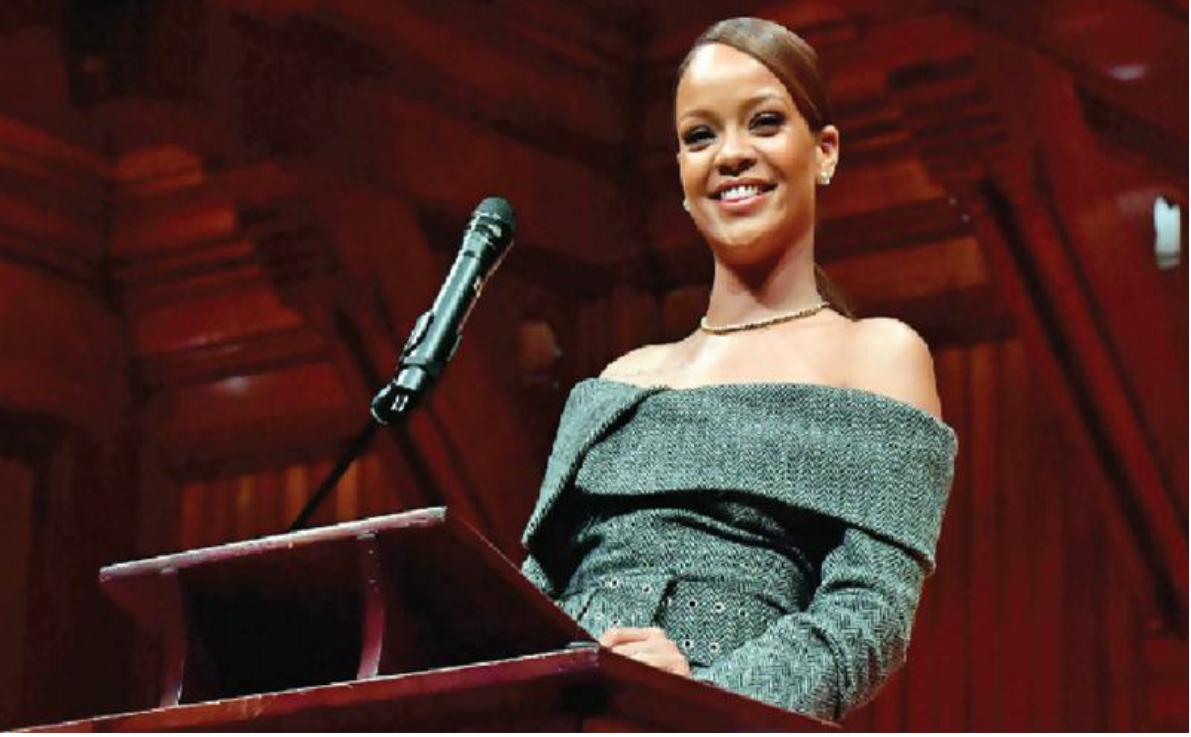
বয়স মাত্র ২৯। এ বয়সেই আটটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জুটেছে মার্কিন গায়িকা রিয়ানার ঝুলিতে। 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী তারকা'র তালিকায় আছে তাঁর নাম। সম্প্রতি মানবকল্যাণমূলক কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন এই তারকা।

অবশেষে হার্ভার্ড থেকে পুরস্কার নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হলো! ব্যাপারটা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু সত্যি খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ ড. কাউন্টার, ধন্যবাদ হার্ভার্ড ফাউন্ডেশন এবং ধন্যবাদ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, আমাকে এত বড় সম্মান দেওয়ার জন্য। স্বীকৃতির প্রত্যাশায় যে কাজ আমি করিনি, সে কাজের জন্য এত বড় পুরস্কার পেয়ে আমি আপ্লুত।

আমার যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স, তখন টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখতাম। আমার চেনা-জানা পৃথিবীটার বাইরেও যে রোগে-শোকে ভোগা বহু শিশু আছে, এই বিজ্ঞাপন দেখেই জেনেছিলাম। বিজ্ঞাপনটির ভাষা অনেকটা এ রকম, '২৫ সেন্ট দান করুন, একটি শিশুর জীবন বাঁচান।' ছোট্ট আমি তখন একা একা বসে ভাবতাম, আফ্রিকার সব অসুস্থ শিশুকে

বাঁচাতে হলে কতগুলো ২৫ সেন্ট জমা করতে হবে? ভাবতাম আমি যখন বড় হব, যখন আমার অনেক টাকা হবে, তখন আমি পৃথিবীর সব শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করব। তখনো অবশ্য জানতাম না, বয়স কুড়ি হওয়ার আগেই এত টাকা উপার্জন করার সুযোগ আমার হবে।

১৭ বছর বয়সে আমেরিকায় আমার ক্যারিয়ারের শুরু। ১৮ বছর বয়সে আমি একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করি। এর আগে অবশ্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, সাহায্য করেছি।

ছয় বছর বয়সী জ্যাসমিনা অ্যানিমার মৃত্যু আমার জীবনে একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। ২০১০ সালে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছোট্ট মেয়েটা মারা যায়। কিন্তু তার গল্প আমার মতো অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীকে অনুপ্রাণিত করেছে। একইভাবে ২০১২ সালে আমার দাদি ক্লারা ব্র্যাথওয়াইটের মৃত্যু আমার জীবনে একটা বড় ধাক্কা ছিল। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে দাদি হেরে গেছেন। কিন্তু তাঁর পরাজয় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমি ক্লারা লিওনেল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমরা সবাই মানুষ। আর মানুষ মাত্রই কেবল একটা সুযোগ চায়। বাঁচার সুযোগ, শিক্ষার সুযোগ, ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ। ক্লারা লিওনেল ফাউন্ডেশনে আমাদের লক্ষ্য এটাই, যত বেশি সম্ভব মানুষকে একটা সুযোগ করে দেওয়া।

এই ঘরভর্তি চমৎকার মানুষগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? সম্ভাবনা, আশা, ভবিষ্যৎ! আমি জানি তোমাদের প্রত্যেকের কাউকে না কাউকে সাহায্য করার সুযোগ আছে। মানুষের ভালোর জন্য কাজ করো, অন্তত একজনের জন্য হলেও। তবে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা রেখো না। আমার কাছে এটাই হলো মানবতা।

লোকে ব্যাপারটাকে খুব কঠিন করে ভাবে। আসলে তা নয়। আমি চাই, একটা ছোট মেয়ে যখন আমার ছেলেবেলায় দেখা সেই বিজ্ঞাপনটা দেখবে, সে যেন এটা বিশ্বাস করে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হলে ধনী হতে হয় না। হ্যাঁ। তোমার অনেক টাকা থাকতে হবে তা নয়, তোমাকে বিখ্যাত হতে হবে তা নয়, এমনকি তোমাকে কলেজ-স্নাতক হতে হবে তা-ও নয়। ইচ্ছে থাকলেই তুমি মানুষের জন্য কাজ করতে পারো।

অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল, তোমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। বিশেষ করে আজ তোমাদের দেখে সেই আকাঙ্ক্ষাটা আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।
তুমি কাকে সাহায্য করবে? শুরু হতে পারে তোমার একজন প্রতিবেশীকে দিয়ে। ক্লাসে তোমার ঠিক পাশে বসা সহপাঠীকে সাহায্য করো, তোমার এলাকার একটা শিশুকে সাহায্য করো। তোমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে, তা-ই করো। আজ আমাকে কথা দাও, জীবনে অন্তত এমন একটা ভালো কাজ করবে যা তোমার হৃদয় স্পর্শ করবে। দাদি সব সময় বলতেন, যদি তোমার কাছে মাত্র এক ডলারও থাকে, সেটারও অনেক ভাগীদার আছে।
ধন্যবাদ বন্ধুরা।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ
সূত্র: এলি ডট কম

সফলদের স্বপ্নগাথা সংকলন

(সমাপ্ত)